বিচিত্রা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গল্প প্রহসন নাটক কবিতা ও গানের বিচিত্র নিদর্শনের একটি সংগ্রহ দেশবাসীর পক্ষে সহজলভ্য করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে 'বিচিত্রা'র প্রকাশ।

এই সংকলনের প্রতি আগ্রহ দীর্ঘকাল পরেও অব্যাহত, বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য যাঁহাদের পক্ষে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয় সেই-সকল রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের জন্য এরূপ একটি সংকলনের প্রয়োজন এখনও অনুভূত— এই কারণে বিচিত্রার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, পাত্র ও পাত্রী, চোরাই ধন, চিত্রকর এই পাঁচটি গল্প, সব-পেয়েছি'র দেশ ঝড়ের খেয়া, প্রায়শ্চিত্ত এই তিনটি কবিতা, 'যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল', 'যখন মল্লিকাবনে', 'আমার নিশীথরাতের বাদলধারা' এই তিনটি গান, আগমনী নামে একটি কথিকা এবং লেখন ও স্ফুলিঙ্গ কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেকগুলি কবিতা নূতন সংকলিত হইয়াছে।

॥ রবীন্দ্র-রচনা-সঞ্চয় ॥ ১২৮৭-১৩৪৮ ॥

বিচিত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঁচিশে বৈশাখ
১৩৬৮

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচীপত্র

সূচীপত্রে প্রথমেই আকরগ্রন্থের নাম, পরে সংকলিত রচনাসমূহের নাম মুদ্রিত। বিন্দুচিহ্নিত রচনায় আকরগ্রন্থ-ধৃত মূল রচনার কিছু-কিছু অংশ বর্জিত। গ্রন্থের ভিতরে অধিকাংশ রচনার শেষে রচনাকাল অথবা তারকাচিহ্ন দিয়া প্রথম প্রকাশ-কাল যতদূর জানা আছে মুদ্রিত।

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৮

১১

১ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সঙ্কলন' বা 'সংকলন' গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণ হইতে গৃহীত।
২ শনিবার ৩০ অগস্ট্ ১৮৯০ তারিখের বিবরণটুকু।
৩ শান্তিনিকেতন পত্র হইতে প্রায় পূর্ণসংকলন, 'শিক্ষা'র দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট হইবে।
৪ সঞ্চয়িতার পাঠ (১৩৪০)।
৫ প্রথমসংস্করণ চয়নিকার পাঠ সংকলিত।
৬ বর্তমান পাঠ ভারতী (কার্তিক ১৩০৫) হইতে গৃহীত।
৭ প্রথমসংস্করণ চয়নিকার আদর্শে সংক্ষেপীকৃত, সে স্থলে বর্জনের পরিমাণ আরও অধিক ছিল।
৮ চতুর্থসংস্করণ চয়নিকার পাঠ।
৯ স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছের ১৮-সংখ্যক কবিতা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭ সংখ্যা হইতে গৃহীত।
' ছিন্নপত্রাবলীর প্রথম পত্রের পাঠ সংকলিত।
" ছিন্নপত্রের পাঠ।

চিত্রসূচী

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি

পাণ্ডুলিপি-চিত্র

প্রচ্ছদে মুদ্রিত পুষ্পস্তবক নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত। ছড়ার ছবি অংশে মুদ্রিত চিত্রাবলীও নন্দলাল বসু-কৃত।

প্রবেশক রূপে মুদ্রিত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ডেনজেরা হাসেগাওয়া কর্তৃক গৃহীত।

ইলিনয়ে গৃহীত চিত্র মিসেস সীমুর-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ চিত্র প্রফুল্ল মহলানবিশ কর্তৃক গৃহীত।

গ্রন্থে মুদ্রিত পাণ্ডুলিপির কয়েকটি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত (ঐ মহামানব আসে), শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় (যেথায় থাকে সবার অধম), শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার (ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে এবং দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে) এবং শ্রীমতী সাহানা দেবীর (আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে) সৌজন্যে প্রাপ্ত। অন্যান্য পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন-স্থিত রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ হইতে।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই তাঁহার রচনার পাঠ-পরিবর্তন করিয়াছেন, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে অপরিচিত পূর্বপাঠের নিদর্শন বিদ্যমান। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিগুলিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিবেদন

আগামী রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্‌যাপন-উদ্দেশে বর্তমান সংকলনগ্রন্থের প্রকাশ। হাজার বা নয়শত পৃষ্ঠার অল্প পরিসরে বিশাল ও বিচিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা যুগের নানা রচনারীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি চয়ন করা যায় না এ কথা বলাই বাহুল্য। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা বা অধ্যয়ন করা সকল রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্য একখানি গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধ গল্প নাটক প্রহসন কবিতা গানের বিচিত্র নিদর্শন একত্র ক'রে দেশবাসী জনসাধারণের সহজলভ্য করে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এরূপ সংকলনে সকলের মনোমত সব রচনার স্থান-সংকুলান হতে পারে না সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সংকলিত কোনো কোনো রচনার পরিবর্তে অন্য কতকগুলি রচনা দেওয়া যেত এমনও অবশ্যই মনে হতে পারে— তবু, মোটের উপর, এই সংকলনগ্রন্থে বিশাল রবীন্দ্রবর্ষের কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন যদি হয়ে থাকে তা হলেও আমাদের যত্ন এবং আগ্রহ সার্থক হয়েছে বলতে হবে।

কতকগুলি বিশিষ্ট রচনা স্থানাভাবে যেমন আদ্যন্ত গ্রহণ করা যায় নি তেমনি ত্যাগ করাও উচিত মনে হয় নি— আশা করা যায় আংশিক সংকলনেও এই-সব রচনার বিষয়বস্তু বা রচনাসৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের শিশুসম্পর্কিত কবিতাবলির কিছুই প্রায় সংকলন করা যায় নি। গুরুদেব-রচিত শিশু-সাহিত্যের বা কাব্যের পৃথক সংকলন পরে প্রকাশিত হতে পারবে। অন্য অনেক বিষয়, যেমন, বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অথবা ছন্দ ও শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা, এ-সবও স্থানাভাবেই দেওয়া যায় নি।

এই গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনের ভার দেওয়া হয় শ্রীকানাই সামন্তকে। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীক্ষিতীশ রায়, শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রমুখ রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী সুধীগণ এই সংকলনের নানা পর্যায়ে নানা পরামর্শ দিয়ে সম্পাদনাকার্যে আনুকূল্য করেছেন।

আপন লভ্যাংশ ত্যাগ করে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তির স্মারক এই গ্রন্থের সুলভ মূল্যে প্রচারে যে সাহায্য করেছেন তা স্বীকার করে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।...

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৬৮

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

আমি

আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার ঠেলায় মোর তরী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার তুলিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র এ আমার প্রকাশে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডী দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি'।

তবে কেন মাঝে মাঝে, নিবিড় হঠাৎ
প্রেয়সীর দুরন্ত পরশে
বারে বারে
দেখেছিনু তারে
অতল মাধুরী-সিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
জানি তাই, সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরানো তীরের মহিমায়
আপনারে হারায়
তারে পাই আপনারে ভোলানো বিস্ময় ধারায়।

যে আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে,
সাহিত্যের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

দিগন্তে চঞ্চল ময়ূরের
নীল মেঘে
ওঠে, 'আসে নাচি'।
চিনে তারে তাই
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে॥

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনস্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দুই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু, ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

শিক্ষারম্ভ

কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর-একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্জে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারী রসিক। সেই কৈলাস মুখুজ্জে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই-যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত— কিন্তু, বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে-বিচিত্র আশ্চর্য

সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে। আর মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান'— ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

বাহির-বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট— দক্ষিণ ধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুল গাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও এক সার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল— সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে,

তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'কী আছে বলো দেখি।' কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

কবিতারচনারম্ভ

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজিসাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে'। বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।

এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম— এমন শ্রোতা আর পাইব না। ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত-সমালোচকপদ লাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো— অম্লরসের আভাসমাত্র-বর্জিত— তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না— ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' হইতে কোনো-একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া, অনুনয় করিয়া, কোনোমতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরনার ধারা যেমন এক টুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারের দুঃখকষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পারমার্থিক কবিতা আমার

পিতাকে শুনাইলে, নিশ্চয় তিনি ভারি খুশি হইবেন; মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল-সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারচ্ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন।

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয়শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল—'ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।' ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ', সেই খানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো-লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

পিতৃদেব

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন; তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি—ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা—ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বউঠাকুরানীর ঘরে একটা কাচাবরণে-ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রঙ-করা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন-বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য সামগ্রীটি বউঠাকুরানীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া, প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবিকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বন্ধ ছিলাম বলিয়া যাহাকিছু বিদেশের, যাহাকিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া য়িহুদি পোশাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত, এবং ঝোলা-ঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা-পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকর-বাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্‌মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান-কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুসীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তা-লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, 'রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।' মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন, ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাসিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দফতরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েকদিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাসুলের সংগতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না, চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পেঁাছিবে। বলা বাহুল্য, মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পেঁাছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।

মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল; বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে, ধপাধপ্ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম, তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুত, গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে ভাবে দিন কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে; তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই— কারণ, শিশুচরিত্র-নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মতো প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

হিমালয়যাত্রা

পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল, ইস্কুল যাইব কী করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্, ব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই! অতএব, নেড়া মাথার উপরে তাহারা আর কোনো জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতালার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়!

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্বে পিতা-মাতার সঙ্গে সত্য সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম, উনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু, আমাদের সেকালে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখাটা যে কোথায় তাহা ভালো করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস কাশীরামদাস এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রঙ-করা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমাদিগকে আগে-ভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট, পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তার পর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল।

কিন্তু, গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়তো গাড়ি ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ-নীল-পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝর্নার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে, এই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরুদুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন না যে, আজ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা শহরের ছেলে, কোনোকালে ধানের খেত দেখি নাই এবং রাখালবালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যের কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখালবালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধানখেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া, এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের খেত! রাখালবালক হয়তো-বা মাঠের কোথাও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরের খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, 'কী চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!' আমি বলিতাম, 'এমন আরও কত আছে! কত হাজার হাজার!

আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।' তিনি বলিতেন, 'সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।'

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। বোঝা মাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই, সে কথা আজও বুঝিতে ঠেকে। আমার সেদিনকার একান্তমনের প্রার্থনায় বিধাতা যদি বর দিতেন যে 'এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে', তাহা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

খোয়াইয়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, 'ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।' তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন, 'তাই তো, সে তো বেশ হইবে।' এবং আবিষ্কারকর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো-একটা-কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দূরবীনের উলটা দিকের দেশ। নদী-পাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো, আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি— আর আবিষ্কারকর্তাটির তো কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।' তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলি-

জীবনস্মৃতি।

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুইয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুইটি ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে আমাদের অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙানো হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

জীবনস্মৃতি। গ্রন্থসূচনা

কাতায় পাঠাইতে হইল।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এই-সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেক দিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতের উপত্যকা-অধিত্যকা-দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্ত দিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না— পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায় এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোণে কোণে, পথের কোনো বাঁকে, পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝর্নার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন-কি, পথের যে অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনও বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু, এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া, হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন—কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠদ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন? অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফ-গলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত।

আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবা মাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

প্রত্যাবর্তন

পূর্বে যে শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।

ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর শুরু হইল। মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া আমি একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম, সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল; স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে শরীর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পথে যেখানে যত সাহেব মেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে— এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।

বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি; খড়্‌খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেই বারান্দা পার হইয়া গোটা-চার-পাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার, সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে— এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তার পরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম— শংকরী কিম্বা প্যারী কিম্বা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত, সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত; দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুন-কাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানা প্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্‌ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম; তার পরে অর্ধরাত্রে কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম অতিবৃদ্ধ স্বরূপসর্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর-এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত, তাহাই হঠাৎ এক দিনে বাকিবকেয়া-সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

ঘরের পড়া

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাঙলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ওই পরিমাণে হালকা হইয়াছে।

রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাক্‌বেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।

আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় এক ধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম; যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো-একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায়

করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল; আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, 'এ বই আমি পড়িবই।'

মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন, আঁচলে-বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাস খেলায় আমার কোনোদিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু, সেদিন আমার ব্যবহারে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কোনো-এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু, এ কার্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল; ধরা পড়িয়া গেলাম। যাঁহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন। এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান-দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। পিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল; চাবি-সমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমত সেটা তখনি তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না। তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন, আমারও সেই দশা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হ্বাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

বাল্যকালে আর-একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্প কালের পড়াকে

সুদীর্ঘ কালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া— তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।

সাহিত্যের সঙ্গী

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমারসম্ভব কিছু আর দুই-একটা জিনিস এলোমেলোভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন ব্রজবাবু। তিনি আমাকে প্রথম দিন গোল্ড্স্মিথের ভিকর অফ ওয়েক্ফীল্ড্ হইতে তর্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরও অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো-কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে— সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্বগ্ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা-কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য তাহা নহে— তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত, আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এই রকমের কিছু-একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারি দিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই-যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয়

হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল-সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরানী এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ-একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারি দিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত— তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্মশরীর ছিল— তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভৃত ছোটো ঘরটিতে পঙ্খের-কাজ-করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্ গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন, এমন অবস্থায় অনেক দিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি— আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সংকোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না— যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন।

স্বাদেশিকতা

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোম-হর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন-একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা

করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল— আমরা হত-আহত পশুপক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট্ এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?' মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।' ব্রজবাবু কহিলেন, 'আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।' সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকারশব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাত নাড়া তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠকে বহু দূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুঠ ছড়াইতেছে।

ভারতী

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না।

প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনী'-নামক একটি কাব্য বাহির করিয়া-

ছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে— লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই।

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে-একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

আমেদাবাদ

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর-একটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ ছিলেন। আমার বউঠাকরুন এবং ছেলেরা তখন ইংলন্ডে, সুতরাং বাড়ি এক প্রকার জনশূন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকান্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকান্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর-কেহ থাকিত না— শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড়ো ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা অনেক-ছবি-ওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে, কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল। লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবর্লিন-কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। কেবল একটি-চাক-ভরা বোলতার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাত্রে আমি সেই নির্জন ঘরে শুইতাম; এক-একদিন অন্ধকারে দুই-একটা বোলতা চাক হইতে

আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত, যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীক্ষ্নভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকে প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের-সুর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

দেশে প্রত্যাবর্তন

ব্যারিস্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম, এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরও একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যারিস্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে, বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না। বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড়ো গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাস্যটা ষোলো-আনা আমারই প্রাপ্য নহে; এইজন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক, লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইব্রেরির ভূভার-বৃদ্ধি না করাতে আইনদেবতা আমাকে সদয় চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মসুরি পাহাড়ে ছিলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না; বরং মনে হইল, তিনি খুশি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্বাদেই ঘটিয়াছে।

গঙ্গাতীর

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশ-ভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা নহে, তবু ইতি-মধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কল-কারখানা ঊর্ধ্বফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও

বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া সংকীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয়তো সে ভালোই— কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো, এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার-জলে-উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম-যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিম-তটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে— কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই-চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের সার্শিগুলিতে রঙিন-ছবি-ওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল— নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা, সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর-একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে-সজ্জিত নরনারী কেহ-বা উঠিতেছে কেহ-বা নামিতেছে। সার্শির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্‌ দূরদেশের কোন্‌ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্‌ করিয়া মেলিয়া দিত, এবং কোথাকার কোন্‌-একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারি-দিক-খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলিতেছে; এই ঘরের প্রতি লক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

> অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝার
> এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার।

সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি— রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের

কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যা-সংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না।' তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রভাতসংগীত

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া 'বউঠাকুরানীর হাট' ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছি, এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলট-পালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্ণের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই-যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদু মাত্র। কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে— তাহা আনন্দময়, সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয় সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি

হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না— বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারি দিকে হাসির ঝর্না ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে— সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সবকিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বন্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল— ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি— সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা

আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া! এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস-দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে এক দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।

ছবি ও গান

'ছবি ও গান' নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরিঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট

হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা-পরিবেষ্টিত ছবি-গুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু, কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে; আমিও সেইদিন নবযৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন-মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই ছবি-গুলোকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা-কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কী আমার জীবনে কী আমার গদ্যে পদ্যে, কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখন যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূরপ্রবাসের অতিথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত। কিন্তু, শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে দুই-একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু, আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না— তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বাচুল-ওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু, যে পাখি উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক, ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল সে বি-এ পড়িতেছে কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্‌বিগ্ন হইলাম, কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারিবিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, 'স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন, তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে।' বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, 'আপনি বোধ

হয় এ-সমস্ত বিশ্বাস করেন না।' আমি বলিলাম, 'আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সারুক।' স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসংকোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহার অন্য যে ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম এ সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম, আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল; পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

মৃত্যুশোক

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেক দিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু, তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়— তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম; তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!' তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল; কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর এক দিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন

না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু, আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর-কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল! চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম, সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল— এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—

যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণ-পূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারি দিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়ে ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হইতে পারিত, এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার

সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা; সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল, তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে? নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলো বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টরলোনি মনুমেণ্ট্‌টা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ওইটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল; পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ

বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরি-তরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর, মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে; অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্‌ পাগলি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দম্‌কায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না, পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরও মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও

যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়— সেই শিশিরে-ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা গলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়!

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-মনে!

মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে-যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এ দিকে সেই কর্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ: সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই-করা শরৎ; আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহা-সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া

পেঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে, এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।

* ১৩১৮-১৯

ভারি কাজে ব্যস্ত। হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয় তা হলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে আমি সকলের চেয়ে চড়া দাম ডাকি—এত কাজ! এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা? এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বসলে কী বিপদ ঘটে জানো? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাৎড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না; যদি বা বাক্স খোলা গেল, তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্তভাবে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করতে করতে, হুট্‌-পাট্‌ ক'রে, যেখানে যত ভাব গোছানো ছিল খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলট-পালট বিপর্যস্ত করে ফেলি—এটা তুলছি, ওটা তুলছি, কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায় না।

Christmas ফুরোলো, আবার দেখতে দেখতে আর-একটা উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্ছি নে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। তার কারণ এই হতে পারে যে, পাছে পুরানো বৎসর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, তার চলে যাবার ব্যাঘাত হয়—আর, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তার ঘরে ঢুকতে বিশেষ কষ্ট হয়। এখেনে শীতে জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ থাকে কিনা, সুতরাং দরজা খুলে না দিলে নতুন বৎসর ঘরে ঢুকতে পান না, বাইরে দাঁড়িয়ে সর্দিতে মারা যান।

নতুন বৎসরের আগমনে আজকের দিনের মুখশ্রী বড়ো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। আজ ভারি মেঘ ও অন্ধকার করে আছে। নতুন বৎসরের উপক্রমণিকা যদি এই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তবে এর উপসংহার না জানি কিরকম হবে।

টর্কি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লন্‌ডনে এসেছি। টর্কিতে বসন্তের সঙ্গে প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখেছিলেম। সেই উৎসব থেকে লন্‌ডনের এই ব্যস্ত ভাবের মধ্যে এসে পড়ে বড়ো ভালো লাগবে না। এখন আমি Mr. K-র পরিবারের মধ্যে বাস করি। Mr. K, Mrs. K, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও Toby বলে এক কুকুর হচ্ছে এই বাড়ির জনসংখ্যা। Mr. K হচ্ছেন একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পেকে গিয়েছে। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। যেমন অমায়িক স্বভাব তেমনি অমায়িক মুখশ্রী। তাঁর পরিবারের সকলেই বড়ো ভালো লোক। আমার সঙ্গে অল্প দিনের আলাপেই বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। Mrs. K আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয় আমি কম করে খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে বড়ো ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দুবার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন—তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো Miss K ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ তৈরি হয়েছে কিনা তদারক করেন;

অগ্নিকুণ্ডে দু-চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল করে রাখেন। খানিক ক্ষণ বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো K শীতে হিহি করতে করতে খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত পা পিঠ বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুম্বন করলেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হল। লোকটা ভারি প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি-তামাসা হল, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যে দিন Mr. Kর আগে উঠবেন সে দিন Mr. K তাঁদের পাঁচ সিকে দেবেন, আর যেদিন Mr. K তাঁদের আগে উঠবেন সে দিন Mr. Kকে তাঁদের চার আনা দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হত তবু Mr. Kর তাঁদের কাছে প্রায় দু-তিন পাউন্ড্ পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে Mr. K তাঁর পাওনার জন্যে দাবি করেন। কিন্তু তাঁর দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। Mr. K বলেন 'এ ভারী অন্যায়!' তিনি আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন, 'আচ্ছা, Mr. T, তুমিই বলো, এরকম debt of honour ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা!' যা হোক, রোজ-রোজই Mr. Kর পাওনা বাড়ছে। তার পরে Mrs. K এলেন। আমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট্ প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। Mr. Kর বড়ো ছেলে আমাদের আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর Mr. Kর ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেক ক্ষণ হল খাওয়া শেষ করেছে। একজনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। Toby কুকুরটি অনেক ক্ষণ হল এসে আগুনের কাছে আরামে বসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া রোঁওয়া। রোঁওয়াতে চোখ মুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির কতকগুলি নবাবি চাল হয়েছে। drawing-room ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। কথা নেই বার্তা নেই, ঘরের সকলের চেয়ে ভালো কেদারাটিতে অম্লানবদনে লাফিয়ে উঠে বসা হয়; ঘরে যদি একঘর লোক হয় তবুও বসে আছে, এক ব্যক্তির হয়তো বসবার জায়গা হচ্ছে না, কিন্তু Tobyর তাতে আসে যায় না। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ দৃক্‌পাত না ক'রে দিব্য আরামে চৌকিতে তিনি বসেছেন; তার এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসে অমনি তিনি মহা বিরক্ত হয়ে দর্পে সে চৌকি থেকে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাশের কৌচটির ওপরে গিয়ে বসে পড়েন। সকাল বেলায় ব্রেক্‌ফাস্টের সময় তাঁর তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বসে থাকে; যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না করলে সে কোনো মতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড়ো ভালোবাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে আমি বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে; যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে দিই, চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায় একবার আমার মুখের দিকে চায়। মনোগত

ভাবটি এই যে, 'প্রাতঃকৃত্য সারা হয়েছে? তা বেশ হয়েছে। এখন আমার বিস্কুটটি একবার গড়িয়ে দেও; আমার বড়ো খেলা করবার ইচ্ছে গিয়েছে।' এক-এক সময় সন্ধে-বেলায় পেছন দিকের দুটো পা গুটিয়ে সুমুখের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে মহা-চিন্তিতভাবে বৃদ্ধ আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়, Tobyর হুঁশ নেই। তখন তাকে আদর করতে যাও, মাথায় হাত বুলোও, মহা-অসন্তুষ্ট-ভাবে গোঁ গোঁ করে, মাথা নাড়ে। 'বিরক্ত কর কেন? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে, এখন উনি আমার মাথায় হাত বুলোতে এলেন!' এ ব্যক্তি পূর্বজন্মে কী ছিল বলো দিকি। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ছিল নাকি? যা হোক, সাড়ে নটার মধ্যে আমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ শেষ হয়। তার পরে Mrs. K হাতে দস্তানা প'রে দাসীদের নিয়ে চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত জিনিসপত্র গোছানো, ঘর দ্বার পরিষ্কার করানো ও সমস্ত গৃহকার্য তদারক করে উঠানাবা করেন। একবার রান্নাঘরে যান—সেখেনে শাকওয়ালা রুটিওয়ালা মাংসওয়ালার বিল দেখেন, যাকে যার চুকিয়ে দেবার দেন। মাঝে মাঝে ওপরে এসে Mr. Kর সঙ্গে গৃহকার্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথাস্থানে আছে কিনা দেখেন; ভালো মাংস এনেছে কিনা, ওজনে কম বেশি হয়েছে কিনা সেসব দেখেন। রাঁধুনির সঙ্গে মাঝে মাঝে রান্নাতে যোগ দেন। এই রকম ব্রেক্‌ফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেজো মেয়ে Miss J দেখি প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে drawing-room সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিসপত্রে যা কিছু ধুলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে ঝেড়েঝুড়ে সাফ করেন। এখানকার অনেক ভদ্রপরিবারেই drawing-roomএর জিনিসপত্র সাফ করবার ভার বাড়ির মেয়েরাই নেন, দাসীদের হাতে পাছে জিনিসপত্র ভেঙে যায় বা ভালোরূপে পরিষ্কার না হয়। তৃতীয় মেয়ে Miss A বালিসের আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, এক-একদিন বাজনা ও গান অভ্যেস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে-বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের lunch খাওয়া আছে। Lunch সমাপন করে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে visitorদের আসবার সময়। হয়তো Mrs. K, Mr. Kর এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চশমা প'রে drawing-roomএ বসে সেলাই করছেন। Miss A একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি করে দিচ্ছেন। Miss J একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বসে হয়তো Green's *History of the English People* পড়তে নিযুক্ত হয়েছেন। বড়ো Miss K হয়তো তাঁর কোনো আলাপীর বাড়িতে visit করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন visitor এলেন। দাসী drawing-roomএ এসে বললে 'Mr. ও Mrs. A'। খানিকক্ষণ কথোপকথন হলে পর তাঁরা চলে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনার খাওয়া হয়। ডিনার খেয়ে সাতটার সময় আমরা সবাই মিলে drawing-roomএ গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বসলুম। এক-এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক

ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না, কিন্তু তবু সত্যি কথা বলতে কী, এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A বাজান। Miss A আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধেবেলায় আমাদের একটু-আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা করে ৬ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-এক দিন প্রায় ১১৷৷-১২ হয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে।

ছেলেদের সঙ্গে আমার ভারি ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে Uncle Arthur বলে। Ethel ছোটো মেয়েটি আমাকে ভারি ভালোবাসে। তার ইচ্ছে যে আমি কেবল একলা তারই Uncle Arthur হই। তার ভাই Tom যদি আমাকে Uncle Arthur বলে তবেই তার ভারি কষ্ট উপস্থিত হয়। একদিন Tom তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, 'He is my Uncle Arthur!' এই তো Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে তার ছোটো ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। কত করে তাকে থামাই। Tom একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভালোমানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারী-ভারী। সে এক-এক সময়ে আমাকে এমন এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে কী বলব। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা, Uncle Arthur, ইন্দুররা কী করে?' Uncle Arthur বললেন, 'তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।' সে একটু ভেবে বললে, 'চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?' Uncle বললেন, 'তাদের ক্ষিদে পায় ব'লে।' শুনে Tomএর বড়ো ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অন্যায়। আর-একটি কথা না বলে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, 'Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!' এমন মজা ক'রে বলে যে সে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য। Ethelএর মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন Lady। সে কেমন গম্ভীর ভাবে কেদারায় গিয়ে ঠেস দিয়ে বসে। Tomকে এক-এক সময়ে ভর্ৎসনা করে বলা হয়, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না।' একদিন Tom পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেম, 'ছি! কাঁদতে আছে!' অমনি Ethel আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক করে বললে, 'Uncle Arthur, Uncle Arthur, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদি নি।' উঃ! বয়স কত!

Mr. N ডাক্তারের আর-এক ছেলে বাড়িতে থাকেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আফিসে থাকেন। কিন্তু আফিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো-একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ কী জানো? তিনি Miss Iএর সঙ্গে engaged। তাঁদের দুজনে কোর্ট্‌শিপ চলছে। রবিবার দু বেলা তাঁকে নিয়ে তাঁর চর্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধেবেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন আছে। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসরকাল কাটাবার জন্যে অন্য কোনো জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধেবেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু Mr. N পরিষ্কার করে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট

brush করে ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে, ছাতা হাতে করে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল আর তাঁর ভারি কাশি হয়েছিল—মনে করলেম আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না। কী আশ্চর্য! সাতটা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে নেবে এসেছেন। তাঁর বাপ মা বোনরা সবাই বললে 'It is very foolish of you N', কিন্তু বললে হয় কী! 'নদী যবে চলে সিন্ধুপানে কার সাধ্য রোধে তার গতি!' নদী তো বাপ মা বোনের উপরোধের শিলাবাধা লঙ্ঘন ক'রে, কাশি হাঁচি ও রুমালে সর্দিঝাড়ার কলস্বর করতে করতে সিন্ধুর উদ্দেশে চলল। (উপমা কেমন হল বলো দেখি।) তখন বৃষ্টি পড়ছে, বরফ পড়ছে, রাস্তায় কাদা জমেছে। তার পরদিন সকালে সর্দিতে বেচারি মাথা তুলতে পারে না। এমন যন্ত্রণা!

যা হোক, আমার এই K-পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সে দিন Miss N আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল। 'ব্যক্তিটা কিরকম হবে না জানি! তার সাক্ষাতে আবার কিরকম আদব-কায়দা রেখে চলতে হবে! আমাদের কথা সে ভালো করে বুঝতে পারবে কিনা!'—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের তো রাতে ঘুম হয় না। যেদিন আমার আসবার কথা ছিল সেই দিন Miss A ও Miss J তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পরে হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে একটা পোষমানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেছে—সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না যে তার কখনো মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাঙের শিক-কাবাব বা খোকা-খুকি-ভাজা খাওয়া অভ্যেস ছিল—মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে না—তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। Miss J বলেন যে, প্রথম-প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন তবুও দু দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো তাঁর ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন! তার পরে যখন আমার মুখ দেখলেন তখন—তখন কী? আমার তো বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে এই মুখ দেখে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওই তো সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি। কেন, কী মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারও মাথা ঘোরে নি সত্যি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের মাথা আছে?

যা হোক, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধেবেলা বেশ আমোদে কেটে যায়—গান, বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারি বন্ধুত্ব হয়েছে। আর Ethel তার Uncle Arthurকে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

* শ্রাবণ ১২৮৭

ছিন্নপত্র

বন্দোরা সমুদ্রতীর। [২৪ জুন ১৮৮৬ ?]

ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগতই বৃষ্টি। এখনো বিরামের লক্ষণ নেই। আমার বারান্দার কাঁচের জানালা সমস্ত বন্ধ ক'রে চুপ মেরে বসে আছি। নিতান্ত মন্দ লাগছে না, আপনাতে আপনি বেশ এক রকম আচ্ছন্ন হয়ে আছি— কোনো প্রকার emotionএর প্রাবল্য নেই—ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু সমস্তই বাহিরে। অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে সাদা হয়ে উঠছে। সমুদ্রকে দেখে আমার মন হয় কী-একটা প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা প'ড়ে আস্ফালন করছে—আমরা নিশ্চিন্ত মনে তীরে দাঁড়িয়ে আছি— সমুদ্রের বিস্ফারিত গ্রাসের মুখেই আমরা ঘরবাড়ি বেঁধে বসে আছি। আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টানছি, অথচ অসহায় সিংহ কিছু বলতে পারছে না—একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তা হলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ তার লেজ আছড়াচ্ছে, আমরা কেবল দু হাত তফাতে দাঁড়িয়ে হাসছি। একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল বল। তরঙ্গগুলো যেন দৈত্যের মাংসপেশীর মতো ফুলে উঠছে। পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙায় জলে লড়াই চলছে—ডাঙা ধীরে ধীরে নীরবে এক-এক পা ক'রে আপনার অধিকার বিস্তার করছে, আপনার সন্তানদের ক্রমেই কোল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে—আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত করে মরছে। মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল— তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃদ্ধ সমুদ্র তার শুভ্র ফেনা নিয়ে King Learএর মতো ঝড়ে ঝঞ্ঝায় অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করছে।

সোলাপুর। অক্টোবর ১৮৮৫

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব—বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেক্‌ড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ঘড়্‌ হুড়্‌মুড়্‌ হৈহৈ, সেই মাছি-ভন্‌-ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে; কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে— তার উপরে আবার এক পাঁচিল-দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা কজনে মিলে অশোককাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম সেখানে এক প্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipalityর দুর্গের মধ্যে বন্দী হতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম, কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোষ-

শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিণী তাকিয়া—সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে—কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমার সেই হার্মোনিয়ম! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্র্যাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে—ভাবছে, ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে, রবি বাবু—উ—উ—উ। রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন, এই যা—আ—আ—ই।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? আপনি কি এখন ইহজন্মের মতো সব্‌ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্বিস-সরোবরে এক রকম ডুব মারলেন? যাক, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে আমরা আ[illegible]নে বিহার করি আর বলাবলি করি, 'আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

দার্জিলিং। সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদে নি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা—জিনিস-পত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন-সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র ladies' compartmentএ তোলা গেল—কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি—তবু ন দিদি বলেন আমি কিছুই করি নি। অর্থাৎ, আমার মতো ডাগর পুরুষমানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platform-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষমানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠান্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের

ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের—নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়—এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়—অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক—আমি বিবিধ-বিচিত্র-মূর্তি বাক্সর মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিলুম। সুরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটা ছবি আঁকতে। যাক। তার পরে আমি আর-একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই ব'লে মনে হয়—তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল ?' লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত; সে হয়তো বলত, 'তিনি দার্জিলিঙে ছিল কিন্তু তখন দার্জিলিং বড়ো ঠান্ডা ছিলেন ব'লে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এ রকম বাংলা জোগালো না।

সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাস-উক্তি—exclamations। 'ওমা কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'—কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা, দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না, কিন্তু তার জন্য রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। গাড়ি চলতে লাগল, বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠান্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে নদিদির সর্দি, তার পরে বড়দিদির হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্‌, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি। মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিস-পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্যে বিবিধ বন্দোবস্ত করা—এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ নদিদিরা ডুলিতে চ'ড়ে, বাড়িতে গিয়ে, শালটি মুড়ি দিয়ে, সোফায় শুয়ে, বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পুরুষমানুষের মতো নয়।

শিলাইদহ। ১৮৮৮

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধু ধু করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না। কেবল মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়, আবার অনেক সময়ে বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে

কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি। পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য—নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবা মাত্র দেখা যায় স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর-এক পারে প্রলয়।

য়ুরোপযাত্রী

২২ আগস্ট্ ১৮৯০। তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্ছে; দেখে মনে হল আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত ব্যাকুলবাহু বিক্ষেপ করে ডাকছেন; বলছেন, 'আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস্ নে; এখনো ফিরে আয়।'

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্তশয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠল; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

[২৫ আগস্ট্] সী-সিক্‌নেস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগস্ট্। শনিবার থেকে আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয় নি— সূর্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অস্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে— জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল— কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনো মুহূর্তকে অনন্ত কখনো অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানা প্রকার বিপরীত ব্যায়ামবিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা যুগ বলব, স্থির করতে পারছি নে।

২৯ আগস্ট্। জ্যোৎস্নারাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাদের এক প্রান্তে চৌকিদুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্যবিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্নমরীচিকার মতো লাগছে।

শনিবারটা [৩০ আগস্ট্ ১৮৯০] চলছে। মাঝে মাঝে পাহাড় অনুর্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনহীন, মাঝে মাঝে তীরশূন্য সমুদ্র— এই রকম করে সূর্যাস্তের সময় হল। জাহাজ চলছে, এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া খেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণস্বরে পাশ কাটিয়ে একটুখানি সরে যাচ্ছে— আর বিকেলের দিকে বাতাসও একটু একটু বইতে আরম্ভ করেছে— জগতের আর-সমস্ত স্বপ্ন দেখছে— দুই-একটা শাদা লঘু মেঘখণ্ড তারাও নড়ছে না।—

সূর্য অস্ত গেছে। আকাশের এবং জলের চমৎকার রঙ হয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখা মাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি নিটোল সুডোল কোমল পরিপূর্ণ যৌবনের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এমন একটা জায়গায় এসেছে যার ঊর্ধ্বে

আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই, যা অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। সন্ধের সময় চিল আকাশের যে-একটা সর্বোচ্চ নীলিমার সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত পাখা সমতল রেখায় বিস্তার করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়— চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেই রকম একটা চরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার রঙ হয়েছে তাকে আকাশের ছায়া বললে যেন ঠিক বলা হয় না— যেন এই মাহেন্দ্রক্ষণে সন্ধ্যাকাশের স্পর্শ লাভ ক'রে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ অন্ধকার গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়েছে— সে কতটা তার, কতটা আকাশের বলা যায় না। আমাদের কত কবিতা কত গান আর-এক জনের দুখানি নেত্রের ছায়া— এও সেই রকম। সমুদ্রের এবং আকাশের সেই আশ্চর্য রঙ দেখে কেবল মনে হচ্ছিল ঠিক এইটেকে ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা কোথায়? আবার তখনি মনে হল, দরকার কী? আমার মধ্যে এ চঞ্চলতা কেন? এই সমুদ্রের এবং আকাশেরই মতো আমার মনের সমুদয় চেষ্টা নির্বাণ লাভ করে না কেন? হৃদয়ের সমুদয় তরঙ্গকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে কেন কেবল চেয়ে থাকি নে? এই বৃহৎকে ছোটোর মধ্যে বেঁধে আপন আয়ত্তের মধ্যে পেতে চাই কেন? সবই ধরতে হবে, রাখতে হবে— এই কেবল চেষ্টা! অনেক সময় এই রকম দুশ্চেষ্টার বশে, যতটুকু পাওয়া যেতে পারে তাও ভালো করে পাবার সময় থাকে না।

কিন্তু মনে হয় সমুদ্র এবং আকাশের মধ্যেকার এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকু যদি পারিজাত পুষ্পের মতো তুলে নিয়ে কারও হাতে না দিতে পারি তবে কিছুই হল না। এই আলো, এই শান্তি, কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, কিন্তু মানুষের ভালোবাসার উপরে এই আলো ফেলবার জন্যে। ঠিক এই উজ্জ্বল ম্লান নিভৃত উদার সন্ধ্যার ঠিক মর্মস্থলে যদি আমরা দুজনে দাঁড়াতে পারি তা হলে আমরা যেন আপনাদের আরও বেশি বুঝতে পারি, আরও বেশি ভালোবাসি। কারণ, ভালোবাসা বোঝাতে গেলে সৌন্দর্যের ভাষা চাই এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতা চাই। এমন আলোক, এমন বর্ণ, এমন ভাষা আমরা নিজের মধ্যে কোথায় পাব! এই বৃহৎ প্রকৃতি যখন তার একটা চরম মুহূর্তে আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে আমাদেরই অন্তরের কথা ব্যক্ত ক'রে বলে তখন আমাদের আর-কোনো চেষ্টার আবশ্যক করে না— কেবল ভালো-বাসবার পূর্ণ অবসর পাওয়া যায়, ভালোবাসা প্রকাশ করবার আবশ্যকটুকুও থাকে না। এ কথা হয়তো সকলে বুঝতে পারবে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্যি যে, ঐ আকাশ আমারই অসীম দৃষ্টির মতো এবং এই সমুদ্র আমারই ভালোবাসামুগ্ধ হৃদয়ের মতো— এই মুহূর্তে এই সমুদ্রে আমার আপনাকে ব্যক্ত করবার জন্যে একটি কথা বলবার আবশ্যক থাকত না। যদি এর অনুরূপ একটি কথা থাকত তা হলে সেইটি লিখে নিয়ে যেতুম, যে শুনত সে সমস্ত বুঝতে পারত।

৩১ আগস্ট্। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃস্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি, এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়ে কল-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু এই-যে দৃশ্য, এই-যে গুটিকতক চঞ্চল

ছোটো ছোটো মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি-উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম। গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

দুই ধারে কেবল আঙুরের খেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের, পাতাগুলো ঊর্ধ্বমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায় এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চষা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চর্চ্-চূড়া-মুকুটিত সাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্রদর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন; খেতগুলি খণ্ড-প্রস্তরের বেড়া-দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ; দূরে দূরে দুটো-একটা সঙ্গীহীন ছোটো সাদা বাড়ি।

সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাই নি। মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা ঐ ইতালিয়ান যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ইতালিয়ানরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্ত-ভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ এবং ঐ আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রঙ— অতি বেশি সাদা নয়।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলুম, আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে। চারি দিকে আঙুর জলপাই ভুট্টা ও তুঁতের খেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখছি, খেত-ময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারই উপর ফল-গুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে। রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটির; এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদূরে একটি ছোটো বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বতশ্রেণী দেখা দিয়েছে। বামে ঘনচ্ছায়া-স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত-সমেত এক-একটা নব নব আশ্চর্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। পর্বত-শৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক-একটি ছোটো ছোটো গ্রাম।

এইবার ফ্রান্স্‌। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী। তার পূর্বতীরে ফার-অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে, ফেনিয়ে ফুলে, নেচে, কলরব ক'রে পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করছে। বরাবর পূর্বতীর দিয়ে একটি পার্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার অন্তরালে। বিচিত্র কৌতুকচাতুরী। আবার হয়তো যেতে যেতে কোন্‌-এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষা-কুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্‌লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক-সবজি। মনে হয় কেবলই বাগানের পর বাগান আসছে। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃংখলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালো-বাসবে তাতে আর কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান-প্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর-এক দিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীন ভাবে শুয়ে— য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে।

এ কী চমৎকার চিত্র! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্‌লার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংহত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বন-বাসী জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ কী।

১১ সেপ্টেম্বর। লন্‌ডনে পৌঁছে সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল। প্রথমে লন্‌ডনের মধ্যে আমার একটি পূর্বপরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে, 'তিনি এ বাড়িতে থাকেন না।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় থাকেন?' সে বললে, 'আমি জানি নে, আপনারা ঘরে এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি।' পূর্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে— সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই, সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষা-শালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে-লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার

বন্ধু এখন লন্ডনের বাইরে কোনো-এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হৃদয়ে আমরা সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম। মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম, সেই অমুক এখানে আছে তো? দ্বারী উত্তর করলে, না, সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম, কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই-সমস্ত জানা লোকেরা আর কেউ কারও ঠিকানা খুঁজে পাবে না। জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময়ে বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে হে?' আমি নমস্কার করে বললুম, 'আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী।'—কেমন করে প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি—আমার সেই গাছগুলো কত বড়ো হয়েছে! আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর-একটা ঘর। আর সেই-যে ঘরের সম্মুখে বারান্ডার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়তো ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেলতে কারও মনে পড়ে নি।

আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার সময় পেলাম না। লন্ডনের সুড়ঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে তাই অবলম্বন ক'রে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু, পরিণামে দেখতে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চ'ড়ে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ-নামক দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, আমাদের গম্যস্থান যে দিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সে দিকে নয়, পুনর্বার তিন চার স্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য স্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংস্টোন অথবা স্টান্‌লির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জন করতে চাই তো নিশ্চয় অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে, তিনি যতই কল্পনার চর্চা করুন-না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লন্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নে। কিন্তু, একটা আশঙ্কা আছে, এরকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়, এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্‌ আছে।

৫ অক্টোবর। কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়,

আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য প'ড়ে। অতএব সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই। তিন মাস, ছ মাস কিম্বা ছ বছর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলছে ফিরছে, যাচ্ছে আসছে; খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য হোক-না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না, বরং তাতে মনকে সর্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা, ভালো রে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ ক'রে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম তা হলে এখানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। অতএব স্থির করেছি, এখন বাড়ি ফিরব।

৭ অক্টোবর। 'টেম্‌স্‌' জাহাজে একটা কেবিন স্থির ক'রে আসা গেল। পরশু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক হতে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট দ্বীপের পার্বত্য তীর এবং ভেন্ট্‌নর শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠরা ধ'রে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেক দিন ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেছে। উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। এক রকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি, এই সূর্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম, দু ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডান দিকের বালুকারাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবন্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্যালোকে এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগড়ি দেখা যাচ্ছে। কেউ-বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউ-বা নমাজ পড়ছে, কেউ-বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মরুভূমির একখণ্ড ছবির মতো মনে হল।

৩ নবেম্বর। অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়ি-সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম। তাতে করে সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে দিলুম, ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, 'খেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!'—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ একচোট ভর্ৎসনা করেছি; সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এসে, স্নান করে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে পরিহাস করবেন, সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল তখন, যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম, তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

১৮৯০

দেখলুম জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লেমেন্ট চলছে—সকলই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

দেখে আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়-সহকারে বলে—হাঁ, এরাই রাজার জাত বটে! আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা আকিঞ্চনদারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও, মানুষের শক্তি আপন পেশী এবং স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে খেটে মরছে। জাহাজে বসে ভাবতুম এই-যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ বা বিশ্রামসুখে কেউ বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত, কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নি-কুণ্ড জ্বলছে, যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে সংক্ষিপ্ত করছে, সেখানে কী অসহ্য চেষ্টা! কী দুঃসাধ্য পরিশ্রম! মানবজীবনের কী নির্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চলছে! কিন্তু, কী করা যাবে! আমাদের মানব-রাজা চলেছেন; কোথাও তিনি থামতে চান না; অনর্থক কাল নষ্ট কিম্বা পথকষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালায় গৃহে সর্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশ দিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তকালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সম্বৎসরকাল চেষ্টা চলছে। এরকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার শৌখিনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্বহভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood -রচিত *Song of the Shirt* সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপসংগীত।

* ১২৯৮

ছিন্নপত্রাবলী

কালীগ্রাম। জানুয়ারি ১৮৯১

ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছ-পালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ-আশঙ্কা-ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে, এই-সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই! আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে! আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে! জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে!' এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরও বেশি ভালোবাসি— এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই।

সাজাদপুর। ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

আমার সামনে নানা রকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সমুখে, খালের ও পারে, একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটি-তিনেক খুব ছোট্ট ছোট্ট ছাউনি মাত্র— তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই। ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে— কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনো প্রকারে জড়পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কতকটা gipsyদের মতো। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শুয়োর, গোটাদুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরণের। কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে; বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে। বেশ ছিপ্‌ছিপে লম্বা— আঁট-সাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থাৎ, বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুত তাল আছে— আমার তো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে— মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট্ট আয়না

নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে যত্নে সিঁথেটি কেটে চুল আঁচড়াচ্ছে। কেশবিন্যাস সমাধা হলে পরে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু-তিনবার ক'রে মোছা হল, তার পরে আঁচল-টাঁচলগুলো একটু ইতস্তত টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল; তার পরে একটু-আধটু কাজে হাত দিতে লাগল। দেখে আমার বেশ মজা মনে হয়। এই এরা, যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পরস্পরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে—এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারি জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত্র খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ এক-রকম নতুন রকমের জীবন; অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপিলে ঘরকর্না সমস্তই আছে। কেউ যে এক দণ্ড কুঁড়ে হয়ে বসে আছে তা দেখলুম না—একটা-না-একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরলো তখন খপ্‌ করে একজন মেয়ে আর-একজন মেয়ের পিঠের কাছে বসে তার ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে ঐ ছোটো তিনটে দর্মা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে বক্‌ বক্‌ করে গল্প জুড়ে দিলে, সেটা আমি এত দূর থেকে ঠিক নিশ্চিত বলতে পারি নে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে-আটটা নটা হবে—রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া নেকড়াগুলো বের করে এনে দর্মার চালের উপর রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্তের মতো করে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মতো পড়ে ছিল—সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল—তাদেরই এক-পরিবারভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে তারা প্রাতঃকালের ছোটা-হাজরি -অন্বেষণে চতুর্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি—এমন সময় বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম—বেদে-আশ্রমের সম্মুখে লোক জড়ো হয়েছে এবং ওরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন করে বিষম গালমন্দ দিচ্ছে—কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিতভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম কী-একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে, তাই পুলিসের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা বসে বসে আপন-মনে বাঁখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা বসে আছে—এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরমনির্ভীক চিত্তে দারোগার মুখের সামনে বারবার বাহু আন্দোলন করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো-আনা পরিমাণ কমে গেল—অত্যন্ত মৃদুভাবে দুটো-একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল—অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি এই বলে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।'

আমি ভাবলুম আমার বেদে-প্রতিবেশীরা এখনি ঝুঁঝি খুঁটি দর্মা তুলে, পুঁটুলি বেঁধে, ছানাপোনা নিয়ে, শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই— এখনো তারা নিশ্চিন্তভাবে বসে বসে বাঁখারি চিরছে, রাঁধছে-বাড়ছে, উকুন বাচছে।

আমার দরবারেও দেখেছি যখন কোনো মেয়ের নালিশ থাকে, সে ঘোমটায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে কাঁশির মতো যে গলাটি বের করে তার মধ্যে ভয় সংকোচ কিম্বা কাকুতিমিনতির ভাব লেশমাত্র নেই। একেবারে পুরো আবদার এবং পরিষ্কার তর্ক। স্পষ্ট করে বলে, 'নায়েবমশায় আমার সুক্ষ্ম বেচার করে না!' তাকে উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় কিছুই বুঝিয়ে উঠতে পারা যায় না; সে কেবলই বলে, 'আমি ব্যাধবা, আমার নাবালক ছাওয়াল।' তার আর কোনো উত্তর নেই। তার সঙ্গে তর্ক করব কি, আমার হাসি পায়। সে আবার আধখানা মুখ ফিরিয়ে ঘোমটার মধ্যে থেকে আড়চোখে আড়চোখে আমার মুখের ভাব দেখে। দরবারের মধ্যে যেদিন একটা মেয়ে আসে সেদিন আসর সরগরম হয়ে ওঠে, পেয়াদার হাঁক-ডাক কমে যায়, অন্যান্য পুরুষ প্রার্থীদের নিজ নিজ নিবেদন জানাবার অবসর থাকে না।

চুহালি। জলপথে। ১৬ জুন ১৮৯১

এখন পাল তুলে দিয়ে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে, দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্ ঝুপ্ করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্ছে না— চারি দিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ শব্দ করছে, আর বাতাসের হুহু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম— নদীটি ছোট্ট, যমুনার একটি শাখা, এক পারে বহু দূর পর্যন্ত সাদা বালি ধু ধু করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই— আর-এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহু দূরে একটি গ্রাম। তোকে আব কতবার বলব— এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল, তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ— যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতি-বিস্ময়-পূর্ণ ছম্‌-ছম্‌-নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন— যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর— এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি— এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী,

এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে—এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি—এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে—তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই রূপকথার সুখ দুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম, এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।

শিলাইদহ। ১ অক্টোবর ১৮৯১

বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্‌তল্‌ থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল—ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষার স্নানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকোল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আম-বাগানে সন্ধের ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকোল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।

শিলাইদহ। ২০ আশ্বিন ১২৯৮

আজ দিনটি বেশ হয়েছে বব্‌! ঘাটে দুটি-একটি করে নৌকো লাগছে—বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই ক'রে নানা উপহার-সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাবু ঘাটের কাছা-কাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর শাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে ক'রে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের ক্ষেত মর্‌ মর্‌ করে কাঁপছে—আকাশে শাদা শাদা মেঘের স্তূপ—তারই উপর আম এবং নারকোল গাছের মাথা উঠেছে—নারকোলের পাতা বাতাসে ঝুর্‌ ঝুর্‌ করছে—চরের উপর দুটো-একটা করে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে—সব-সুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ,

এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝির্ঝিরে বাতাস এবং গাছপালা তৃণগুল্মে নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক রকম অভিভূত করে ফেলছিল। পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়— পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলে-ডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব যে সুস্বর তা নয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম— একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়—এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং যিশুখৃস্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে— কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না। উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

বোলপুর। ১৫ মে ১৮৯২

বেলি স্পষ্টই বলছে সে বিলেতের নীচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে—রেণুকা কোনো প্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করছে, এবং তাকে সামলে রাখা দায় হয়েছে। সে কেবল চতুর্দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে এবং অঙ্গুলির অনুগামী হবার চেষ্টা করছে— আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট্ ভৃত্য এসেছে সকলেই প্রায় সেই ক্ষুদ্র মহাপ্রভুকে নিয়েই নিযুক্ত আছে—এই ভৃত্যদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই তীব্র আর্তনাদে উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠছে। আমার পুত্রসন্তানটি নিস্তব্ধ নীরব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে— কী ভাবছে তা কারও বোঝবার জো নাই।

বোলপুর। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

তোকে পূর্বেই লিখেছি, অপরাহ্নে আমি আপন-মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধেবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথ-প্রদর্শক ক'রে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারই উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে— আমি ওরই মধ্যে একটুখানি কবিত্ব করে বললুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্মা লাগিয়েছে। সঙ্গীরা কেউ কেউ শুনতে পেলে না, কেউ কেউ বুঝতে পারলে না— কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে।' তার পর থেকে দ্বিতীয়বার আর কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে এক সার তালবন, এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে, সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করি নি যে তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল— কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটেগুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল— মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে— ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দৌড় দৌড়! মাঠ সমান নয়। এক-এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরও মুশকিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল— সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল! কেউ হাত ধরে, কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন— ব'লে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই-সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে-কুটিয়ে এলোথেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্তবস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যা হোক, একটা খুব শিক্ষা লাভ করেছি— হয়তো কোন্ দিন কোন্ কাব্যে উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে

দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে— কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যে কথা লিখতে পারব না। ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব, কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye-glasses ছিল। সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চশমা ধরে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। মনে কর্, যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চশমা এবং কোঁচা সামলাতুম, না, তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেক ক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি এ রকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কী রকম হত সে তো তোরা বেশ বুঝতে পারবি। বেশ-বিন্যাসেরই বা কি রকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না— কেবল মানসচক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী রমণী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ব-বনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন; পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় ব'লে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান ব'লে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান ব'লে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যকীয় জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত। আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ববন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভাণ করছে। ছাতা জুতো জামা-জোড়া চিরকাল থাকবে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি-সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে, কিন্তু ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেন্ট্ বেরোতে থাকবে।

শিলাইদহ। ২ আষাঢ় ১২৯৯

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারি ঘনঘটা মেঘ করে এল। কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তবু অন্ধ-কূপের মধ্যে দিনযাপন করব না— জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না— ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে— নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার

বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন-ময় নরনারীদের, আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি ক'রে কমে যাচ্ছে—অবশেষে এক সময় আসবে যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল-শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এই-রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।··· যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে

কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা -অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে, কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে—সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষুকর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। কী আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি! পরিপাটি ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদ্র—আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই। কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কী এ-সমস্ত কবিত্ব করছি—কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে—কনভেন্‌-শনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়—তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য, হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।

পুঃ—আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই—ভয় পাস নে, আবার চার পাতা জুড়ব না—কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষল-ধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

সাজাদপুর। ২৯ জুন ১৮৯২

তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7 p.m.এর সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্ করা যাবে। বাতিটা জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্-মাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্ট্‌মাস্টারের দাবি ঢের বেশি, আমি তাকে বলতে পারলুম না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ আবশ্যক আছে'—বললেও সে লোকটা ভালো বুঝতে পারত না। অতএব পোস্ট্‌মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্ আফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্-মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায়, আমি চুপ

করে বসে শুনি। ওর মধ্যে আবার বেশ একটুখানি হাস্যরসও আছে। তাই জন্যে খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এই-রকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।··· তিনি আমাদের মুন্সেফ বাবুর গল্প করছিলেন। ব্যাপারটা শুনে এবং তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে আমি হেসে হেসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। কথাটা হচ্ছে এই, মুন্সেফ বাবু হঠাৎ একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে শিব দেখতে পেয়েছেন। প্রথম দিন দেখলেন শিব, তার পরদিন দেখলেন কালী, তার পরদিন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি— সমস্ত বৈকুণ্ঠপুরী আমাদের সাজাদপুরের বটতলায় হঠাৎ নেবে এসেছে। তিনি সকলকেই ধরে ধরে বলছেন— 'ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন না! ঐ চোখ! ঐ জিব!' যারা তাঁর আমলা এবং অনুগত লোক তারা কাজে-কাজেই দেখতে পাচ্ছে, আর যাদের তাঁর প্রতি কিছু নির্ভর নেই তারা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের পোস্ট্‌মাস্টার সেই শ্রেণীর লোক। যেদিন ক্ষীর এবং কাঁঠাল দিয়ে ঠাকরুনের ভোগ হয় সেই দিন তিনি দেখতে পান— কিন্তু ক্ষীরটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তিনি মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোন্‌টাকে চোখ বলছিলেন মশায়?' মুন্সেফ বলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে ঐ উপরে!' পোস্ট্‌মাস্টার গম্ভীরভাবে বলেন, 'বটে! আমি ঠিক ঐটেকেই মাথা মনে করেছিলুম।' কোনোদিন বা মুন্সেফ তাঁকে বলেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি ওটা কি লক্ষ্য করে দেখছিলেন? আজ আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজবামাত্র কী যেন একটা গাছের উপর এসে বসল আর উপর থেকে দু-চার ফোঁটা জল পড়ল!' পোস্ট্‌-মাস্টার ভালোমানুষের মতো মুখ করে উত্তর দেন, 'আজ্ঞে হাঁ— গাছটা নড়েছিল বটে।' সে গাছটার চার দিক বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে— মুন্সেফ সেখানে দু বেলা পুজো দিচ্ছেন, শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, একজন সন্ন্যাসী বসে গাঁজা টানছে এবং চোখ বুজে বলছে 'ঐ কালী মায়ীকে দেখতে পাচ্ছি'। এক-একটা লোক আবার সেখানে গিয়ে মূর্ছা যায়, এবং মূর্ছিত অবস্থায় দৈববাণী বলতে থাকে। বিবিধপ্রকার বুজরুকি হতে আরম্ভ হয়েছে। পোস্ট্‌মাস্টার বলছিলেন, 'আপনাদের জমিদারিতে ম্যাজিস্ট্রেট এলে আপনারা দেখা করতে যান, আর এতগুলো দেবতা বটতলায় এসে আশ্রয় নিলেন— আপনার উচিত একবার ভিজিট পে করে আসা।' আমিও মনে করছি একবার মজাটা দেখে এলে হয়। যাই হোক, কিছুদিন এই হুজুকটা চললে সাজাদপুর একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমাদের লাভ আছে।

নাটোর। ২ ডিসেম্বর ১৮৯২

কাল ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ খেয়ে মহারাজার ওখানে গিয়েছিলুম, বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দুই ধারে মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলাদেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে— কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা— আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি স্নেহভারাবিনত মৌন ম্লান মিলন! অনন্তের মধ্যে যে-একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়— সমস্ত জলে স্থলে

আকাশে কী-একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা— অনেক ক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তা হলে কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়।

কিন্তু তোকে আমি এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন ক'রে অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!

শিলাইদহ। ৮ মে ১৮৯৩

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল— তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত— কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়— আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি-স্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।

শিলাইদহ। ১৬ মে ১৮৯৩

আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনও জন্ম-গ্রহণ করব? যদি করি, আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলি-বোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়তো আর-কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর-কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্যপরিবর্তন হবে— আর,

কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই—আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্ল্যামেন্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে—শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো, কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্‌ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি ছাঁটা-ছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না।

পতিসর। ২১ মার্চ্‌ ১৮৯৪

এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—এদের কোনো-রকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না—এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই ব'লে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারি মিষ্টি লাগে। এক এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিলুম, একজন প্রজা এসে বললে 'একটু খাড়া হও তুমি'—আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে, 'আমার জনম সার্থক হল।' সে বললে, তার কাশি এবং জ্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস ক'রে) ছিল, আজ অন্ন পথ্য করে আমার পদধূলি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গুণে আমার পায়ের ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে। ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে—আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে। কিন্তু এসব কথা তোকে পূর্বের চিঠিতে অনেকবার বলেছি—অতএব দূরে থেকে তোর কাছে এ-সমস্তই পুরাতন পুনরুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন করে ঠেকে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনোকালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

পতিসর। ২৪ মার্চ্‌ ১৮৯৪

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে, সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারি অসুবিধে হয়েছে,

শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।... আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই, তাকে আমার ভারি মিষ্টি লাগে— সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তোদের কারও একজনের মতো মনে হয়, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধেবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত— ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার, এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী, আমি কখন্ কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি, এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠান্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব সুস্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে— সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।

চাঁদের খণ্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে— চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত, কেবল গ্রামের গোটা-দুই কুকুর ওপার থেকে ডাকছে, আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বলছে, আর সব জায়গায় আলো নিবেছে। নদীতে একটু গতি মাত্র নেই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্তিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।

শিলাইদহ। ৬ জুলাই ১৮৯৪

কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি, পাঁচ লাইন লিখেছি কি না, এমন সময় মৌলবী এসে উপস্থিত। সে আমাকে লিখতে দেখে প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল 'দোঠো কথা' বলে সে চলে যাবে— তার পরে সেই 'দোঠো কথা' বলতে ঠিক দোঠো ঘণ্টা কাটিয়ে সে যেমন চলে যাচ্ছে অমনি ডাঙা থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল— 'মহারাজ, আজ এক-সপ্তাহ-কাল দর্শনপ্রার্থী হয়ে আছি, কিন্তু দৌবারিকগণ নিষেধ করছে।' ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন। 'দৌবারিক'কে নিষেধ করতে নিষেধ করলুম। তখন একটি গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে এক মস্ত কাগজ বের করলে। ভাবলুম দরখাস্ত। তার পরে দেখি স্বয়ং সেটি উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। প্রথম ছত্র পড়বামাত্রই বোঝা গেল সেটি কবিতা। তাতে ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনিবাসী হরির গুণগান করছেন। আমি গম্ভীর হয়ে বসে শুনতে লাগলুম। যতক্ষণ হরি বৈকুণ্ঠে ছিলেন ততক্ষণ কবিতা ত্রিপদীতে চলছিল, তার পরে দেখি হরি হঠাৎ 'জগৎসংসারে-খ্যাতা রাজধানী কলিকাতা'য় ঠাকুর উপাধি-রক্ষা পূর্বক দ্বারকানাথ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন— কবিতাও ত্রিপদী থেকে ক্রমে পয়ারে নেমে এল। পয়ার ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের স্তব সমাধা করে যখন রবীন্দ্রনাথে এসে দাঁড়ালো

তখন আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলুম। আমার কবিত্ব আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে এবং তাতে করে অজ্ঞান এবং দারিদ্র্য -অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, এ তুলনাটা যতই সুন্দর হোক, এ সংবাদটা আমার কাছে নূতন বলে ঠেকল। আর যাই হোক, বদান্যতার খ্যাতিটা প্রচার হওয়া কিছু না। আমি তাঁকে বলে দিলুম, 'কাছারিতে যাও, আমার অন্য কাজ আছে।' সে লোকটি বললে, 'আপনার কাজ আপনি করে যান, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি'—ব'লে বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে অত্যন্ত অবোধ জন্তুর মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; আমার সংকুচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড়্সুড়্ করতে লাগল। তাকে বারম্বার যেতে বললুম। তখন সে বললে, 'কী দিতে ইচ্ছে করেন এই কাগজে লিখে দিন, আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁকেও শুনিয়ে আসি।' আমি মনে মনে ভাবলুম, আমারও এই ব্যাবসা, আমি কবিতা শুনিয়ে পয়সা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়— ব্রাহ্মণকেও ফিরতে হল। শ্রীহরির চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে। শ্রীহরির এই অবতারটি, যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন। সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার ব'লে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে— 'মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিস্টীরিয়া (হিস্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন; তাঁরা বলেন এতদূর কি কখনো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।' —এইরকমভাবে চলল। আমি যখন তাকে বললুম 'এইবার তুমি কাছারিতে বিশ্রাম করো গে' সে বললে, 'আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ন মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম— দেখতে যে পাব সে কি আর আশা ছিল!' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগল; ক্রমে, তার প্রতি তার পূর্বপ্রভু জ্যোতিদাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে প'ড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। সে কী কী কাজ করেছিল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কী কী কথা বলেছিল এবং সে তার কী কী উত্তর দিয়েছিল তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগল। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল; পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল— দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুষ্টিয়া থেকে আর-একটি দর্শনপ্রার্থী যখন এল তখন সে 'কাল প্রাতঃকালে' বাকি কথাগুলো বলতে আসবে ব'লে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসে নি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চিতে ব'সে বক্তৃতার অবসরপ্রতীক্ষায় আছেন।

কলকাতা। ১৫ জুলাই ১৮৯৪

স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না— ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল।

কলকাতা। ১৬ জুলাই ১৮৯৪

সদ্যোনিদ্রোত্থিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগৃহের মেজের মাদুরের উপরে প'ড়ে প'ড়ে কলরব করবার চেষ্টায় আছে। সেটা প্রায় ঠিক পূর্ববৎই আছে, গাল-দুটো সেই রকম ফুলো-ফুলো, চোখ-দুটো সেই রকম অবুঝভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করছে— ঘাড়ের উপর মাথাটা সেই রকম সর্বদাই টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করছে। সব-সুদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মতো বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করছে। তাকে কোলে তুলে নেওয়া গেল। প্রথমটা খানিক ক্ষণ যেন পূর্ব-পরিচয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করছিল— অল্প একটুখানি থম্‌থমে ভাবে আমাকে কপোলনিমগ্ন দুই চক্ষুর দ্বারা পর্যালোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে, কোনো বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও, একটু একটু করে স্মিতহাস্য চলছিল। ক্রমে অনতিকাল মধ্যেই খরনখরসুদ্ধ মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মুখ চোখ চুল গোঁফ দাড়ি যা সম্মুখে পড়তে লাগল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়, হুংকার-শব্দ-পূর্বক আগ্রহসহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পুরে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে টল্‌টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিক ক্ষণ সানন্দে সন্তরণও হল। পরিবর্তনের মধ্যে মনে হল যেন প বর্গের দুটো-একটা অক্ষর বহুকষ্টে আজকাল উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং চক্ষুতারকায় একটুখানি বুদ্ধিজ্যোতি পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নামের শব্দটা চিনেছে এবং আত্মীয়স্বজনদেরও কতক কতক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। তার গায়ের গন্ধটিও সেই রকম কাঁচা-কাঁচা আছে। কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্ছে।

কলকাতা। ১৯ জুলাই ১৮৯৪

মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার যো নেই [বব]। সেই ছোটো ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আপনার পা দুখানিকে দুর্লভ সামগ্রীর মতো একবার আকাশে তুলে দিয়ে তার পরে নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে যখন উচ্চকলস্বরে আঃ বাঃ বাঃ বাঃ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করে দেন তখন আমার পক্ষে লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার পাশে এক জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি, সে বিবিধ চঞ্চল ভঙ্গীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান

চশমা ঘড়ির-চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়। এক-একদিন রাত্রে শুনতে পাই সে বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে—কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই একটুখানি হাসি হয়; ভাবটা এই যে, একজন খেলবার সংগী পাওয়া গেল। তার পর অনেক ক্ষণ ধরে আর কিছুতেই ঘুম নেই, উপুড় হয়ে পড়ে বিছানাময় সাঁৎরে বেড়াতে থাকে।

শিলাইদহ। ১৩ অগস্ট্ ১৮৯৪

যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক। প্রকৃতির মধ্যে এসে আমার নিজের মনে যে ভাবোদয় হয় সেটা মনে হয় যেন আমার স্বভাবের, আমার শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার। সেইজন্যে মনে হয় আমি সেটা কাউকে বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে পারব না। আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আর আমার কন্যা মীরা থাকে না—সে বিশ্বের সমস্ত মূলরহস্য মূলসৌন্দর্যের অংগ হয়ে পড়ে, আমার স্নেহ-উচ্ছ্বাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব—যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনোই অর্থ থাকে না। যে জগৎব্যাপী আকর্ষণশক্তিতে সমস্ত ভ্রাম্যমাণ বিশ্বজগৎ এক সূত্রে বাঁধা, সেই আকর্ষণেই আপেল ফল গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ে। বাহ্য জগতে যেমন এই আকর্ষণ, মনোজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে—সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি—জগতের ভিতরকার একটা অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল হোক)—তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে :

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। এ কথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার যো নেই।

কলকাতা। ২৯ অগস্ট্ ১৮৯৪

আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম—সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, এক রকম কীর্তনের ধরণের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে—সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বর-সম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আবছায়া দেখতে হয়, গানের সুরে সমস্ত জগৎটা সেই রকম বাষ্পময় এবং ঝঙ্কারপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল—আজ আর কিছু হল না। ও দিকে রেণু এবং খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়্‌বড়্ শব্দ করে খেলা করছে শুনতে পাচ্ছি, কাক চড়ুই প্রভৃতি অনেকগুলি পাখির শব্দ মিশ্রিত হয়ে আকাশে একটা অনির্দিষ্ট শব্দ হচ্ছে, মদনবাবুর গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা করুণসুরে ডেকে যাচ্ছে—পিঠের দিক থেকে অল্প অল্প দক্ষিণে বাতাস এসে লাগছে—কলিকাতার বিচিত্র রকমের সুর এবং শব্দ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে একটা গভীর ঔদাস্য এবং শ্রান্তি প্রকাশ করছে। এখনো আমার ভাত কেন এল না জানি নে, বামুনটাও সকালে ভাতের কাঠি ফেলে সুর বাঁধতে বসেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাচ্ছি নে—মনে হচ্ছে যেন চাকর মনিব জগৎসংসার সমস্তই আজ ছুটি নিয়েছে।

সাজাদপুর। ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর—সব-সুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারি উদাস এবং আকুল করে। কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্ সমর্‌কন্দ্ বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়-সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিন্‌খাপ বিছানো—জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি-পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়্‌গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো

হাবাষি পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা—মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট্‌মাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চার দিকের আলো এবং বাতাস এবং তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা-কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কানুন নেই—মেঘরাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে রাজ্যে আইন-কানুনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আহারের সময় এল। দুপুর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক জিনিস আর কিছু নেই, ওতে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং উচ্চ অঙ্গের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি একেবারে অভিভূত করে ফেলে। বাঙালিরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করে ব'লেই মধ্যাহ্নের একটি নিবিড় ভাবসৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না—দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকে। তাতে ক'রেই দিব্যি চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। আমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে। তখন বাইরের তেতালায় কেউ থাকত না, সেখানে খোলা দরজায় উত্তপ্ত বাতাসে বাঁকা কৌচে আমি একলাটি পড়ে থাকতুম—সমস্ত দীর্ঘ দিন কী কল্পনায়, কী অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায়, কী রকম করে কাটত!

সাজাদপুর। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

আমি চিঠি পাই সন্ধের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে—এখানকার এই দুপুর বেলাকার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে—এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে।

এটা আমি বারম্বার দেখেছি, পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই যেন আমি শেষ করতে পারি নি। যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে, এবং প্রত্যেক দিনই তার নূতনত্বে আমাকে নিবিড় বিস্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে। আমার পুনঃপুনঃ স্পর্শ লেগে কোনো জিনিস জীর্ণ হয় না; বরঞ্চ প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু নেই—মিথ্যা

কাল্পনিকতাকে আমি ভারি ঘৃণা করি। আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্ম-বিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিস্ময় এবং আনন্দ যেন বাড়ছে বৈ কমছে না— তার থেকেই আমি প্রতিদিন বুঝতে পারছি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে তারা কোনো অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমাত্র সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনন্ত-সত্য অনন্ত-আনন্দ আছে। এ কথা পরিষ্কার করে বললে অধিকাংশ লোক অবাক হয়, কিন্তু যারা নিজের জীবন দিয়ে এসব কথা অনুভব করে নি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কী করে অনুভব করাব! তারা ছোটো ছোটো বাঁধি গতের বেড়া বেঁধে সেই বেড়ার মধ্যেকার জমিটুকুকেই জগৎসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষুদ্র দম্ভের উপর কোনোদিন আঘাত করে নি। অরা সুখে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি আত্মা ব'লে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সুখ প্রার্থনীয় নয় এবং যখন সেই সাংসারিক বাঁধি সুখকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয় এবং দুঃখের মধ্যে একটা আন্তরিক বন্ধনমুক্তি দেখা যায় তখনি বুঝতে পারি— আত্মা ব'লে একটা জিনিস আছে, সে জিনিস এক জিনিসই স্বতন্ত্র।

সাজাদপুর। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

যখন এই রকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারি ভালো লাগে— দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেই-সব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে। আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই। এমন-কি লিখতে লিখতে এক-এক সময় চোখ ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে, আবার এক-এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলুম এতে আমার এত আনন্দ কিসের? আসল কথা হচ্ছে অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়— আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যথা পাই তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে, স্মৃতিটুকুকে আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সেটা আমার কাছে আসছে— প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অবধি, বর্তমান থেকে অতীত পর্যন্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ সুখের চেয়ে দুঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি, যে কল্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হয়— এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা, এ-সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি, এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখ-কষ্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই; কিন্তু বীভৎসকল্পনাজনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়ায় আমাদের বিমুখ করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের স্বাধীন গতিকে বাধা দিতে থাকে, এইজন্যে সে-সকল বৃত্তিতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে

যেটুকু করুণা আছে সেটুকু আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্বর নিষ্ঠুরতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়— মনে হয় যেন সেটা আর্টের সীমার বাইরে। কিন্তু বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে; তাতে মোটের উপরে হয়তো কাব্যাংশটা বেশি স্ফূর্তি পায়— সেইজন্যে ওরকম একটা অংশ ধরে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তবু আমি নিজের কথা বলতে পারি, উঁচুদরের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিল্‌ওয়ার্থ্‌ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই যে, বাস্তব জগতের সুখদুঃখ এবং কাব্যজগতের সুখদুঃখে আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে, তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে— বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারি জটিল এবং মিশ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিস জড়িত। কাব্যজগতের সুখদুঃখ বিশুদ্ধরূপে মানসিক— তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, স্বার্থ নেই, জড়জগতের বাধা নেই, শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণভাবে অমিশ্র-ভাবে অনুভব করবার অবসর পায়— কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত; কোনো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে, কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয় না— আমরা দেহবন্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদয় দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি। এইজন্যে কাব্যের আনন্দে আমাদের আনন্দের সীমায় নিয়ে গিয়ে ঠোকর খাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি অতৃপ্তি এবং অসীমতার আস্বাদ দেয়।··· নিজের মনের কথাও আমাদের নিজের কাছে ভারি দুরূহ— আমরা ঠিক কী ভাবছি তা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি নে, তার আর্ধেক কথা কেবলমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা লাভ করি— আমার অধিকাংশ শিক্ষাই এমনি করে হয়েছে. আমার মুখ বন্ধ করে দিলেই আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্যে এবং নিজের মনের ঝোঁকে তোর কাছে বসে বসে আমার প্রতিদিনের বকুনি বকে যাই।

দিঘপতিয়া জলপথে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

পদ্মার ও দিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এ দিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল-খাল নদী-নালা কত রকম জল-পথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্‌সর্‌ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে— সেখানে আর ধান নেই— নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি

জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পড়ে—সেখানে এক তীরে ধানের ক্ষেত, আর এক তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম—মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে—স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখন্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে—ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে—তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার—তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্ ভন্ করতে থাকে—এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠান্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকরনার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে—এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এ রকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত—এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই, এবং সুবিধেও নেই।

বোলপুর। ৩১ অক্টোবর ১৮৯৪

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে-একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে—বাতাসটা হী হী করতে করতে আসছে আর শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছের পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এবং গাছের তলা একেবারে ছেয়ে ফেলছে—এই বাতাসে মুখের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে এবং হাতের চামড়া থেকে খড়ি উঠছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন

জমিদারের পেয়াদা এসেছে— সমস্ত কাঁপছে এবং ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুর বেলাকার রোদ্দুরটি বেশ লাগছে, এক রকম বিশ্রামপূর্ণ ঔদাসীন্যে নিমগ্ন করে দিয়েছে, এবং ঘন আম্রবনের ভিতরে ঘুঘুর অবিশ্রাম কূজনে সমস্ত মাঠ এবং আকাশ এবং বাতাস এবং মধ্যাহ্নের স্বপ্নাতুর ছায়ারৌদ্রময় সুদীর্ঘ প্রহরগুলোকে যেন বিরহবিধুর করে তুলছে— আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও মধ্যাহ্নপ্রকৃতির সমস্ত মর্মরধ্বনির সকরুণ ঔদাস্যের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেবল কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি চলে। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অলসভাবে বসে বসে এই জন্তুগুলির বিচিত্র ভঙ্গী নিরীক্ষণ করে দেখা আমার প্রতিদিনের একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে হয়ে গেছে। ফুলো ন্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোট্ট দুটি কালো ফোঁটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্ত নিরীহ অথচ অত্যন্ত ব্যস্তভাব— দেখে মনের মধ্যে ভারি একটা স্নেহের উদয় হয়। এই ঘরের কোণে লোহার-জাল-দেওয়া আল্‌মারির মধ্যে ডাল চাল পাঁউরুটি প্রভৃতি আহার্য দ্রব্যগুলি এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়— কৌতূহলপূর্ণ নাসিকাটি নিয়ে তারা সমস্তদিন এই আল্‌মারিটার চতুর্দিকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যে-সব ডাল এবং চালের কণা আল্‌মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগুলি সন্ধান করে বের করে সামনের গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ম দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে পরম তৃপ্তি-সহকারে আহার করা হয়— মাঝে মাঝে লাঙুলের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সামনের দুটি ক্ষুদ্র হাত জোড় করে সেই ক্ষুদ্র শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয়— এমন সময় আমি একটু নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়— যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্‌ করে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত— এমনি সমস্ত বেলাই কুট্‌কাট্‌ দুড়্‌দুড়্‌ এবং প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ ঝুন্‌ চলছেই।

এখান থেকে যেতে আমার মন-কেমন করছে— কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার প্রফুল্ল সকাল বেলা এবং নির্জন দুপুর বেলা আমার সর্বদাই মনে পড়বে— এখানকার শান্তি এবং সৌন্দর্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে! স্বার্থপরতাকে দমন করে প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক। ছেড়ে যাবার সময় সৌন্দর্যগুলো আরও যেন মনোহর হয়ে ওঠে। আজকের দিনটা এমনি একটি করুণা-পূর্ণ রাগিণীতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

শিলাইদহ। ৭ মার্চ্‌ ১৮৯৫

তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম যে, এটা সত্যি বটে, মেয়েরা আপনার চতুর্দিকে সৌন্দর্যরক্ষার প্রতি পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি যত্ন করে, কিন্তু সত্যিসত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে? এ-সব বিষয়ে সাধারণভাবে কোনো মীমাংসা করা যায় না; কারণ, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই লোকবিশেষে সকল গুণের ইতরবিশেষ আছে— এ রকম বিষয়ে যখন আমরা কোনো কথা বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিনিধিস্বরূপে ধরে নেওয়া যায়।

আমি যদিচ নিজের চারি দিককে সুন্দর করে রাখতে ইচ্ছে করি, কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি— অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকেও যে পরিপাটী করে রাখি তা নয়। কিন্তু সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই— সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না, এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না— যখন মনটা সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[হারীলাল]কে মনে পড়ে; লোকটি নেহাত অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী— কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। ব[ড়দাদা] যে এক সময়ে যথার্থ কবির মতো সমুদয় সৌন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে কোনোকালে তাঁর চারি দিক সুন্দর করে রাখতেন না এবং সুন্দর হয়ে থাকতেন না সেও নিশ্চয়। নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সৌন্দর্যের অ্যাসোসিয়েশন থাকে এ ইচ্ছাটা মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনই তাকে মনে পড়বে অমনি তার সঙ্গে সুগন্ধ সুদৃশ্য সুপারিপাট্য মনে উদয় হবে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে এটা খুব আবশ্যক। নিজেকে সৌন্দর্যের আদর্শ করতে হলে চারি দিককে সুন্দর করে তোলা চাই। ফুল প্রভৃতি সমস্ত সুন্দর জিনিসের প্রতি মেয়েদের একটি মমতা-পূর্ণ স্নেহ আছে— সে-সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিস. তারা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে বদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের মনের ভাব কিছু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির— আমাদের কাছে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঢের বেশি প্রবল, সৌন্দর্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর। আমি হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়তো অলীক কবিত্বের মতো শোনাতে পারে— সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা— যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন একপ্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে : এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী ব'লে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রী-মূর্তিতে দেখছে— চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে— অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিপসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্‌সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়— সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎ-ভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশ-কালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি— এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।

কলকাতা। ২ মে ১৮৯৫

আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়োই ব্যাকুল করে তোলে। আমি এ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সংগীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্যটা কী। অথচ প্রত্যেকবারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবামাত্রই, এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্মের আলো-আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে— যেন একটি প্রকাণ্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়— সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়— তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরাম-ব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মহামন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্‌স্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না— একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা-তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্ম-বিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্‌মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেই জন্যে আর্ট্‌মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেই জন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতর একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

শিলাইদহ। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

যদিও ঝড় হবার কোনো লক্ষণ দেখছি নে— আকাশে মেঘ অতি অল্প, নদী অতি প্রশান্ত, দিবালোক নির্মল এবং উজ্জ্বল— স্রোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে চলেছে, মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্ছে, শরীর এবং মনের মধ্যে একটি পুলকমিশ্রিত জড়িমার সঞ্চার হচ্ছে। আজ আমার নির্জনবাসের শেষ দিন; কাল থেকে অন্যান্য কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে··· আমার সাধনা লেখার কাজে এখনও হাত দিই নি। কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি। এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তার হৃৎকম্প এবং তার নিশ্বাসহিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সংগীত ছাড়া আর কোনো রকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি

এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি-অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

শিলাইদহ। ৪ অক্টোবর ১৮৯৫

মেঘ বৃষ্টি কেটে গিয়ে আজ অতি সুন্দর দিন হয়েছে। আজ থেকে বোধ হয় শরৎকালটা ঠিক রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হল। সুন্দর কথাটা অনেকবার অনেক জিনিসে ব্যবহার হয়—সেই জন্যে ও কথাটা অব্যবহার্য হয়ে এসেছে; অথচ ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই। যাই হোক, আজকের দিনটি দুর্লভ দিন—আমার মনটা এই আলোকে, স্তব্ধতায়, এই নির্মল শুভ্র স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ নদী এবং ও পারের প্রফুল্ল-কাশবন-শোভিত বালির চর আমার কাছে একটি সুদূর পূর্বস্মৃতির মতো মনোহর লাগছে। বোটে লোকজন এলে আমার এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না ব'লে মনের ভিতরে ভারি একটা স্বার্থপর পরিতাপ উপস্থিত হচ্ছে। বোধ হয় সেই ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিস্তব্ধ নিভৃত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ-অনিমেষ-নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে। আমাকে যেন বলছে, 'কিসের তোমার ঘরকন্না এবং আত্মীয়তাবন্ধন—আমি তোমার অনন্তকালের সাধনা, তোমার সহস্রজন্মপূর্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা—কোনো কারণেই আমার দুর্লভ সঙ্গ তুমি অবহেলা কোরো না, তোমার অন্তরাত্মা আমি ছাড়া আর কারও হাত থেকে সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের চরমতম ফল গ্রহণ করে না।' কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে এবং প্রত্যক্ষ সংসারে এসমস্ত কথা অলীক অমূলক শোনাবে—যদিও একটু দূর থেকে এবং একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে কথাটাকে তেমন লঘু মনে হয় না। এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। আমি যদি পাটের ব্যবসায়-উপলক্ষে কোনো দুর্গম স্থানে গিয়ে একলা পড়ে থাকি তা হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে এবং আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শান্ত থাকবে, কিন্তু যদি বিনা কার্যে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকি তা হলে আপনাকে এবং পরকে ভুলিয়ে রাখা শক্ত হয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্জনে সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়—খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে—

কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু— আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য— সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিস হয়— যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ। যদি চিরকাল সুখে থাকতুম, মনের আশা মিটিয়ে নিয়ে দিনের সমস্ত কাজগুলি সেরে সহজেই দিন কাটত, তা হলে এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম— কী বা জানতুম!

শিলাইদহ। ৪ অক্টোবর ১৮৯৫

দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে— বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখা-টেখা বন্ধ, চারি দিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ; এইসব রঙগুলি— এই জলের গেরুয়া, এ পারের সাদা, ও পারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ-সমস্ত কতই বেশভূষা দৃষ্টিহাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে! সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না— মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিসের অপব্যয় করে!

কুষ্টিয়া। অক্টোবর ১৮৯৫

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্যে মানুষের কোনো ভালো হয় না; তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে; এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবন-যাপন করলে দেখা যায়, অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন-শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে নিজেকে অতিপ্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করা চাই। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনই নিজেকে ভালো রকমে পাই।

আমরা বাইরে শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারি নে। এ দিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক ভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে— প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন-ব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদি কাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখদুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এর থেকে কী যে হয়ে উঠছে তা আমরা স্পষ্ট জানি নে; কারণ, আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমাণ জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই; আমি আছি, আমি চলছি, আমি হয়ে উঠছি, এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার ব'লে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে— আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না; এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে, আমার অন্তরাত্মার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ; অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে আমার এই-যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই-সমস্ত বর্ণ গন্ধ গীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রই চলছে। এই-যে আমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের কথাবার্তা আনাগোনা আদানপ্রদান— আমার যা-কিছু পাওয়া সম্ভব তা কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক; শাস্ত্র থেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই হয় না। এই আমার অন্তর-বাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘটে উঠছে আমার ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার ক'রে তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে, আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয়, নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি 'আমি ধন্য'।

নাগর নদীর ঘাট। ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫

কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ও পারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে— কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী— আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি -পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তর-কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্‌ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!

দীপ্তি কহিল, 'সত্য কথা বলিতেছি, আমার তো মনে হয়, আজকাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।'

আমি কহিলাম, 'দেবী, আর কাহারও স্তব বুঝি তোমাদের গায়ে সহে না?'

দীপ্তি কহিল, 'যখন স্তব ছাড়া আর বেশি কিছু পাওয়া যায় না তখন ওটার অপব্যয় দেখিতে পারি না।'

সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল, 'ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড়ো একটা প্রভেদ নাই। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তবগান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারি।'

দীপ্তি অভিমানভরে কহিল, 'অর্থাৎ যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।'

সমীর কহিল, 'এত বড়ো ভুলটা বুঝিলে, কাজেই একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়। আমাদের ভূতসভার বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়ারিতে মন-নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নীচেই গুটি-কতক কথা লিখিয়া রাখিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি— আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিষ্কার হইবে।'

ক্ষিতি করজোড়ে কহিল, 'দেখো ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক— তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে, আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোনো পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না। যেন খাপের সহিত তরবারি মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেই প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা-স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহর-রূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক, অসদৃশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান করো যেন আর জন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধলেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি।'

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেষ্টা করিল; কহিল, 'একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধ-বন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়: গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।'

দীপ্তি কহিল, 'হাসিবার জন্য দুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি; ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।'

শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কৌতুকলাভ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, 'বড়ো চমৎকার বলিয়াছ। আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে—'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'তোমরা সমীরের লেখাটা আজ আর শুনিতে দিবে না দেখিতেছি। সমীর, তুমি পড়ো, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়ো না।'

স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না। এমন-কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেল্‌ফের উপর হইতে ডায়ারির খাতাটি পাড়িয়া আনিল এবং নিতান্ত নিরীহ

নিরুপায়ের মতো সংযত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীর পড়িতে লাগিল, 'মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয়, এই জন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্বদা খিট্‌খিট্‌ করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন এক জন বাহিরের লোক ঘরের হইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালোবাসাও দুঃসাধ্য।

'সে যেন অনেকটা বাঙালির দেশে ইংরাজের গবর্মেণ্টের মতো। আমাদের সরল দিশি রকমের ভাব, আর তাহার জটিল বিদেশী রকমের আইন। উপকার করে, কিন্তু আত্মীয় মনে করে না। সেও আমাদের বুঝিতে পারে না, আমরাও তাহাকে বুঝিতে পারি না। আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা ছিল তাহার শিক্ষায় সেগুলি নষ্ট হইয়া গেছে, এখন উঠিতে বসিতে তাহার সাহায্য ব্যতীত আর চলে না।

'ইংরাজের সহিত আমাদের মনের আরও কতকগুলি মিল আছে। এত কাল সে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে তবু সে বাসিন্দা হইল না, তবু সে সর্বদা উড়ু-উড়ু করে। যেন কোনো সুযোগে একটা ফর্লো পাইলেই, মহাসমুদ্রপারে তাহার জন্ম-ভূমিতে পাড়ি দিতে পারিলেই বাঁচে। সব চেয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য এই যে, তুমি যতই তাহার কাছে নরম হইবে, যতই 'যো হুজুর খোদাবন্দ্‌' বলিয়া হাত জোড় করিবে, ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠিবে; আর তুমি যদি ফস্‌ করিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি উঁচাইতে পারো, খৃস্টান শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চড়টির পরিবর্তে চাপড়টি প্রয়োগ করিতে পারো, তবে সে জল হইয়া যাইবে।

'মনের উপর আমাদের বিদ্বেষ এতই সুগভীর যে, যে কাজে তাহার হাত কম দেখা যায় তাহাকেই আমরা সব চেয়ে অধিক প্রশংসা করি। নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতিসতর্কভাবে কাজ করে, তাহাকে আমরা ভালোবাসি না; কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা নিশ্চিন্ত, অম্লানবদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বসে এবং অবলীলাক্রমে বেয়াড়া কাজ করিয়া ফেলে, লোকে তাহাকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড়ো সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে, লোকে ঋণের আবশ্যক হইলে তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে মনে মনে অপরাধী করে; আর, যে নির্বোধ নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গণনামাত্র না করিয়া যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া বসে, লোকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঋণদান করে এবং সকল সময় পরিশোধের প্রত্যাশা রাখে না। অনেক সময় অবিবেচনা অর্থাৎ মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি এবং যে মনস্বী হিতাহিতজ্ঞানের অনুদেশ-ক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া অত্যন্ত কঠিন সংকল্পের সহিত নিয়মের চুল-চেরা পথ ধরিয়া চলে, তাহাকে লোকে হিসাবি, বিষয়ী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।

'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। নেশা করিয়া

বরং পশুর মতো হইয়া যাই, নিজের সর্বনাশ করি, সেও স্বীকার, তবু কিছু ক্ষণের জন্য খানার মধ্যে পড়িয়াও সে উল্লাস সম্বরণ করিতে পারি না। মন যদি যথার্থ আমাদের আত্মীয় হইত এবং আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিত, তবে কি এমন উপকারী লোকটার প্রতি এতটা দূরে অকৃতজ্ঞতার উদয় হইত!

'বুদ্ধির অপেক্ষা প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন কেন দিই? বুদ্ধি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের সহস্র কাজ করিয়া দিতেছে, সে না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত; আর প্রতিভা কালেভদ্রে আমাদের কাজে আসে এবং অনেক সময় অকাজেও আসে। কিন্তু বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়; আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মতো আসে, কাহারও আহ্বানও মানে না, নিষেধও অগ্রাহ্য করে।

'প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই, এই জন্য প্রকৃতি আমাদের কাছে এমন মনোহর। প্রকৃতিতে একটার ভিতর আর-একটা নাই। আরসোলার স্কন্ধে কাঁচপোকা বসিয়া তাহাকে শুষিয়া খাইতেছে না। মৃত্তিকা হইতে আর ঐ জ্যোতিঃসিঞ্চিত আকাশ পর্যন্ত তাহার এই প্রকাণ্ড ঘরকন্নার মধ্যে একটা ভিন্নদেশী পরের ছেলে প্রবেশ লাভ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে না।

'সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন। তাহার অসীম নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান। যেমন অনায়াসে একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অবহেলে একটা দুর্দান্ত ঝড় আসিয়া সুখস্বপ্নের মতো সমস্ত ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকলই যেন ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কখনো আদর করে, কখনো আঘাত করে; কখনো প্রেয়সী অপ্সরীর মতো গান করে, কখনো ক্ষুধিত রাক্ষসীর ন্যায় গর্জন করে।

'চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড়ো একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি প্রভুভক্তি তাহার একটা নিদর্শন। যে রাজা ইচ্ছা করিলেই প্রাণ দিতে এবং প্রাণ লইতে পারে তাহার জন্য যত লোক ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিয়াছে, বর্তমান যুগের নিয়মপাশবদ্ধ রাজার জন্য এত লোক স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিসর্জনে উদ্যত হয় না।

'যাহারা মনুষ্যজাতির নেতা হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের মন দেখা যায় না। তাহারা কেন, কী ভাবিয়া, কী যুক্তি অনুসারে কী কাজ করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা কিছুই বুঝা যায় না; এবং মানুষ নিজের সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্ত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।

'রমণীও প্রকৃতির মতো। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মতো আগাগোড়া একখানি। এই জন্য তাহার গতিবিধি আচারব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এই জন্য দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী 'মরণং ধ্রুবং'।

'প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি, তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার-আলোচনা কেন-কীবৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারি হস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়-মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়। ভক্তেরা করজোড়ে বলে, 'তুমি মহামায়া, তুমি

ইচ্ছাময়ী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি।''

সমীর হাঁপ ছাড়িবার জন্য একটু থামিবামাত্র ক্ষিতি গম্ভীর মুখ করিয়া কহিল, 'বাঃ! চমৎকার! কিন্তু তোমার গা ছুঁইয়া বলিতেছি, এক বর্ণ যদি বুঝিয়া থাকি! বোধ করি যাহাকে মন ও বুদ্ধি বলিতেছ প্রকৃতির মতো আমার মধ্যেও সে জিনিসটার অভাব আছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে প্রতিভার জন্যও কাহারও নিকট হইতে প্রশংসা পাই নাই এবং আকর্ষণশক্তিও যে অধিক আছে তাহার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

দীপ্তি সমীরকে কহিল, 'তুমি যে মুসলমানের মতো কথা কহিলে, তাহাদের শাস্ত্রেই তো বলে মেয়েদের আত্মা নাই।'

স্রোতস্বিনী চিন্তান্বিত ভাবে কহিল, 'মন এবং বুদ্ধি শব্দটা যদি তুমি একই অর্থে ব্যবহার করো আর যদি বলো আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত, তবে তোমার সহিত আমার মতের মিল হইল না।'

সমীর কহিল, 'আমি যে কথাটা বলিয়াছি তাহা রীতিমত তর্কের যোগ্য নহে। প্রথম বর্ষায় পদ্মা যে চরটা গড়িয়া দিয়া গেল তাহা বালি, তাহার উপরে লাঙল লইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। ক্রমে ক্রমে দুই-তিন বর্ষায় স্তরে স্তরে যখন তাহার উপর মাটি পড়িবে তখন সে কর্ষণ সহিবে। আমিও তেমনি চলিতে চলিতে স্রোতোবেগে একটা কথাকে কেবল প্রথম দাঁড় করাইলাম মাত্র। হয়তো দ্বিতীয় স্রোতে একেবারে ভাঙিতেও পারে, অথবা পলি পড়িয়া উর্বরা হইতেও আটক নাই। যাহা হউক, আসামির সমস্ত কথাটা শুনিয়া তার পর বিচার করা হউক।—

'মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর-একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা-কিছু সঞ্চয় করিতেছে, ত্যাগ করিতেছে, গোপন তলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা-কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই-সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস -আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতন ভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তর-পর্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পবেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

'এই মহাদেশেই শস্য পুষ্প ফল সৌন্দর্য ও জীবন অতি সহজে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। ইহা দৃশ্যতঃ স্থির ও নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ইহার ভিতরে একটি অনায়াসনৈপুণ্য, একটি গোপন জীবনীশক্তি নিগূঢ় ভাবে কাজ করিতেছে। সমুদ্র কেবল ফুলিতেছে এবং দুলিতেছে, বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে এবং ডুবাইতেছে, অনেক আহরণ এবং সংহরণ করিতেছে, তাহার বলের সীমা নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি ও ধারণীশক্তি নাই—সে কিছুই জন্ম দিতে ও পালন করিতে পারে না।

'রূপকে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি, আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

'এই স্থিতি এবং গতি, সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ উপার্জন জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। এই জন্য তাহার এমন সহজ বুদ্ধি, সহজ শোভা, অশিক্ষিতপটুতা। মনুষ্য-সমাজে স্ত্রীলোক বহুকালের রচিত; এই জন্য তাহার সংস্কারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্তব্য এমন চিরাভ্যস্ত সহজসাধ্যের মতো হইয়া চলিতেছে। পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্য ভাবে সঞ্চিত হইতেছে।

'পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর, স্ত্রীলোক এমন একটি সংগীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোল ভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; তাহাতে উত্তরোত্তর যতই পদ সংযোগ ও নব নব তান যোজনা করো-না কেন, সেই সমটি আসিয়া সমস্তটিকে একটি সুগোল সম্পূর্ণ গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া লয়। মাঝখানে একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্ত আপনার পরিধি বিস্তার করে, সেই জন্য হাতের কাছে যাহা আছে তাহা সে এমন সুনিপুণ সুন্দর ভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে।

'এই-যে কেন্দ্রটি ইহা বুদ্ধি নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণশক্তি। ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃপদার্থটি যেখানে আসিয়া উঁকি মারেন সেখানে এই সুন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।'

ব্যোম অধীরের মতো হইয়া হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল, 'তুমি যাহাকে ঐক্য বলিতেছ আমি তাহাকে আত্মা বলি; তাহার ধর্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারি দিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে। আর যাহাকে মন বলিতেছ সে পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে। সেই জন্য আত্মযোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।

'ইংরাজের সহিত সমীর মনের যে তুলনা করিয়াছেন এখানেও খাটে। ইংরাজ সকল জিনিসকেই অগ্রসর হইয়া তাড়াইয়া খেদাইয়া ধরে। তাহার 'আশাবধিং কো গতঃ', শুনিয়াছি সূর্যদেবও নহেন— তিনি তাহার রাজ্যে উদয় হইয়া এ পর্যন্ত অস্ত হইতে পারিলেন না। আর আমরা আত্মার ন্যায় কেন্দ্রগত হইয়া আছি; কিছু হরণ করিতে চাহি না, চতুর্দিকে যাহা আছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করিয়া গঠন করিয়া তুলিতে চাই। এই জন্য আমাদের সমাজের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে, এমন একটা রচনার নিবিড়তা দেখিতে পাওয়া যায়। আহরণ করে মন, আর সৃজন করে আত্মা।

'যোগের সকল তথ্য জানি না; কিন্তু শুনা যায়, যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতা-বলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতন-ভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব রস দৃশ্য বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া, পুঞ্জিত করিয়া, জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।

'বড়ো বড়ো লোকেরা যে বড়ো বড়ো কাজ করেন, সেও এই ভাবে। যেখানকার

যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, একটি সুসম্পন্ন সুসম্পূর্ণ কার্যরূপে দাঁড়াইয়া যায়। প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠজাত মননামক দুরন্ত বালকটি যে একেবারে তিরস্কৃত বহিষ্কৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু সে তদপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর প্রতিভার অমোঘ মায়ামন্ত্রবলে মুগ্ধের মতো কাজ করিয়া যায়; মনে হয়, সমস্তই যেন জাদুতে হইতেছে; যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বাহ্য অবস্থা-গুলিও, যোগবলে যথেচ্ছামত যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া যাইতেছে—গারিবাল্ডি এমনি করিয়া ভাঙাচোরা ইটালিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন—ওয়াশিংটন অরণ্যপর্বত-বিক্ষিপ্ত আমেরিকাকে আপনার চারি দিকে টানিয়া আনিয়া একটি সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া দিয়া যান।

'এই-সমস্ত কার্য এক-একটি যোগসাধন।

'কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান লয় ছন্দে এক-একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগ্নী অতিথি-অভ্যাগতকে সুন্দর বন্ধনে বাঁধিয়া, সে আপনার চারি দিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে; বিচিত্র উপাদান লইয়া বড়ো সুনিপুণ হস্তে একখানি গৃহ নির্মাণ করে; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে যায় আপনার চারি দিককে একটি সৌন্দর্যসংযমে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাফেরা বেশভূষা কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিতকে একটি অনির্বচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী। ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ; মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। এই-যে ঠিক সুরটি ঠিক জায়গায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় আসিয়া বসে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন হয়, ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিলজগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।

'প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।'

অতঃপর ব্যোম সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তার পরে? তোমার লেখাটা শেষ করিয়া ফেলো।'

সমীর কহিল, 'আর আবশ্যক কী? আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তুমি তো তাহার এক প্রকার উপসংহার করিয়া দিয়াছ।'

ক্ষিতি কহিল, 'কবিরাজ মহাশয় শুরু করিয়াছিলেন, ডাক্তার মহাশয় সাঙ্গ করিয়া গেলেন, এখন আমরা হরি হরি বলিয়া বিদায় হই। মন কী, বুদ্ধি কী, আত্মা কী, সৌন্দর্য কী এবং প্রতিভাই বা কাহাকে বলে, এ-সকল তত্ত্ব কস্মিন্‌কালে বুঝি নাই কিন্তু বুঝিবার আশা ছিল; আজ সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়া গেলাম।'

পশমের গুটিতে জটা পাকাইয়া গেলে যেমন নতমুখে সতর্ক অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে খুলিতে হয়, স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া বসিয়া যেন তেমনি ভাবে মনে মনে কথা-গুলিকে বহু যত্নে ছাড়াইতে লাগিল।

দীপ্তিও মৌনভাবে ছিল; সমীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী ভাবিতেছ?'

দীপ্তি কহিল, 'বাঙালির মেয়েদের প্রতিভাবলে বাঙালির ছেলেদের মতো এমন অপরূপ সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাই ভাবিতেছি।'

আমি কহিলাম, 'মাটির গুণে সকল সময়ে শিব গড়িতে কৃতকার্য হওয়া যায় না।'

* শ্রাবণ ১৩০০

সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

বর্ষায় নদী ছাপিয়া ক্ষেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতলা কোঠাবাড়ি এবং দুই-চারিটি টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটির, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধানো অশথ গাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে। সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাক ঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ-অংশ বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাক-ঢোলগুলা যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে খেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।

স্রোতস্বিনী মনে করিল, নিকটে কোথাও বুঝি একটা বিবাহ আছে। একান্ত কৌতূহল-ভরে বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া তরুসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।

আমি ঘাটে বাঁধা নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী রে, বাজনা কিসের?'

সে কহিল আজ জমিদারের পুণ্যাহ।

পুণ্যাহ বলিতে বিবাহ বুঝায় না শুনিয়া স্রোতস্বিনী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। সে ঐ তরুচ্ছায়াঘন গ্রাম্য পথটার মধ্যে কোনো-এক জায়গায় ময়ূরপংখিতে একটি চন্দন-চর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর অথবা লজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আমি কহিলাম, 'পুণ্যাহ অর্থে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ-দিন। আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে টাকা সে দিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ, খাজনা-দেনাপাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ লোভ, অপর দিকে হীন ভয় নাই। প্রকৃতিতে তরুলতা যেমন আনন্দমহোৎসবে বসন্তকে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং বসন্ত তাহা সঞ্চয়-ইচ্ছায় গণনা করিয়া লয় না, সেইরূপ ভাবটা আর-কি।'

দীপ্তি কহিল, 'কাজটা তো খাজনা-আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা-বাদ্য কেন?'

ক্ষিতি কহিল, 'ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায় তখন কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না? আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।'

আমি কহিলাম, 'সে হিসাবে দেখিতে পারো বটে, কিন্তু বলি যদি দিতেই হয়

তবে নিতান্ত পশুর মতো পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা পারা যায় উচ্চ ভাব রাখাই ভালো।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমি তো বলি যেটার যাহা সত্য ভাব তাহাই রক্ষা করা ভালো; অনেক সময়ে নীচ কাজের মধ্যে উচ্চ ভাব আরোপ করিয়া উচ্চ ভাবকে নীচ করা হয়।'

আমি কহিলাম, 'ভাবের সত্যমিথ্যা অনেকটা ভাবনার উপরে নির্ভর করে। আমি এক ভাবে এই বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটিকে দেখিতেছি, আর ঐ জেলে আর-এক ভাবে দেখিতেছে; আমার ভাব যে এক চুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।'

সমীর কহিল, 'অনেকের কাছে ভাবের সত্যমিথ্যা ওজন-দরে পরিমাপ হয়। যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য। সৌন্দর্যের অপেক্ষা ধূলি সত্য, স্নেহের অপেক্ষা স্বার্থ সত্য, প্রেমের অপেক্ষা ক্ষুধা সত্য।'

আমি কহিলাম, 'কিন্তু তবু চিরকাল মানুষ এই-সমস্ত ওজনে-ভারী মোটা জিনিসকে একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। ধূলিকে আবৃত করে, স্বার্থকে লজ্জা দেয়, ক্ষুধাকে অন্তরালে নির্বাসিত করিয়া রাখে। মলিনতা পৃথিবীতে বহু কালের আদিম সৃষ্টি, ধূলিজঞ্জালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন— তাই বলিয়া সেইটেই সব চেয়ে সত্য হইল? আর, অন্তর-অন্তঃপুরের যে লক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণী আসিয়া তাহাকে ক্রমাগত ধৌত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকেই কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?'

ক্ষিতি কহিল, 'তোমরা, ভাই, এত ভয় পাইতেছ কেন? আমি তোমাদের সেই অন্তঃপুরের ভিত্তিতলে ডাইনামাইট লাগাইতে আসি নাই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলো দেখি, পুণ্যাহের দিন ঐ বেসুরো সানাইটা বাজাইয়া পৃথিবীর কী সংশোধন করা হয়। সংগীতকলা তো নহেই।'

সমীর কহিল, 'ও আর কিছুই নহে, একটা সুর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদস্খলন এবং ছন্দঃপতনের পর পুনর্বার সমের কাছে আসিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসারের স্বার্থকোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে, নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়; হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়; কেনাবেচার উপর ভালোবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টি চন্দ্রালোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকারস্বরে হইতেছে, আর যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক-এক দিন আসিয়া মাঝখানে বসিয়া সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে এবং তখনকার মতো সমস্ত চীৎকারস্বর নরম হইয়া আসিয়া সেই সুরের সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে— পুণ্যাহ সেই সংগীতের দিন।'

আমি কহিলাম, 'উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে এক-এক দিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, এক দিন খরচ করে; প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, এক দিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়; প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর এক দিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেই দিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব। সেই দিন সম্বৎসরের আদর্শ। সে দিন ফুলের মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ— এবং দূরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর-সমস্তই

বেসুরা। বুঝিতে পারি আমরা মানুষে মানুষে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশতঃ তাহা পারিয়া উঠি না; যে দিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।'

সমীর কহিল, 'সংসারে দৈন্যের শেষ নাই। সে দিক হইতে দেখিতে গেলে মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীন রূপে চক্ষে পড়ে। মানবাত্মা জিনিসটা যতই উচ্চ হউক-না কেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, এক খণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশাইয়া যায়। এ দিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ও দিকে যে দিন নস্যের ডিবাটা হারাইয়া যায় সে দিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেমন করিয়াই হোক, প্রতিদিন তাহাকে আহারবিহার কেনাবেচা দরদাম মারামারি ঠেলাঠেলি করিতেই হয়— সে জন্য সে লজ্জিত। এই কারণে সে এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্য সর্বদা প্রয়াস পায়। আহারে-বিহারে আদানে-প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।'

আমি কহিলাম, 'তাহারই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁশি। এক জনের ভূমি, আর-এক জন তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শুষ্ক চুক্তির মধ্যে লজ্জিত মানবাত্মা একটি ভাবের সৌন্দর্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে ইহা চুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে। রাজাপ্রজা ভাবের সম্বন্ধ, আদানপ্রদান হৃদয়ের কর্তব্য। খাজনার টাকার সহিত রাগ-রাগিণীর কোনো যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে; কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আজ আমাদের পুণ্যাদিন, আজ আমাদের রাজাপ্রজার মিলন। জমিদারি কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ-নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।'

স্রোতস্বিনী আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে কহিল, 'আমার বোধ হয় ইহাতে যে কেবল সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, যথার্থ দুঃখভার লাঘব করে। সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনোই যখন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তখন উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়। চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ; বিচ্ছিন্ন বাহিরের বোঝাই বোঝা।'

উপমাপ্রয়োগপূর্বক একটা কথা ভালো করিয়া বলিবামাত্র স্রোতস্বিনীর লজ্জা উপস্থিত হয়, যেন একটা অপরাধ করিয়াছে। অনেকে অন্যের ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে এরূপ কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যোম কহিল, 'যেখানে একটা পরাভব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সেখানে মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। কেবল মানুষের কাছে বলিয়া নয়, সর্বত্রই। পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নাহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনি মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।'

ক্ষিতি কহিল, 'মানবাত্মা কোনোমতে আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজা যখন যথেচ্ছাচার করে, কিছুতেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তখন প্রজা তাহাকে দেবতা গড়িয়া হীনতাদুঃখ-বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে। পুরুষ যখন সবল এবং একাধিপত্য করিতে সক্ষম, তখন অসহায় স্ত্রী তাহাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া তাহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বহন করিতে চেষ্টা করে। এ কথা স্বীকার করি বটে, মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এত দিনে সে পশুর অধম হইয়া যাইত।'

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ব্যথিতভাবে কহিল, 'মানুষ যে কেবল অগত্যা এইরূপ আত্ম-প্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমরা কোনোরূপে অভিভূত নহি, বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ, সেখানেও আত্মীয়তা-স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে আমাদের দেশের লোক মা বলিয়া, ভগবতী বলিয়া, পূজা করে কেন? সে তো অসহায় পশুমাত্র; পীড়ন করিলে, তাড়না করিলে, তাহার হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই। আমরা বলিষ্ঠ, সে দুর্বল; আমরা মানুষ, সে পশু। কিন্তু আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন তাহার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতেছি তখন যে সেটা বলপূর্বক করিতেছি, কেবল আমরা সক্ষম এবং সে নিরুপায় বলিয়াই করিতেছি, আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। সে এই উপকারিণী পরমধৈর্যবতী প্রশান্তা পশুমাতাকে মা বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান করিয়া যথার্থ তৃপ্তি অনুভব করে; মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক, একটি সৌন্দর্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।'

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিল, 'তুমি একটা খুব বড়ো কথা কহিয়াছ।'

শুনিয়া স্রোতস্বিনী চমকিয়া উঠিল। এমন দুষ্কর্ম কখন করিল সে জানিতে পারে নাই। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সলজ্জ সংকুচিত ভাবে সে নীরবে মার্জনা প্রার্থনা করিল।

ব্যোম কহিল, 'ঐ-যে আত্মার সৃজনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ, উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারি দিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারি দিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন-স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি, সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল পিণ্ডমাত্র; আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তুসমষ্টির মতো এমন পর আর কী আছে! কিন্তু

আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা। সে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল— সে দিন বড়োই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতুনির্মাণ-কার্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারি দিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর পৃথিবীকে আপনার এবং জড় পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে জড় বলে আমিও তাহাকে জড় বলিতেছি। জড়ের জড়ত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে বসিলে উপস্থিত সভায় সচেতন পদার্থের মধ্যে আমি একা মাত্র অবশিষ্ট থাকিব।'

সমীর ব্যোমের কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কহিল, 'স্রোতস্বিনী কেবল গাভীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে দিন যখন দেখিলাম এক ব্যক্তি রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়া মাথা হইতে একটা কেরোসিন তেলের শূন্য টিন-পাত্র কূলে নামাইয়া 'মা গো' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, মনে বড়ো একটু লাগিল। এই-যে স্নিগ্ধ সুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে, ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কী আছে! এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্ম-পরিচিত বাস্তুগৃহ পর্যন্ত যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয়, তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে। তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়; জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম, পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলজি বাহির করিবার পূর্বেই আমরা নাড়ির টানে সর্বত্র ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছিলাম।

'আমাদের ভাষায় থ্যাঙ্ক্ শব্দের প্রতিশব্দ নাই বলিয়া কোনো কোনো য়ুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে। জন্তুর নিকট হইতে যাহা পাই, জড়ের নিকট হইতে যাহা পাই, তাহাকেও আমরা স্নেহ দয়া উপকার-রূপে জ্ঞান করিয়া প্রতিদান দিবার জন্য ব্যগ্র হই। যে জাতির লাঠিয়াল আপনার লাঠিকে, ছাত্র আপনার গ্রন্থকে এবং শিল্পী আপনার যন্ত্রকে কৃতজ্ঞতা-অর্পণ-লালসায় মনে মনে জীবন্ত করিয়া তোলে, একটা বিশেষ শব্দের অভাবে সে জাতিকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না।'

আমি কহিলাম, 'বলা যাইতে পারে। কারণ, আমরা কৃতজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা যে পরস্পরের নিকট অনেকটা পরিমাণে সাহায্য অসংকোচে গ্রহণ করি, অকৃতজ্ঞতা তাহার কারণ নহে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভিক্ষুক এবং দাতা, অতিথি এবং গৃহস্থ, আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্বন্ধ যেন একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সুতরাং সে স্থলে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।'

ব্যোম কহিল, 'বিলাতি হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতিও নাই। য়ুরোপীয় যখন বলে 'থ্যাঙ্ক্ গড' তখন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্বরের মতো চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না; কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের এক প্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ, স্নেহের দাবির অন্ত নাই—সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর, মধুরতর। রামপ্রসাদের গান আছে—

তোমায় মা মা বলে আর ডাকিব না,
আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।

এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জমা হইতে পারে না।'

ক্ষিতি কটাক্ষসহকারে কহিল, 'য়ুরোপীয়দের প্রতি আমাদের যে অকৃতজ্ঞতা, তাহারও বোধ হয় একটা গভীর এবং উদার কারণ কিছু থাকিতে পারে। জড়প্রকৃতির সহিত আত্মীয়সম্পর্ক-স্থাপন সম্বন্ধে যে কথাগুলি হইল তাহা সম্ভবতঃ অত্যন্ত সুন্দর; এবং গভীর যে তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ এ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ তলাইয়া উঠিতে পারি নাই। সকলেই তো একে একে বলিলেন যে, আমরাই প্রকৃতির সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি, আর য়ুরোপ তাহার সহিত দূরের লোকের মতো ব্যবহার করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যদি য়ুরোপীয় সাহিত্য, ইংরাজি কাব্য, আমাদের না জানা থাকিত তবে আজিকার সভায় এ আলোচনা কি সম্ভব হইত? এবং যিনি ইংরাজি কখনো পড়েন নাই তিনি কি শেষ পর্যন্ত ইহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন?'

আমি কহিলাম, 'না, কখনোই না। তাহার একটু কারণ আছে। প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ এক দিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই; কারণ, আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণমাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই। কোনো-একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া

দিয়াছেন; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

'আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট-অশ্বত্থকে পূজা করি, আমরা প্রস্তর-পাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিককে বাস্তবিক করিয়া তুলি। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখ সম্পদ্ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা-অসুবিধা সঞ্চয়-অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনি সে আধ্যাত্মিক; কিন্তু যখনি তাহাকে মূর্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র। তখনি আমরা দেবতাকে পুত্তলিকা করিয়া দিই।

'ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবী, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না। কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে, আমার অন্তরাত্মাকে যে-এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ, সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।'

* ভাদ্র ১৩০০

ছেলে-ভুলানো ছড়া

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা -অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে— অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুলপরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে।— স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া

উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ-সকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহারজগতের কতশত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো-একটা বিশেষ দিকে লক্ষ করিয়া চিন্তা করি তখন এই-সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই-সমস্ত রেণুজাল উড়িয়া যায়, এই-সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়; আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আকাশে পাখির ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোটো বড়ো কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে—এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন, কত আন্দোলন, কত গমন, কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখে না এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভালো করিয়া দেখেও না শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে।

কিন্তু সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্ন-ভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ-পরিবর্তন-পূর্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়তপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এইখানে দুই-একটি ছড়া উদ্‌ধৃত করিবার পূর্বে পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। আটঘাট-বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই-সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়, যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই।—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুম্‌ঝুম্ পা-ঝুম্‌ঝুম্ সীতারামের খেলা॥

নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই, ত্রিপূর্ণির ঘাট॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে॥
ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্ষুর বেলা॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পরসম্বন্ধ নাই, সে কথা নিতান্ত পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে কোনোপ্রকার বাছ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনো প্রকার পরিচয় -প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোরূপ উপলক্ষ অন্বেষণ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন-কি মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে। দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত, তবে সেই মুহূর্তে তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন, আগামী কল্য যে তাঁহার শুভবিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য, বিবাহের পর যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনো প্রকার উদ্যোগ অথবা সেজন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে কাহাকেও কোনো-কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাটাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজিফুল যে কী ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে, যমুনাবতী-নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে লোক লইয়া গেছে তাহার

কোনোরূপ উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল-সংগ্রহ-দ্বারাই শুভকর্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে।

এই তো কবিতার বাঁধুনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণির ঘাটে অনির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্নকালে ওড়ফুলের মালা বদল করিয়া যে গান্ধর্ববিবাহ ঘটিত তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর-একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্য-কারণ-সূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানসজগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই মুঠা মুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক, সেখানে কর্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না, সে সম্প্রতি-মাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎ-লীলার অনুকরণ করে।

পূর্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা, ত্রিপূর্ণির ঘাট এবং ওড়বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ।

স্বপ্নের মতো সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সজাগতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান।
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয়, শিবুঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল যখন এতাদৃশ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি

ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম—সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পান্সি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবুঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন-কি, তৃতীয়া বধূঠাকুরানী মর্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি-অভিমুখে চলিয়াছেন, সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাত-সাধন করিতে পারে নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি হতবুদ্ধি শিবুঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠজায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহপ্রয়াণ-দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিবুঠাকুর কি কস্মিন্ কালে কেহ ছিল, এক-একবার এ কথাও মনে উদয় হয়। হয়তো বা ছিল। হয়তো এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর-কোনো ছড়ায় হয়তো বা ইহার আর-এক টুকরা থাকিতে পারে।—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সবুরি কলা, কাগমারে দই॥

ভাবে-গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিবুঠাকুর এবং শিবুসদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্যসম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ শখ আছে এবং বোধ করি আহার-সম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থানটুকু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাও নবপরিণীতের প্রথমপ্রণয়যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এই স্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবুসদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে 'শালিধানের চিঁড়ে নয় রে—বিন্নিধানের খই'। যেন ঘটনার সত্যসম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মতো। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতে পরমুহূর্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবুঠাকুরও কখন এমনি করিয়া শিবুসদাগরে পরিণত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দ্রুত গতিতে বালকের চিত্ত উপর্যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়োসাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে॥
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে॥
কে রেখেছে, কে রেখেছে, দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্‌খান দে, বকুলতলা দে॥
বকুলফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা॥
সীতেনাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ করে।
সোনামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোনো ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোনো ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝোঁটনবিশিষ্ট নোটনপায়রাগুলি, বড়োসাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই রুইকাৎলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের বাদ্য-সহকারে সীতানাথের খেলা, এবং মধ্যাহ্নরৌদ্রে তপ্তবালুকাচিক্কণ মাঠের মধ্যে খরতাপক্লিষ্ট রক্তমুখচ্ছবি—এ-সমস্তই স্বপ্নের মতো। ও পারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায়, এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সেজন্য কোনো কবি চুরির অভিযোগ করেন না এবং কোনো সমালোচকও ভাব-বিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার-নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিস বা আইন-কানুনের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।—

ও পারে জন্তিগাছটি, জন্তি বড়ো ফলে।
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে হাইঢাই, গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিনলাম, চুন কিনলাম, ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে ব'লে দেলাম॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি, সুবল আছে বাড়ি॥
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটামোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে॥
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে।
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে॥
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে।
পরনে তাদের ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে নাল গামছা দিয়ে॥
অশথের পাতা ধনে। গৌরী বেটি ক'নে॥
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম্‌ কুড়্‌কুড়্‌ বাদ্দি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর॥

এই-সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি আলোচাল খাইয়া সীতারাম-নামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিপুর্ণির ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতানাথ চাল-কড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে— সীতারামও নহে, সীতানাথও নহে, পরন্তু কোনো-এক হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষপরায়ণা ননদিনী জন্তিফল ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হরগৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে অসাবধানা ভ্রাতৃ-বধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই তো তিন ছড়ার মধ্যে অসংগতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায় অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য-দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে; অথচ এ ক্ষেত্রে সে পক্ষে খেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে; দুইয়ের বার। সুবলের বিবাহকে যদিবা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোনো সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন, তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন; 'নাল গামছা দিয়ে টিয়ের মার

বিয়ে' কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ, বিধবা-বিবাহ টিয়েজাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল-গামছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কস্মিন কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই-সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থি-বাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা মূর্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মতো গড়িতে হয়—যেখানে যতটুকু অনুকরণের ত্রুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে, তাহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছা-রচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই-সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তি-দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতিসংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিতচিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। 'চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে' —এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়। 'পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে' —ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূর্ণাজলের আবর্তধারার মতো তনুগাত্রযষ্টিতে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে, তাহা ঐ এক ছত্রে এক মুহূর্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে 'পরনে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে'—সে ছবিটিও মন্দ নহে।—

আয় ঘুম, আয় ঘুম বাগ্দিপাড়া দিয়ে।
বাগ্দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে॥

ঐ শেষ ছত্রে জাল মুড়ি দিয়া বাগ্দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে, ঐ জাল মুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগ্দি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল, দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই॥

এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্‌ করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে, রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয় পণ কড়ি গুনিতে গুনিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্‌ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে?

এই তো এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর-এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ সজীব হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে-সমস্ত তুচ্ছ কথা বড়ো বড়ো সাহিত্যে তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসংকোচে প্রবেশ করিতে পারে না; এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।—

দাদা গো দাদা শহরে যাও। তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসীমালা। বউ বরনে চন্দ্রকলা॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি। বউ এনে দাও খেলা করি॥

দাদার বেতন অধিক নহে, কিন্তু বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের স্বচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি। বউ এনে দাও খেলা করি॥

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে, 'বউ বরনে চন্দ্রকলা'। যদিও ভগ্নীর খেলনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ, তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশত নহে।

উলু উলু মাদারের ফুল। বর আসছে কত দূর॥
বর আসছে বাগনাপাড়া। বড়ো বউ গো রান্না চড়া॥
ছোটো বউ লো জল্‌কে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা। ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
ফুলের বরন কড়ি। ন'টে শাকের বড়ি॥

জামাতৃসমাগম-প্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষে শেওড়াগাছের বেড়া দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথ ঘাট বন পুষ্করিণী ঘটকক্ষ বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্‌ধৃত করিতে আশঙ্কা করি; কারণ, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত-গোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই

নাই, কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষ-সীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারি দিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে, যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব। একটা জিনিস যদি অদ্ভুত না হয় তবে আর-একটা জিনিসই বা কেন অদ্ভুত হইবে? একটি গল্প আছে, কোনো লোক সভা-স্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, আজ পথে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম; বিবাদে একটি লোকের মুণ্ড কাটা পড়িল, তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কী হে, দশ পা চলিয়া গেল? তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি বলিলেন, দশ পা চলা কিছুই আশ্চর্য নহে, উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য।

সৃষ্টিরও সেইরূপ, প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিস্ময় এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়, তাহার পরে আরও যে কিছু হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কী। বালক সেই প্রথম আশ্চর্যটার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিতেছে— সে চক্ষু মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিস আছে, আরও অনেক জিনিস থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে; এইজন্য ছড়ার দেশে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমানাঘটিত কোনো বিবাদ নাই।—

আয় রে আয় টিয়ে। নায়ে ভরা দিয়ে॥
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে :
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা। খোকার নাচন দেখে যা॥

প্রথমত, টিয়ে পাখি নৌকা চড়িয়া আসিতেছে, এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই; বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত, হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই, খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল, এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোঁয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপটাইয়া অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তখন কৌতুক আরও বাড়িয়া উঠে। টিয়ে বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্যস্পৃহাও বড়ো চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সংবরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেও তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই-সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥
খোকা ব'লে পাখিটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে॥

ক্ষীরনদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কী সংকটেই পড়িয়াছিল তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে? অবশ্য, ক্ষীরনদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকা-বাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হোক,

তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্যাবলম্বন করিয়া পরমগম্ভীরভাবে নিজ আয়তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকট-গোছের কোলা ব্যাঙ খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অন্য দিকে ডাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার-বা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার-বা সেই উড্ডীন চোরের উদ্দেশে দুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ —এ-সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষীমূর্তিও চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ও পারটা ভালো দেখা যায় না। এ পারে তীরের কাছে একটা কোণের মতো জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন; তারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃশ্যটিও বেশ—এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্র-মাসের জলমগ্ন পক্বশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটির; সেই কুটিরপ্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্ণের অবসান-সূর্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন; বেড়ার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গোরুটিও স্তিমিত কৌতূহলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন-শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটিরের দিকে চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে, সেও সুন্দর দৃশ্য—এবং তাহার পর তৃতীয় দৃশ্যে পাখিটি মার বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুটাইয়া এবং দুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফেলিয়াছে এবং নিমীলিতনেত্রে মা দুই হস্তে সুকোমল ডানা-সুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন, সেও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান, সেই জ্যোতির্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক-এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকারাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টিপথে পড়ে। সেই-সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই—প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনো সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে, কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্ধৃত করি—

> জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
> চার কালো দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥
> কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
> তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥
> জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
> চার ধলো দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥

বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥

কবিসম্প্রদায় কবিত্বসৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্র ছন্দে নারী-জাতির স্তবগান করিয়া আসিতেছেন কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত স্তবগানের মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে, এমন অতি অল্প কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটুখানি সরল কৌতুকও আছে। সীতার ধনুক-ভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিষ্টি আছে যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন কন্যা লাভ করা ভাগ্যবানের কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে; ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ, বিচারে জয়, এ-সমস্ত কিছুই আবশ্যক হয় না—উলটিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা, আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়কমহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল, সেও অনেক ভালো। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই, তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পুরো নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল।

প্রথম ছত্রেই কন্যা কহিতেছেন, 'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।' ইহা হইতে বোধ হইতেছে পরীক্ষা আরও পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মতন আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্নজিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক, এমন রঙ্গ আর-কিছু নাই।

যাহা হউক, আমাদের উপরে এই ছড়াটি রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম; এমন আচমকা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না। প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত, অনেকটা ইডন্ গার্ডনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার

আলোক, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটুখানি জমজমাট করিয়া তুলিতাম— আয়োজন অনেক রকম করিতে পারিতাম, কিন্তু এই সুন্দর কন্যাটি— যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদুর কুসুমফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ— সেই মেয়েটি, যে মেয়ে সামান্য কয়েকটি স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে— তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। কিছু না হউক, উহাদিগকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা যদি কখনো আমাদের বর্তমান সভ্যসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি, তবে কি তাহাকে নিম্নলিখিত-রূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি—

আয় আয় চাঁদামামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব, দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

এ কোন্ চাঁদ? নিতান্তই বাঙালির ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্যসমাজের সর্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটিরের নিকটে বায়ু-আন্দোলিত বাঁশবনের রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহহাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলিবিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে; ইহার সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা এত বড়ো লোকটা যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্যপাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন— সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশুমালীকে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কালো গোরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত? আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বৌ-কথা-কও'এর গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্বজাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বসিতাম— অথচ, চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না— খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাংলাদেশের চাঁদামামা বাংলাদেশের সহস্র কুটির হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত; হাঁ-ও বলিত না, না-ও বলিত না, এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্ দিন কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া পূর্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময়, অমনি পথের মধ্যে, কৌতুকপ্রফুল্ল পরিপূর্ণ

হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্ত-বংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম পদচিহ্নরেখা-সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে—কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসি-কান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক-টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।—

'ও পারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।'
'এ মাসটা থাক্, দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।'
'হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে, কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে একটি শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনাপরম্পরা কে বলিয়া দিবে? দিনে-দিনে রাত্রে-রাত্রে মুহূর্তে-মুহূর্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময় সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে? সেই ঘর, সেই খেলা, সেই বাপ মা, সেই সুখশৈশব, সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি একদণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়? সেদিন কিছুতে আর একটি মাসের প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতেছিল না—বিশেষত সেদিন নদীর ও পার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারা-মুখরিত মেঘচ্ছায়াশ্যামল কূলে-কূলে-পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনি হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি।—ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জনা করিবেন,

এমন-কি তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন। ভাইয়ের প্রতি 'গুণবতী' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কন্যাটি অপরিমেয় মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল। সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না তাহার সেই একটি দিনের মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত। হয়তো ভুলটি গুরুতর নহে; হয়তো ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে, এমনও হইতে পারে।

আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে—

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে॥
মাসি কাঁদেন, মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই-যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে॥
পিসি কাঁদেন, পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই-যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই-যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে॥
বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই-যে বোন—

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্বব্যবহার কোনো ভদ্র-কন্যার অনুকরণীয় নহে। ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে 'ভর্তৃখাদিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।—

বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে॥

মা অলংকার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসি ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দুধ

খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন—আশা করিয়াছিলাম এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোনো প্রিয় কার্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠে। মা-বাপের পূর্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সব চেয়ে সকরুণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বকলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল—সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহবিবাদ এবং সমস্ত খেলাধুলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়ন-ঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জনে গোপনে দাঁড়াইয়া ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মল জলধারায় কলহভাষার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

এই-সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে একটি কথায় সুখদুঃখের এক-একটি বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে ছড়াটি উদ্‌ধৃত করিতেছি তাহার দুই ছত্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কত দিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে—

> দোল্‌ দোল্‌ দুলুনি। রাঙা মাথায় চিরুনি॥
> বর আসবে এখনি। নিয়ে যাবে তখনি॥
> কেঁদে কেন মরো?
> আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর করো॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূরভবিষ্যৎবর্তী বিচ্ছেদসম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষত-বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে—তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

পুঁটুর শ্বশুরবাড়ি-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে কথাটা সর্বদাই মনে লাগিয়া আছে—

> পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে।
> ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে॥
> আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
> চার মিন্‌সে কাহার দেব পালকি বহাতে॥
> সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
> চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।
> উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে॥

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে; অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ,

সেও একটা বিষম শেল। অথচ অনেক সময় জানিয়া-শুনিয়া মা-বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙাচোরা, হাসিতে কান্নাতে অশ্রুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পরভু নাচে। তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে॥
আয়ী গো চিন্‌তে পারো? গোটা-দুই অন্ন বাড়ো॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর। কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মাল্লে চড়। কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো, তোর পায়ে ধরি। থুয়ে আয় গা মায়ের বাড়ি॥
মায়ে দিল সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা, চল্‌ শ্বশুরবাড়ি॥

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট— যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে। প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত— আর, মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা-খুকুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানবরচনার সর্বপ্রথম। সে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্নরৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চিরপুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা, যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য সৌন্দর্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুকু-দেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে— সে কখনো পাখি, কখনো চাঁদ, কখনো মানিক, কখনো ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী!
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

ভালোবাসার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহপিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখি। শতসহস্র বার প্রতিষেধ প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে, সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে। সে মনে মনে জানে 'আমি উড়িতে পারি', এইজন্যই সে লোহার শলাকাগুলাকে বারম্বার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া বনকে যাইবার কোনো আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অবশ্য বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষত নিজেই স্বীকার করিতেছে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য দ্রব্যের অসম্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালোবাসা জোর করিয়া বলে, 'তোমরা কি মনে কর আমি পারি না?' তাহার এই অসংকোচ স্পর্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মতো প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়; আমরা

বলি, তাও তো বটে, কেনই বা না পারিবে। যদি কোনো সংকীর্ণহৃদয় বস্তুজগৎবদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে খাইবে কী, সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয় 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি'। শুনিবামাত্র আমরা মনে করি, ঠিক সংগত উত্তরটি পাওয়া গেল। অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা অবিসম্বাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালোবাসার আর-একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়, ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ-সীমা মানিতে চাহে না। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গ'ড়ে দেব, গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব? তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি॥

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর-কিছু কেন প্রধান হইবে? আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনো সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কী হইতে পারে! তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে, সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, এ কথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই, সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

ভালোবাসা এক দিকে যেমন প্রভেদসীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখিতে এক মুহূর্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এ পর্যন্ত কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোনো জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম নাকি খোকার চোখে আসিয়া থাকে, এই জন্য তাহার উপরে সর্বদাই ভালোবাসার সৃজনহস্ত পড়িয়া সেও কখন্ একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।—

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিনলেম ঘুম,
মণির চোখে আয় রে॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তো আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেই জন্য সেই হাটের ঘুম, ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেই জন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চার কড়া কড়ি এখনকার কালের মজুরির তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।—

থেনা নাচন থেনা।
বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচ্‌না কিনে আন্॥

কেবল তাহাই নহে—খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা, সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মুখের নাচন,
নাটা চক্ষের নাচন, কাঁটালি ভুরুর নাচন,
বাঁশির নাকের নাচন, মাজা বেঙ্কুর নাচন,
আর নাচন কী।
অনেক সাধন ক'রে জাদু পেয়েছি॥

ভালোবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখনো বৃহৎকে তুচ্ছ এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। 'নাচো রে নাচো রে, জাদু, নাচনখানি দেখি।' নাচনখানি! যেন জাদু হইতে তাহার নাচনখানিকে পৃথক্ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থের মতো দেখা যায়; যেন সেও একটি আদরের জিনিস। 'খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।' এ স্থলে 'বেড়ু করতে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকা-বাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোটি একটু বিশেষ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।—

খোকা এল বেড়িয়ে। দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত। খোকা হলেন খ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে। লাল জুতুয়া পায়ে॥

অবশ্য, খোকাবাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন সে ঘটনাটি গৃহরাজের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা, এবং তাঁহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য— কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই, তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকা-বাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোটো-ঘুণ্টি-দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া, সেটা হইল জুতুয়া। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।

সর্বশেষে, উপসংহারকালে আর-একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা

মানুষকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি', ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়—মনে হয়, সমস্ত সংসার সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম এই আনন্দভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে! যোগীগণ যে অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনামন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী!
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয় এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে, অতি অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন্ অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।—

খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।
তেলিমাগীরা মুখ করেছে কেন রে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ তেলিমাগীদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন তাহা, সে বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা -গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের

মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে— শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

* আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

কেকাধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন বুঝিবার জো নাই।'

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা, দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি-বা কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে— তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝঙ্কারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্‌ঋতুর মহাসংগীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

এক প্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এই জন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে, বলে— ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলই মিষ্ট। অর্থাৎ, উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্টগায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসার দ্বারা অপমানিত করে, মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, 'আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব।' গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, 'বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না; আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুশি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব।' বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, 'আর কেন, ঢের হইয়াছে।'

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে, সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে তাহা সে বোঝে; এইজন্যই তাহার

অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনও সে তাহার সীমা পায় না; এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে; অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, 'তুমি কী বুঝিবে!' আর-এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, 'যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর-কেহ বুঝি বোঝে না!'

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ— এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্‌ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে, ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে-একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে: মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'ললিতলবঙ্গলতা'র পার্শ্বে কুমার-সম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্‌।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গ-লতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা: ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে; তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া যায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে; সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল— কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের

মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর-ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে-একটি কাংস্যক্রেঙ্কারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান; কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে—সেই জন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো; ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই, যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্ত ভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই; শচীর কোন্ প্রাচীন কিঙ্করী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে ক্ষেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তি-শূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডীকে

আরও ঘন করিয়া চারি দিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে! তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লিরব ভালোরূপ মেশে; কারণ, যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লিরবও আর-একটা আচ্ছাদনবিশেষ—তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ, তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

* ভাদ্র ১৩০৮

পনেরো-আনা

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড়ো হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিঙ আছে তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো-আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ূরের লেজ যে কেবল রঙচঙে জিতিয়াছে তাহা নহে, তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক খঞ্জন ফিঙার পুচ্ছ লজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না; যদি করিত তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে তাহাকে ভালো না বলিয়া থাকিবার জো নাই; কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাহাকে ভালোবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সংকীর্ণ দিক দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে; সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা, কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে আমরা হাত পাতি। সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্য, লোকটি কোনো কাজের নহে, তাই তাহার কোনো প্রাচীর নাই। সে আমাদের সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গীমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জন করিয়া আনি, এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী সেই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিঙ ও ময়ূরের পুচ্ছের মতো সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্তি গড়িবার নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্য পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেনের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ্‌-গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কী হইত! একে তো বড়ো লোকেরা একাই একশো, অর্থাৎ যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক

লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন— তাহার পরে আবার মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দূরে যাক, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সংকীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্য লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক, অন্য পাঁচ জনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জালজালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোওয়াইতে উদ্যত। এই-যে জীবিতে জীবিতে লড়াই ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড়ো কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্বলতা সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা কল্পলোকবিহারী— আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্তমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন? এই জন্যই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিস্মৃতি-লোকে নির্বাসন দিয়া থাকেন; সেখানে কাহারও স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়ো বড়ো মৃতের আওতায় আমাদের মতো ছোটো ছোটো জীবিতকে নিতান্ত বিমর্ষ মলিন, নিতান্তই কোণ-ঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্ত লোভনীয় হইল কী কারণে?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন, 'ওঠো, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না।'

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই; কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদেরই পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন : সম্ভবামি যুগে যুগে।

জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশি যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃস্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে— তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহ রক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করি না; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া

গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি কাঁদি ভালোবাসি, বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি, স্বজনের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ করি, দিনের অধিকাংশ সময়ই চারি পাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোনো খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই— আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটোখাটো হাসি-কৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, আমাদের ছোটোখাটো আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্যকিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যন্ত টিঁকে। কিন্তু সে যাহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর কোনো কাজে লাগি না; সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোনো দোষ না দিয়া, ছট্‌ফট্‌ না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই, অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারি হইয়া চীন উদ্ধার করিতে নাই গেলাম। দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বলো, তবে তাহা চীন-উদ্ধার-চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে— সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল— বোধ করি সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল— তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন স্নিগ্ধসুন্দর

বিনম্রকোমল নিষ্ফলতা ভালো।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— পনেরো-আনা এবং বাকি এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির শান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয় তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যখন কোনো-এক দল পনেরো-আনা এক-আনার মতোই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

*মাঘ ১৩০৯

বসন্তযাপন

এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো-এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো-এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হুহু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি না দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি, আমাদের সর্বাঙ্গ ঝর্ঝর্ মর্মর্ করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে, আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহি ছিল না।

যদি বলো অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত, সে কথা মানি। যেদিনকার যাহা সেদিনকার তাহা এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশ দিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ-সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্ভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্

ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ পড়িয়া পড়িয়া, সম্মুখে চাহিয়া চাহিয়া, যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে সেই-টুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে-সমস্ত তাগিদ ছিল, আজও ঠিক সেই-সব তাগিদই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কী বাহাদুরি আছে। মন মস্ত লোক, সে কী না পারে? সে দক্ষিনে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্ হন্ করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে? তাহাতে দক্ষিনে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই তো অল্প দিন হইল, আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খস্ খস্ করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল—ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মতো যেমনি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অমনি আমাদের বন-শ্রেণী পাতা-খসানোর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারি দিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা-বদল, রঙ-বদল, আমরা তখনও গোরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তার ধুলো উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনও যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল এখনও সেই লড়ি।

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই—অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় পনেরোই কি ষোলোই হইবে, বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে; পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্নতন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্বোচ্চ ব্যাপার নয়, বড়োলাট-ছোটোলাট সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতি বৎসরের সেই চিরন্তন বার্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়—এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল; বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। বাদলার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না—মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জড়প্রকৃতির আঁচল-

ধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কী কথা আছে! বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জনমেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিনে হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে, মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেসুরের মতো বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথি-বিশেষে বেগুন শিম কুষ্মাণ্ড নিষিদ্ধ আছে; আরও কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার —কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকার-দের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসন্তের দিনে-যে বিরহিণীর প্রাণ হাহা করে, এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সংকোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এমনি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসন্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে; তখন তাহাদের হিসাবের বোধ-মাত্র থাকে না; যেখানে দুটো ফল ধরিবে সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে? সে আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না—কেবলই কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে, ও যাহাদের সে বালাই নাই তাহারা বেলা চারটে পর্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে? আমরা কি এতই একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব? কোনো অনির্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না?

আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা, এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়দিদি বনলক্ষ্মীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মতো মিশিতে হইবে; আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্ত দিন কাটিবে, মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে; বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে দিই—সেখানে সে যেন এমনতরো কোনো ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে গাছ-পালারা যে ভাষা না বোঝে। এমনি করিয়া চৈত্রের শেষ পর্যন্ত মাটি বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া, সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব; আলোতে-ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু হায়, কোনো কাজই বন্ধ হয় নাই, হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে, কর্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি—এখন বসন্ত আসিলেই কী আর গেলেই কী!

মনুষ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে। ইহার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কী হইবে! এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতেই পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল! পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজা-স্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে 'আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ— আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি'? কেন সে এ কথা বলে না 'আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে— স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে'?

হায় রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল, তবু তোর পাখা দুটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে— এই কি মানবজন্ম!

* চৈত্র ১৩০৯

মেঘদূত

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্‌কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্‌ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল? আর সেই-যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়? আর সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী! অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে— আমরা কেবল সেই-যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুলচরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনকরেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।

আবার, সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী গিরি নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে; তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশ ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই-অনুযায়ী। মনে হয়, ওই রেবা সিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে, অবন্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারি দিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

অতএব, যক্ষের যে মেঘ নগনদীনগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই এবং পুরবধূদিগের ভ্রূলতা-বিভ্রমে-পরিচিত নিবিড়পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহলদৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি; এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।

মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়—এক কালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম; এখন কাহার অভিশাপে, মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং

আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিক প্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীত কাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।

কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সেই আমার বহুভাগ্য; তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

> ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
> যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ
> আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
> পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন : দুঁহু-কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা—যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আনিয়া দেয় না—আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর!

কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো-এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির!' এ কী হইল! যে আমার মনোরাজ্যের লোক সে আজ বাহিরে আসিল কেন! ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরামদাস বলিতেছেন : তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির! যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

হে নির্জনগিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে? তোমার তো চেতন অচেতনে

পার্থক্য-জ্ঞান নাই, কী জানি যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাকো!

* অগ্রহায়ণ ১২৯৮

কাব্যের উপেক্ষিতা

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর-একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের-সর্বসুখ-বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্র ললাটে সিঞ্চিত হইল না! হায় অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো মহা-কাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

কাব্যসংসারে এমন দুটি-একটি রমণী আছে যাহারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থান-সংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন তাহা পাঠকবিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে-কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে তাহার মধ্যে ঊর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়া গেছেন গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে; কারণ, গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ, তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়-দ্বারা পাই না, কল্পনাদ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয়, দ্রৌপদীর নাম যদি ঊর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

ঊর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তার

পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে এক দিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহ-সভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। ঊর্মিলা চিরবধূ—নির্বাক্‌কুণ্ঠিতা, নিঃশব্দচারিণী। ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবার মাত্র তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, ইনি কে?' লক্ষ্মণ লজ্জিত হাস্যে মনে মনে কহিলেন, 'ওহো, ঊর্মিলার কথা আর্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন!' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন; তাহার পর রামচন্দ্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখচিত্র-শ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল-অঙ্গুলি এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে তো কেবল বধূ ঊর্মিলা মাত্র।

তরুণশুভ্র ভালে যে দিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, ঊর্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যে দিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সে দিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না! আর, যে দিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সে দিন বধূ ঊর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন্‌ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কি কেহ জানে! সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল! যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না!

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সীতার জন্য ঊর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ তো বারোবৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; নারীজীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর ঊর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল! সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাশোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নতদৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন; যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচিরপ্রণয়ালোক-বঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল! পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহা-দুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই।

. . . .

সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া

বাস করিতেছে। প্রিয়ম্বদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল; নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। কঠিনহৃদয় কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকার জন্য কত অক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্মমচিত্তে বিসর্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে যাহাকে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয়? দীপ্তরোষ ঋষিশিষ্যদ্বয় এবং হতবুদ্ধি রোরুদ্যমানা গৌতমী যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া উৎসুক উৎকণ্ঠিত সখী-দুইটিকে রাজসভার বৃত্তান্ত জানাইল তখন তাহাদের কী হইল সে কথা শকুন্তলা নাটকের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই অকথিত অমেয় বেদনা সেইখানেই ক্ষান্ত হইয়া গেল? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বিনা ছন্দে বিনা ভাষায় চিরদিন তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল না?

কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি প্রিয়ম্বদা-অনসূয়া শকুন্তলার কতখানি ছিল, তখন সেই কণ্বদুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়বিচারসংগত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর।

শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দুটি লাবণ্যপ্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল। তিনটি সখী যখন জলের ঘট লইয়া অকালবিকশিত নবমালতীর তলে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দুষ্যন্ত কি একা শকুন্তলাকে ভালোবাসিয়াছিলেন? তখন হাস্যে কৌতুকে নবযৌবনের বিলোলমাধুর্যে কাহারা শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল? এই দুটি তাপসী সখী। একা শকুন্তলা শকুন্তলার একতৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো-আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে যেখানে একাকিনী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রেমাকুলতা বর্ণিত আছে সেখানে কবি অনেকটা হীনবল হইয়াছিলেন—কোনোমতে অচিরে গৌতমীকে আনিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন—কারণ, শকুন্তলাকে যাহারা আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছিল তাহারা সেখানে ছিল না। বৃন্তচ্যুত ফুলের উপর দিবসের সমস্ত প্রখর আলোক সহ্য হয় না; বৃন্তের বন্ধন এবং পল্লবের ঈষৎ অন্তরাল ব্যতীত সে আলোক তাহার উপর তেমন কমনীয় কোমল ভাবে পড়ে না। নাটকের ওই কটি পত্রে সখী-বিরহিতা শকুন্তলা এতই সুস্পষ্টরূপে অসহায় অসম্পূর্ণ অনাবৃত-ভাবে চোখে পড়ে যে তাহার দিকে যেন ভালো করিয়া চাহিতে সংকোচ বোধ হয়; মাঝখানে আর্যা গৌতমীর আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকমাত্রেই মনে মনে আরাম লাভ করে।

আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা—চেনা কঠিন হইতে পারে।

শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনো পরিবর্তন হয় নাই?

হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া। এখন হইতে অপরাহ্ণে আলবালে জল সেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোকতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে?

এখন সেই সখীভাবনির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদাকে মর্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারা তো ছায়া নহে; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই তো। তাহারা জীবন্ত, মূর্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দেশে অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে; অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না; এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক-এক দিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

সংস্কৃত সাহিত্যে আর-একটি অনাদৃতা আছে। তাহার সহিত পাঠকদের পরিচয়-সাধন করাইতে আমি কুণ্ঠিত। সে বড়ো কেহই নহে, সে কাদম্বরীকাহিনীর পত্রলেখা। সে যেখানে আসিয়া অতি স্বল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনো প্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড়ো সংকীর্ণ, একটু এ দিকে ও দিকে পা ফেলিলেই সংকট।

এই আখ্যায়িকায় পত্রলেখা যে সুকুমার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে সেরূপ সম্বন্ধ আর-কোনো সাহিত্যে কোথাও দেখি নাই। অথচ কবি অতি সহজে সরলচিত্তে এই অপূর্ব সম্বন্ধবন্ধনের অবতারণা করিয়াছেন, কোনোখানে এই ঊর্ণাতন্তুর প্রতি এতটুকু টান পড়ে নাই যাহাতে মুহূর্তেকের জন্য ছিন্ন হইবার আশঙ্কামাত্র ঘটিতে পারে।

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে কৈলাস নামে এক কঞ্চুকী প্রবেশ করিল— তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা— অনতিযৌবনা, মস্তকে ইন্দ্রগোপকীটের মতো রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দনতিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমলতনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য নূতন অঙ্কিত। এই তরুণী লাবণ্যপ্রভাপ্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া ক্বণিত-মণিনূপুরাকুলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।

কঞ্চুকী প্রণাম করিয়া ক্ষিতিতলে দক্ষিণ কর রাখিয়া জ্ঞাপন করিল, 'কুমার, আপনার মাতা মহাদেবী বিলাসবতী জানাইতেছেন : এই কন্যা পরাজিত কুলূতেশ্বরের দুহিতা, বন্দিনী, ইহার নাম পত্রলেখা। এই অনাথা রাজদুহিতাকে আমি দুহিতা-নির্বিশেষে এতকাল পালন করিয়াছি, এক্ষণে ইহাকে তোমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম। ইহাকে সামান্য পরিজনের মতো দেখিয়ো না, বালিকার মতো লালন করিয়া নিজের চিত্তবৃত্তির মতো চাপল্য হইতে নিবারণ করিয়ো, শিষ্যার ন্যায়

দেখিয়ো, সুহৃদের ন্যায় সমস্ত বিশ্রম্ভব্যাপারে ইহাকে অভ্যন্তরে লইয়ো, এবং এই কল্যাণীকে এমত-সকল কার্যে নিযুক্ত করিয়ো যাহাতে এ তোমার অতিচিরপরিচারিকা হইতে পারে।'

কৈলাস এই কথা বলিতেই পত্রলেখা তাঁহাকে অভিজাত প্রণাম করিল এবং চন্দ্রাপীড় তাহাকে অনিমেষ লোচনে সুচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া, 'অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে' বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিঙ্করীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো। কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়! নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন!

কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন, এই গণ্ডির রেখামাত্র বাহিরে তাহাকে কোনো দিন টানেন নাই। হতভাগিনী বন্দিনীর প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কী হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনো দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখিত্ব-পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না!

অথচ সখিত্বের মধ্যে লেশমাত্র অন্তরাল ছিল না। কবি বলিতেছেন, পত্রলেখা সেই প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্রেই সেবারসসমুপজাতানন্দা হইয়া, দিন নাই রাত্রি নাই, উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে, ছায়ার মতো রাজপুত্রের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। চন্দ্রাপীড়েরও তাহাকে দেখা অবধি প্রতিক্ষণে-উপচীয়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল। প্রতিদিন ইহার প্রতি প্রসাদ রক্ষা করিলেন এবং সমস্ত বিশ্বাসকার্যে ইহাকে আত্ম-হৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এই সম্বন্ধটি অপূর্ব, সুমধুর, কিন্তু ইহার মধ্যে নারী-অধিকারের পূর্ণতা নাই। নারীর সহিত নারীর যেরূপ লজ্জাবোধহীন সখীসম্পর্ক থাকিতে পারে পুরুষের সহিত তাহার সেইরূপ অসংকোচ অনবচ্ছিন্ন নৈকট্যে পত্রলেখার নারীমর্যাদার প্রতি কাদম্বরীকাব্যের যে-একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাতে কি পাঠককে আঘাত করে না? কিসের আঘাত? আশঙ্কার নহে, সংশয়ের নহে। কারণ, কবি যদি আশঙ্কা-সংশয়েরও লেশমাত্র স্থান রাখিতেন তবে সেটা আমরা পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি কথঞ্চিৎ সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা এবং সন্দেহের দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পর্যন্ত নাই। পত্রলেখা তাহার অপূর্বসম্বন্ধ-বশত অন্তঃপুর তো ত্যাগই করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সমীপবর্তী হইলে স্বভাবতই যে-একটি সংকোচে সাধ্বসে এমন-কি সহাস্য ছলনায় একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে ইঁহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই। সেই কারণেই এই অন্তঃপুরবিচ্যুতা অন্তঃপুরিকার জন্য সর্বদাই ক্ষোভ জন্মিতে থাকে।

চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার নৈকট্যও অসামান্য। দিগ্‌বিজয়যাত্রার সময় একই

হস্তিপৃষ্ঠে পত্রলেখাকে সম্মুখে বসাইয়া রাজপুত্র আসন গ্রহণ করেন। শিবিরে রাত্রি-কালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজ শয্যার অনতিদূরে শয়ননিষণ্ণ পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন তখন নিকটে ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।

অবশেষে কাদম্বরীর সহিত চন্দ্রাপীড়ের যখন প্রণয়সংঘটন হইল তখনও পত্রলেখা আপন ক্ষুদ্র স্থানটুকুর মধ্যে অব্যাহতভাবে রহিল। কারণ, পুরুষচিত্তে নারী যতটা আসন পাইতে পারে তাহার সংকীর্ণতম প্রান্তটুকুমাত্র সে অধিকার করিয়াছিল; সেখানে যখন মহামহোৎসবের জন্য স্থান করিতে হইল তখন ঐটুকু প্রান্ত হইতে বঞ্চিত করা আবশ্যকই হইল না।

পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর ঈর্ষার আভাসমাত্রও ছিল না। এমন-কি চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার প্রীতিসম্বন্ধ বলিয়াই কাদম্বরী তাহাকে প্রিয়সখীজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিল। কাদম্বরীকাব্যের মধ্যে পত্রলেখা যে অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে সেখানে ঈর্ষা সংশয় সংকট বেদনা কিছুই নাই; তাহা স্বর্গের ন্যায় নিষ্কণ্টক, অথচ সেখানে স্বর্গের অমৃতবিন্দু কৈ!

প্রেমের উচ্ছ্বসিত-অমৃত-পান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ঘ্রাণেও কি কোনো দিনের জন্য তাহার কোনো-একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! সে কি চন্দ্রা-পীড়ের ছায়া! রাজপুত্রের তপ্ত যৌবনের তাপটুকুমাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই! কবি সে প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা।

পত্রলেখা যখন কিয়ৎকাল কাদম্বরীর সহিত একত্রবাসের পর বার্তাসহ চন্দ্রাপীড়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, যখন স্মিতহাস্যের দ্বারা দূর হইতেই চন্দ্রাপীড়ের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া সে নমস্কার করিল, তখন পত্রলেখা প্রকৃতিবল্লভা হইলেও কাদম্বরীর নিকট হইতে প্রসাদলব্ধ আর-একটি সৌভাগ্যের ন্যায় বল্লভতরতা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে, অতিশয় আদর দেখাইয়া, যুবরাজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

চন্দ্রাপীড়ের এই আদর এই আলিঙ্গনের দ্বারাই পত্রলেখা কবিকর্তৃক অনাদৃতা। আমরা বলি, কবি অন্ধ। কাদম্বরী এবং মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়তৃষার্ত চিরবঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেছে, সে কথা তিনি একে-বারে বিস্মৃত হইয়াছেন। বাণভট্টের কল্পনা মুক্তহস্ত; অস্থানে অপাত্রেও তিনি অজস্র বর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। কেবল তাঁহার সমস্ত কৃপণতা এই বিগতনাথা রাজদুহিতার প্রতি। তিনি পক্ষপাতদূষিত পরম অন্ধতা-বশত পত্রলেখার হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন, তরঙ্গলীলাকে তিনি যে পর্যন্ত আসিবার অনুমতি করিয়াছেন সে সেই পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া আছে, পূর্ণ-চন্দ্রোদয়েও সে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করে নাই। তাই কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয়, অন্য-সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই।

* জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

সাহিত্যসৃষ্টি

যেমন একটা সুতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারি দিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে। এমন-কি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা-কিছু সূচনা পাইবামাত্রই অমনি তাহার চারি দিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকার ধারণ করিতে থাকে। অব্যক্ত ভাবনাগুলা যেন মূর্তিলাভ করিবার সুযোগ-অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলা আমাদের কর্মের সময়, তখন বুদ্ধির কড়াক্কড় পাহারা, সে আমাদের আপিসে বাজে ভিড় করিয়া কোনোমতে কর্ম নষ্ট করিতে দেয় না। তাহার আমলে আমাদের ভাবনাগুলা কেবল-মাত্র কর্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত সুসংগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। অবসরের সময় যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি তখনো এই ব্যাপারটা চলিতেছে। হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অমনি কত দিনের স্মৃতি তাহার চারি দিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেমনি গড়িয়া উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কী কথা যে পরে পরে আকারধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই। আর-কিছু নয়, কেবল কোনো রকম করিয়া কিছু-একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।

এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তার পরে টিঁকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। গাছে ফল যে-ক'টা ফলিয়া উঠে তাহাদের এই দরবার হয় যে, 'ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না— আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া, গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব— সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই।' ভাবুকের মনে ভাবনাগুলো ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, 'কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব।' প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। ভাবনাগুলা সজীব পদার্থের মতো সেই কৃতার্থতার তাগিদ মানুষকে কেবলই দিতেছে। সেই জন্য মানুষে মানুষে গলাগলি কানাকানি চলিতেছেই। একটা মন আর-একটা মনকে খুঁজিতেছে, নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য, নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য। এই জন্য মেয়েরা ঘাটে জমে, বন্ধুর কাছে বন্ধু ছোটে, চিঠি আনাগোনা করিতে থাকে, এই জন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ।

এই-যে এক মনের ভাবনার আর-এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টা মানব-সমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি স্বভাবতই এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়। অনেক

সময়ে এ আমাদের অলক্ষিতেই ঘটিতে থাকে। এ কথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনো বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়। এক বন্ধুকে আমরা যে রকম করিয়া চিঠি লিখি আর-এক বন্ধুকে আমরা ঠিক তেমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না। আমার ভাবটি বিশেষ বন্ধুর কাছে সম্পূর্ণতা লাভ করিবার গূঢ় চেষ্টায় বিশেষ মনের প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা পরিমাণে আপস করিয়া লয়। বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।

এইজন্য সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও, তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে; যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এই জন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না; ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন সাহিত্যের সেই গোড়াকার কথা, সেই দানা বাঁধার কথাটা ভাবিয়া দেখো। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।—

কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ, কত পর্বত-অরণ্য নদী-নির্ঝর নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জগম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধ সঞ্চার, কবির মনে কত দিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া, সৌন্দর্যের পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে। কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ তো দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের মনে সেই তাঁহার বহুদিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটি সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর-একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কী সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে! অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্যটি এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে।

সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে ভাবটি জাগিয়া ওঠে সে তো আমরা সকলেই জানি। আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এমন কোনো-না-কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি যাঁহাকে দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য আমাদের মনকে কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি, সেই দেখার স্মৃতি তো মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মতো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী নারীর সম্বন্ধে যে-সকল ভাব হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহারা কেমন এক হইয়া, শক্ত হইয়া ধরা দিল! ঘরে ঘরে নিষ্ঠাবতী স্ত্রীদের যে-সমস্ত কঠোর তপস্যা গৃহকর্মের আড়াল হইতে আভাসে চোখে পড়ে, তাহাই মন্দাকিনীর ধারাধৌত দেবদারুর বনচ্ছায়ায় হিমালয়ের শিলাতলে

দেবীর তপস্যার ছবিতে চিরদিনের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ওই যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর—

সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি-কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।

বাষ্প তো হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল স্পর্শটুকু পাইবামাত্র জমিয়া শিশির হইয়া দেখা দেয়। আকাশে বাষ্প ভাসিয়া চলিয়াছিল, দেখা যাইতেছিল না, পাহাড়ের গায়ে আসিয়া ঠেকিতেই মেঘ জমিয়া বর্ষণের বেগে নদী-নির্ঝরিণী বহাইয়া দিল। তেমনি গীতিকবিতায় একটিমাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টল্‌টল্‌ করিয়া ওঠে, আর বড়ো বড়ো কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সংঘ ঝর্নায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, বাষ্পের মতো অব্যক্ত ভাবগুলি কবির কল্পনার মধ্যে এমন একটি স্পর্শ লাভ করে যে, দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘেরিয়া বিচিত্রসুন্দর মূর্তি রচনা করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।

ফরাসিবিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও বা করুণায় কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানা মূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যে-সকল বহুতর অব্যক্ত ভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায় ক্ষণিক ভাবনায় ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক-একজন কবির কল্পনা এক-একটি আকর্ষণকেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদেরই মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয়। আনন্দ কেন হয়? হয় তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি দেখিবার অনেক চেষ্টা সমস্ত মানব-মনের মধ্যে কেবলই কাজ করিতেছে; এই জন্য যেখানেই সে কোনো-একটা ঐক্যের মধ্যে নিজের কোনো-একটা বিকাশকে দেখিতে পায় সেখানেই তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে আনন্দ দিতে থাকে।

কোন্‌ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন্‌ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপনার অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল, তাহাই সাহিত্যসমালোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। কালিদাসের উপমা ভালো বা

ভাষা সরস, বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা সুন্দর, বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণরস প্রচুর আছে—এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণবিকর্ষণ-গ্রহণবর্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য। কালিদাস জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, সহিয়াছেন, কল্পনা ও রচনা করিয়াছেন; তাঁহার এই ভাবনা-বেদনা-কল্পনা-ময় জীবন মানবের অনন্তরূপের একটি বিশেষ রূপকেই বাণীর দ্বারা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে—সেইটি কী? যদি আমরা প্রত্যেকেই অসাধারণ কবি হইতাম তবে আমরা প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়কে এমন করিয়া মূর্তিমান করিতাম যাহাতে একটি অপূর্বতা দেখা দিত এবং এইরূপে অন্তহীন বিচিত্রই অন্তহীন এককে প্রকাশ করিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি, আমরা নিজেকে ঠিকমত জানিই না; যেটাকে আমরা সত্য বলিয়া প্রচার করি সেটা হয়তো আমাদের প্রকৃতিগত সত্য নহে, তাহা হয়তো দশের মতের অভ্যস্ত আবৃত্তিমাত্র; এই জন্য আমি আমার সমস্ত জীবনটা দিয়া কী দেখিলাম, কী বুঝিলাম, কী পাইলাম, তাহা সমগ্র করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেই পারি না। কবিরা যে সম্পূর্ণ পারেন তাহা নহে। তাঁহাদের বাণীও সমস্ত স্পষ্ট হয় না, সত্য হয় না, সুন্দর হয় না; তাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়কে সকল সময়ে সার্থক করে না; কিন্তু তাঁহাদের নিজের অগোচরে তাঁহাদের চেষ্টার অতীত প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গূঢ় চেষ্টার প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ, যাহাকে 'ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর মেলে না', কখনো অল্প মাত্রায় কখনো অধিক মাত্রায় প্রকাশ হইতে থাকে। যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্র রূপটিকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।

আমার এ-সকল কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে-একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে; ইহাও আমার তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটা ভাগ।

তেমন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণ-সম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। আমার কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

'গ্রাম্যসাহিত্য'-নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারি দিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে একটা বড়ো কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড়ো পিণ্ড করিয়া তোলেন। হরপার্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত কাহিনী যাহা মূলরামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের

গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্টসভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া, দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো ছোটো পল্লী-সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফল-ধরা হইলেই ফুলের পাপড়ি-গুলার মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইংলন্ডের আর্থার-কাহিনী, স্ক্যান্ডি-নেভিয়ার সাগা-সাহিত্য এমনি করিয়া জন্মিয়াছে; সেইগুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড়ো আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমরের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারত।

ইলিয়াড এবং অডেসিতে নানা খণ্ডগাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে—এ মত প্রায় মোটামুটি সর্বত্রই চলিত হইয়াছে। যে সময়ে লেখা পুঁথি এবং ছাপা বইয়ের চলন ছিল না এবং যখন গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত, তখন যে ক্রমে নানা কালে ও নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। কিন্তু যে কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যগুলি খাড়া হইবার জায়গা পাইয়াছে তাহা যে একজন বড়ো কবির রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই কাঠামোর গঠন অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জোড়াগুলি ঐক্যের গণ্ডি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পায় নাই।

মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূলে কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন-কি তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন মূল বিদ্যাপতির যে-সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটি-চারটির ঠিকানা মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন-সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মতো হইয়া যায় নাই। কারণ, একটা মূলসুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথমে নানা মুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্বসাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানা দিক হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়। যে কবি গোড়ায় ইহার ভিত পত্তন করিয়াছেন তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা-বলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি এমন জায়গায় এমন করিয়া গোড়া ফাঁদিয়াছেন, তাঁহার প্ল্যানটা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া এত লোকের হাত পড়িয়া কোথাও যে কিছুই তেড়াবাঁকা হয় না, তাহা বলিতে পারি না— কিন্তু মূল গঠনটার মাহাত্ম্যে সে-সমস্তই অভিভূত হইয়া থাকে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়। তাহাকে আমি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করি। প্রথমে পর্বতের নানা গোপন গুহা হইতে নানা ঝর্না একটা জায়গায় আসিয়া নদী তৈরি করিয়া তোলে। তার পরে সে যখন আপনার পথে চলিতে থাকে তখন নানা দেশ হইতে নানা উপনদী তাহার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির মতো মহানদী জগতে অল্পই আছে। এই-সমস্ত নদী মাতার মতো একটি বৃহৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তকে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা এক-একটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মতো। তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র আছে। ইলিয়ড অডেসি রামায়ণ ও মহাভারত। অলংকার-শাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ, বা মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্‌ট্‌, ভল্‌টেয়ারের আঁরিয়াদ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইয়া থাকে। তাহার পরে এখনকার ছাপাখানার শাসনে মহাকাব্য গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ হইয়া গেছে।

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিমনিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত, কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন সেই আশ্রমে তাহারা কেবলই উৎপাত করিত। দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গমস্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন

করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য-উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন; এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন তেমনি অনার্যদের প্রভাব খর্ব করিয়া যিনি আর্যদিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন তিনিও সাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজ্য হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র শত্রুদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজ্য হরণ করেন নাই। বিভীষণ তাঁহার বন্ধু হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে লাগিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার বানরদের হাতে দিয়াই চিরদিনের মতো তিনি তাহাদিগকে বশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রই আর্যদের সহিত অনার্যদের মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাহারই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্যদের সঙ্গে এক-সমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুজাতি রচনা করিল। এই হিন্দুজাতির মধ্যে উভয় জাতির আচার-বিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে ক্রমে আর্য-অনার্যের মিলন যখন সম্পূর্ণ হইল, পরস্পরের ধর্ম ও বিদ্যার বিনিময় হইয়া গেল, তখন রামচন্দ্রের পুরাতন কাহিনী মুখে মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর ধরিতে লাগিল। যদি কোনোদিন ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিপূর্ণ মিলন ঘটে তবে কি ক্লাইবের কীর্তি লইয়া বিশেষভাবে আড়ম্বর করিবার কোনো হেতু থাকিবে? না ম্যুটিনির উট্রাম প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনীকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক কোনো উত্তেজনা থাকিতে পারিবে? যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে মহাকাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিলেন তিনি এই অনার্যবশ-ব্যাপারকেই প্রাধান্য না দিয়া মহৎ চরিত্রের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড়ো করিয়া তুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয়। রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাহাকে এক জায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্বসাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু আদিকবি তাহাকে যেখানে দাঁড় করাইয়াছেন সে যে তাহার পর হইতে সেইখানেই স্থির হইয়া আছে, তাহা নহে।

রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণ-ধর্মের রক্ষাকর্তা-রূপে, অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাবণকে মারিয়াছিলেন সেও কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য; অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয় রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া

রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তখন যদিচ রামের চরিতে অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, অতি-প্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন। তখন রামায়ণের মূল সুরটার মধ্যে আর-একটা পরিবর্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামকে দেবতা বলিলেই, তিনি যে-সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয় কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে। সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহকচণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মতো আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। কালকেতু ধনপতি চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোকেই তাহার নায়ক; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে, মানী জ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়াছে। ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর-একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়। যে জিনিসটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা

হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিসটা কোথাও নাই।

মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজসিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছিল তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? তাহাদের সেমেটিক-ভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিত্য বেশভূষা রাগরাগিণী ধর্মকর্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি এমন হয় যে কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।

য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে-একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে এ কথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধকাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যের রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারি দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্‌কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের

শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি— তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই কথাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি— মানুষের সাহিত্যে যে-একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তাহা দেখিতে আকস্মিক; এই চৈত্রমাসে যে ঘন ঘন এত বৃষ্টি হইয়া গেল সেও তো আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কত সুদূর পশ্চিম হইতে কারণ-পরম্পরার দ্বারা বাহিত হইয়া, কোথাও বা বিশেষ সুযোগ কোথাও বা বিশেষ বাধা পাইয়া, সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। ভাবের প্রবাহও তেমনি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে; সে ছোটো বড়ো কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক এবং এক হইতে শতধা হইয়া কত রূপ-রূপান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি!

লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া উঠে; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে। এই জন্য জগতের যে-সকল কাব্যের লেখক কে তাহার যেন ঠিকানা নাই, যে-সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অথচ যাহার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় নাই, সেই-সকল কাব্যের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ভাব-সৃষ্টির বিপুল নৈসর্গিকতার প্রতি আপনাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

* আষাঢ় ১৩১৪

আধুনিক কাব্য

মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্‌ন্‌স থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিল। যথা, ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌, কোল্‌রিজ, শেলি, কীট্‌স্‌।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতাদুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে—রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটা-তিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্‌ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। 'কুমুদকহ্লারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে বুলি সরিয়ে পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে করে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে—'ধিক্‌'।

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচারভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে—ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানা রকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র করে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি

করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর! কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা! সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে : প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্য সংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাঙ্কে-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন করে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা, নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা, তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয় তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ড্‌স্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্‌স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্য -দ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়, সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়, সে যুগে বেশে ভূষায় শোভন রীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরামকেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা-কাপড় ছাঁটা-চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জিনিসটাতে আর কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে দেখেছে— বলছে মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার করে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি এ কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল— লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে ঊষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়।

সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে? এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই? সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না?

কিন্তু আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু করে কাজ, হুড়মুড় করে আমোদ-প্রমোদ। যে মানুষ একদিন র'য়ে ব'সে আপনার সংসারকে আপনার করে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া করে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কি না সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দাঁড় ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায় 'মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ'। জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে? নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা-কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়; ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধবন্ধনে নয়। আমি কি ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিকমত কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রী ভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন : I am the greatest laugher of all। বলছেন : আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে। Than the frog and Apollo – এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে, কবি মিঠে করে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হত সমুদ্র তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত— ওটা দস্তুরমত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটোছাঁদের দস্তুরমত কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয় এ কথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ অ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বৈ ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্-হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেয়সী আপত্তি

করলেও। কিন্তু অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে হাসি সূর্যের, যে হাসি ওক-বনস্পতির, যে হাসি অ্যাপলোর, সে হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর করে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে। সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' বললে প্রায় বারো-আনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে-কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা করে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না।—

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দিযন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায় যেন রেশমের আসবাব,
তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের ঝরা গোলাপের পাপড়ি
যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে-পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘষা-মশলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো—
তোমার ঐ মিলে-মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার
মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা,
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট টং করে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেক কালের যে মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, 'অয়মহং ভোঃ! আমাকে দেখো।' ঐ মেয়ে-কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাঁচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling

shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers.

সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার-ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'মানে কী হল মশায়? চটি-জুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল?' উত্তরে বলতে হয়, 'চেয়েই দেখো-না।' 'দেখে লাভ কী?' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌন্‌ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে; একটা ছোটো ছেলে তালি-দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে; সে থাকতে পারল না, বলে উঠল 'দেখ্ চেয়ে রে, কী সুন্দর'। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর!' কবি বলছেন, শুনে I was mildly abashed।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও; একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না 'কী সুন্দর'। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা, এর পংক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধ প্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর; কেউ কাজের, কেউ অকাজের; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে চিত্রকলাতেও সেই

রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহি নেই; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এই জন্যে আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে— তার বাছ-বিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখছেন—

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা— ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুকনো পাতা আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিমনির চোঙের উপর বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া—
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে ক্ষুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।—

তার পরে পুরুষটার খবর এই—

His soul stretched tight across the skies
that fade behind a city block,
or trampled by insistent feet
at four and five and six o'clock ;
and short square fingers stuffing pipes,
and evening newspapers, and eyes
assured of certain certainties,
the conscience of a blackened street
impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনা-ওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল। বললেন—

I am moved by fancies that are curled
around these images, and cling :
the notion of some infinitely gentle
infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টি'কল না। এইখানে কূপমণ্ডুকের মক্ মক্ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া—

> মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
> দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো
> ঘুঁটে-কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি নাও ফোটে তা হলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যটাকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে—এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোমাণ্টিক বলা যায়। সদ্যজাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে অনাবৃত আকাশে পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্ন রকম করে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে একে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে, কেউ-বা একে এমন অশ্রদ্ধা করে যে এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে আকৃতি তারও অন্তরে কেউ-বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে; মনে করে না গূঢ় ব'লে কিছুই নেই, মনে করে না যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল, দীর্ঘকাল যে সমাজ-স্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে-সকল শোভনরীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল—বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা

দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব : বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন—

> এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন?
> প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
> যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—
> সে জগৎ কোনো মানুষের না।
> পীচ গাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর-একটা ছবি—

> নীল জল··· নির্মল চাঁদ,
> চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
> ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল—
> তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর-একটা—

> নগ্নদেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
> এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
> টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
> পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
> আমার খালি মাথার 'পরে।

একটি বধূর কথা—

> আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
> আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
> তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে
> কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।

চাংকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট করে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরুকুটি গেল ঘুচে, আমি হাসলুম।
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণি জল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাংফেংশার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা 'আধুনিক' হত। কেননা, সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত—স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনই লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তরে দেড় লাইন ভ'রে ফুটকি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল?' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো হয়েই থাকে।' 'অন্যটাও তো হয়?' 'হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকেলে কাব্যের বাবুগিরি ছিল সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে

নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে; বলে, আসল জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল—সে বড়োঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমত সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল? এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন? একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি ডেন্টিস্‌ট্‌ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে, কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না—সে কথা মানতে পারি নে। এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয় তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়? কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না—প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তবসাধনা ব'লে বাহাদুরি করতে হবে?

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন—

রিচার্ড্‌ কোড়ি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত।
ছিপ্‌ছিপে, যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন 'গুড্‌ মর্নিং' আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত, মনে হত, আহা, আমি যদি হতুম ইনি।

এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না, গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে,
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে রিচার্ড্ কোড়ি গেলেন বাড়িতে—
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এইভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী-উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন করে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংসরসরক্তের কদর্য সমাবেশ সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এই রকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে, সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া—এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে 'যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে-ধরা—যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা'?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়, গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে, লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ করে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান করে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতি-ভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ করো তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

* বৈশাখ ১৩৩৯

সত্য ও সুন্দর

মন দিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য; তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের, সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা—রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমত হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি তাতে কিছু আসে যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না! সাহিত্যে দেয়, নইলে ওথেলো-নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্‌বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারি দিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারি দিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল

অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়; আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্সের বাণী মনে পড়ল : Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম— অত্যন্ত বোধ করলুম', জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিল-মোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়, সে অসুন্দর হলেও মনোরম; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

মানুষ নানা রকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

শান্তিনিকেতন
৮ আশ্বিন ১৩৪৩

মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জন্তু মানুষের শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জন্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্ছাকে জন্মকাল থেকে মানুষের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসন্তান মানুষই হয় না, অথচ তখন তার জন্তু হতে বাধা নেই। এর কারণ, বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহা-মানুষ।

এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষপরম্পরায় মিলে এক-একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে।

এদের চেহারার একটা বিশেষত্ব আছে। এদের মনের গড়নটাও কিছু বিশেষ ধরনের। এই বিশেষত্বের লক্ষণ অনুসারে দলের লোক পরস্পরকে বিশেষ আত্মীয় বলে অনুভব করে। মানুষ আপনাকে সত্য বলে পায় এই আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা বহুদূর-ব্যাপী বৃহৎ ঐক্যজালে।

মানুষকে মানুষ করে তোলবার ভার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেই জন্যে মানুষের সব চেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিশ্লিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিশ্লিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব, এই জন্যে শিশুকাল থেকে মানুষের সব চেয়ে প্রধান শিক্ষা—পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা। যেখানে তার মধ্যে জন্তুর ধর্ম প্রবল সেখানে স্বেচ্ছা এবং স্বার্থের টানে তাকে স্বতন্ত্র করে, ভালোমত মিলতে দেয় বাধা; তখন সমষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা, যে শিক্ষা, যে প্রবর্তনা দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে সে জোর ক'রে বলে, 'তোমাকে মানুষ হতে হবে কষ্ট ক'রে, তোমার জন্তুধর্মের উল্টো পথে গিয়ে।' জাতিক সত্তার অন্তর্গত প্রত্যেকের মধ্যে নিয়ত এই ক্রিয়া চলছে ব'লে একটা বৃহৎ সীমানার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসংঘ তৈরি হয়ে উঠছে। একটা বিশেষ জাতিক নামের ঐক্যে তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ আচরণ নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাশা করতে পারে। মানুষ জন্মায় জন্তু হয়ে, কিন্তু এই সংঘবন্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

এই-যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের

প্রেরয়িতা, তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত— প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হত কলের পুতুলের মতো; সেই-সব যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসরগতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান-প্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।

জ্যোতিষ্কনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র্য আছে; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে। আবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি— যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অনুভব করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি য়িহুদি পুরাণে বলেছে 'সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য'; যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ্‌দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন—

আমি রাজ্ঞী। আমার উপাসকদের আমি ধনসমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়। আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টিকর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি॥

মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমত, তাতেই

কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনি বহিয়া যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবনি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এই রকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ-যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে-হয়-যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্যে; সেই জন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে নানা কবি নানা রকম অত্যুক্তির চেষ্টা করে। সুযোগ নয় তো কী; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য। এই সুযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে; কেউ বা নিঃশব্দ বীণাধ্বনির সঙ্গে, অসংগতিকে আরও বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। লাবণ্যকে কবি যে লাবনি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ। এই জন্যেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই ব'লে এককে আর ক'রে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে সোনা। এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। এক দিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষাসীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূর-প্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্যথা ক'রেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে—একটা তার গরজের; আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকায় মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব

অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

সৃষ্টি বলতে বোঝায় সেই রচনা যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে। বিশ্বে যখন আমরা এমন-কিছুকে পাই যা রূপে রসে নিরতিশয়ভাবে তার সত্তাকে আমাদের চেতনার কাছে উজ্জ্বল করে তোলে, যাকে আমরা স্বীকার না করে থাকতে পারি নে, যার কাছ থেকে অন্য কোনো লাভ আমরা প্রত্যাশাই করি নে, আপন আনন্দের দ্বারা তাকেই আমরা আত্মপ্রকাশের চরম মূল্য দিই। ভাষায় মানুষের সব চেয়ে বড়ো সৃষ্টি সাহিত্য। এই সৃষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে যখন চরম ব'লেই মেনে নিই, তখন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ। সে যদি এমন-কিছু হয় সচরাচরের সঙ্গে যার মিল না থাকে, অথচ যাকে নিশ্চিত প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলি 'এই যে তুমি', তা হলে সেও সত্য হয়েই সাহিত্যে স্থান পায়, প্রাকৃত জগতে যেমন সত্যরূপে স্থান পেয়েছে পর্বত নদী। মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি তলব করতেই চাই নে—তাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছি এই যথেষ্ট। আমরা যখন নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরোই তখন সেখানে নিত্য অভ্যাসে আমাদের চৈতন্য মলিন হয় নি ব'লেই সেখানকার অতিসাধারণ দৃশ্য সম্বন্ধেও আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট থাকে; এই স্পষ্ট অনুভূতিতে যা দেখি তার সত্যতা উজ্জ্বল, তাই সে আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি সেই সাহিত্যকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসজ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার্য করে তোলে। এমনি করে ভাষার জিনিসকে মানুষের মনের কাছে সত্য করে তোলবার নৈপুণ্য যে কী, তা রচয়িতা স্বয়ং হয়তো বলতে পারেন না।

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতর পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। কেন হয় তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে। যে সত্য আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা-কিছু আমাদের সুখদুঃখ-বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধ'রে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারও প্রশস্ত, কারও সংকীর্ণ। কারও দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে, বিশ্বের ছোটোবড়ো অনেক-কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ-অণুবীক্ষণ-শক্তি। আবার কারও কারও জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি ক'রে আলো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাই মানুষের বাস্তববোধের বিশেষত্ব ও আয়তনেই যথার্থ তার পরিচয়। সে যদি কবি হয় তবে তার কাব্যে ধরা পড়ে তার মন এবং তার মনের দেখা বিশ্ব। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কবিদের

দৃষ্টিক্ষেত্রের আলো বদল হয়ে গেছে, এ কথা সকলেই জানে। প্রবল আঘাতে তাদের মানসিক পথযাত্রার রথ পূর্বকার বাঁধা লাইন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তার পর থেকে পথ চলেছে অন্য দিকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরোনো সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্র-শক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সব চেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা; বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি ব'লেই।

মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে, ধর্মকে অস্বীকার ক'রে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ— বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।

অপর দিকে আমাদের পুরাণ-কথাসাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদচরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যা গণনা ক'রে তাঁরা মানবসত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায়শক্তির কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সব চেয়ে বড়ো সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্য।

সাহিত্যের জগৎকে আমি বলছি বাস্তবের জগৎ, এই কথাটার তাৎপর্য আরও একটু ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। এ তর্ক প্রায় মাঝে মাঝে উঠেছে যে, প্রাকৃত জগতে যা অপ্রিয়, যা দুঃখজনক, যাকে আমরা বর্জন করতে ইচ্ছা করি, সাহিত্যে তাকে কেন আদর করে স্থান দেওয়া হয়, এমন-কি বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।

যা আমাদের মনে জোরে ছাপ দেয়, বাস্তবতার হিসাবে তারই প্রভাব আমাদের কাছে প্রবল। দুঃখের ধাক্কায় আমরা একটুও উদাসীন থাকতে পারি নে। এ কথা সত্য হলেও তর্ক উঠবে, দুঃখ যখন অপ্রিয় তখন সাহিত্যে তাকে উপভোগ্য বলে

স্বীকার করি কেন। এর সহজ উত্তর এই—দুঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যেই তার প্রমাণ। যা-কিছু আমরা বিশেষ করে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতে আনন্দ। চার দিকে আমাদের অনুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে তা হলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু; কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্ষীণতা তা হলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে করে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সব চেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে; কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেই জন্যে আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই ব'লেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি। গল্পে ভূতের ভয়ের অনুভূতিতে ছেলেরা পুলকিত হয়, কেননা তাদের মন এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা পায় বিনা দুঃখের মূল্যে। কাল্পনিক ভয়ের আঘাতে ভূত তাদের কাছে নিবিড়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে, আর এই বাস্তবের অনুভূতি ভয়ের যোগেই আনন্দজনক। যারা সাহসী তারা বিপদের সম্ভাবনাকে যেচে ডেকে আনে, ভয়ানকে আনন্দ আছে ব'লেই। তারা এভারেস্টের চূড়া লঙ্ঘন করতে যায় অকারণে। তাদের মনে ভয় নেই ব'লেই ভয়ের কারণ-সম্ভাবনায় তাদের নিবিড় আনন্দ। আমার মনে ভয় আছে, তাই আমি দুর্গম পর্বতে চড়তে যাই নে, কিন্তু দুর্গমযাত্রীদের বিবরণ ঘরে বসে পড়তে ভালোবাসি; কেননা তাতে বিপদের স্বাদ পাই অথচ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। যে ভ্রমণবৃত্তান্তে বিপদ যথেষ্ট ভীষণ নয় তা পড়তে তত ভালো লাগে না। বস্তুত প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতি-দ্বারা প্রবলরূপে আমরা আপনাকে জানি। সাহিত্য বহু বিচিত্রভাবে আমাদের আপনাকে জানার জগৎ, অথচ সে জগতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

সাহিত্যে মানুষের আত্মপরিচয়ের হাজার হাজার ঝরনা বয়ে চলেছে—কোনোটা পঙ্কিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা ক্ষীণ, কোনোটা পরিপূর্ণপ্রায়। কোনোটা মানুষের মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নবজাগরণের।

বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা-অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে: অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট। যেমন মন্থরা বা ভাঁড়ুদত্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যখন তার ছবি দেখি তখন হেসে কিংবা কোনো রকমে উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠি, 'ঠিক বটে!' এই রকম কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে নিশ্চিত স্বীকার করাতে আমাদের আনন্দ আছে। নিয়তই বহুলক্ষ পদার্থ এবং অসংখ্য ব্যাপার যা আমাদের জীবনমনের ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে তা প্রবলরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না। কিন্তু যা-কিছু স্বভাবত কিংবা বিশেষ কারণে আমাদের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত ক'রে আলোকিত করে, সেই-সব অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের মনের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, তারা বিচিত্রভাবে আমাদের স্বভাবকে পূর্ণ করে। মানুষের সাহিত্য মানুষের সেই সম্ভাবিত সম্ভবপর

অসংখ্য অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। জাভাতে দেখে এলুম আশ্চর্য নৃত্যকৌশলের সঙ্গে হনুমানে ইন্দ্রজিতে লড়াইয়ের নাট্যাভিনয়। এই দুই পৌরাণিক চরিত্র এমন অন্তরঙ্গভাবে তাদের অভিজ্ঞতার জিনিস হয়ে উঠেছে যে, চার দিকের অনেক পরিচিত মানুষের এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের চেয়ে এদের সত্তা এবং আচরণ তাদের কাছে প্রবলতররূপে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। এই সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নাচে গানে।

সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতার জগৎসৃষ্টি ক'রে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে মূর্তিমান ক'রে মেটাচ্ছে সে আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনায় চরিত্ররচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিণী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চৌতিয়ে তুলতে হয় নি, হয়েছে স্বভাবতই।

বাংলাভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটাশি

লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভাসমিতিতে ইস্কুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বৈকি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত, জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়ো দিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

* ১৩৪৫

ছন্দ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন : আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।— শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি।— সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠ পাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত— কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে, তা হলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু

হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না তাকেই বলে দুর্গতি।

মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয়, তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে দেখি নে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করে নি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখ-দুঃখ রাগ-বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালোবাসি'—এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে, যে সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য; সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।

* ১৩৪১

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল', তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়াগরজন,
রিম্‌ ঝিম্‌ শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও, বলা থামে না। এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমাণ করে রাখে।

অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাৎ এই যে, রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু, মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে? কারণ, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে—'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত নন্দিত হচ্ছে ততদিন 'আমি আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে, 'তুমি যেমন আছ আমিও তেমনি আছি।' 'আমি আছি' এই সত্যটি কেবলই প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি চলছি'র দ্বারা। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

* ১৩৪৫

ফরাসি মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উদ্‌ধৃত করি।

তিনি বলেন, আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র, এমন-কি প্রাচীন গ্রীস-রোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে, বিচারে, তাহার অবয়ববিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়। যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিতশাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচারব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্তম্ভগুলিতে ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেই সমস্ত সমাজকে এক ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

এইরূপ এক ভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্নরূপ ফললাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্য -বশত গ্রীস অতি আশ্চর্য দ্রুত বেগে এক অপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোনো জাতিই এত অল্প কালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড়ো আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রীক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল, আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না। অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল; তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিঁকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হইয়া গেল।

প্রাচীন সভ্যতা মাত্রেই একটা না একটা কিছুর একাধিপত্য ছিল। সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারি দিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত। এই ঐক্য, এই সরলতার ভাব সাহিত্যে এবং লোকসকলের বুদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত। এই কারণেই প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্র -গ্রন্থে, ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই একই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জ্ঞানে এবং কল্পনায়, তাহাদের জীবনযাত্রায় এবং অনুষ্ঠানে এই একই ছাঁদ। এমন-কি, গ্রীসেও জ্ঞানবুদ্ধির বিপুল ব্যাপ্তি সত্ত্বেও, তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আশ্চর্য একপ্রবণতা দেখা যায়।

য়ুরোপের আধুনিক সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভ্যতার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া যাও, দেখিবে— তাহা কী বিচিত্র জটিল এবং বিক্ষুব্ধ। ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকল রকম মূলতত্ত্বই বিরাজমান; লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি, পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়, সকল অবস্থাই বিজড়িত হইয়া দৃশ্যমান; স্বাধীনতা ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার সর্বপ্রকার ক্রমান্বয় ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই বিচিত্র শক্তি স্থির নাই, ইহারা আপনা-আপনির

মধ্যে কেবলই লড়িতেছে। অথচ ইহাদের কেহই আর-সকলকেই অভিভূত করিয়া সমাজকে একা অধিকার করিতে পারে না। একই কালে সমস্ত বিরোধী শক্তি পাশাপাশি কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহাদিগকে য়ুরোপীয় বলিয়া চিনিতে পারা যায়।

চারিত্রে মতে এবং ভাবেও এইরূপ বৈচিত্র্য এবং বিরোধ। তাহারা অহরহ পরস্পরকে লঙ্ঘন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, সীমাবদ্ধ করিতেছে, রূপান্তরিত করিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। এক দিকে স্বাতন্ত্র্যের দুরন্ত তৃষ্ণা, অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতাশক্তি; মনুষ্যে মনুষ্যে আশ্চর্য বিশ্বাসবন্ধন, অথচ সমস্ত শৃঙ্খলমোচন-পূর্বক বিশ্বের আর কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া একাকী নিজের স্বেচ্ছামতে চলিবার উদ্ধত বাসনা। সমাজ যেমন বিচিত্র মনও তেমনি বিচিত্র।

আবার সাহিত্যেও সেই বৈচিত্র্য। এই সাহিত্যে মানবমনের চেষ্টা বহুধা বিভক্ত, বিষয় বিবিধ, এবং গভীরতা দূরগামিনী। সেই জন্যই সাহিত্যের বাহ্য আকার ও আদর্শ প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় বিশুদ্ধ সরল ও সম্পূর্ণ নহে। সাহিত্যে ও শিল্পে ভাবের পরিস্ফুটতা সরলতা ও ঐক্য হইতেই রচনার সৌন্দর্য উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান য়ুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিসীম বহুলতায় রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অংশে প্রত্যংশেই আমরা এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহ ইহার অসুবিধাও আছে। ইহার কোনো একটা অংশকে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে, হয়তো প্রাচীন কালের তুলনায় খর্ব দেখিতে পাইব; কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে, ইহার ঐশ্বর্য আমাদের কাছে প্রতীয়মান হইবে। য়ুরোপীয় সভ্যতা পঞ্চদশ শতাব্দ-কাল টিঁকিয়া আছে এবং বরাবর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহা গ্রীক সভ্যতার ন্যায় তেমন দ্রুত বেগে চলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদে পদে নব নব অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখনো ইহা সম্মুখে ধাবমান। অন্যান্য সভ্যতায় এক ভাব, এক আদর্শের একাধিপত্যে অধীনতাবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু য়ুরোপে কোনো-এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায় এবং ঘাতপ্রতিঘাতে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখায়, য়ুরোপীয় সভ্যতায় স্বাধীনতার জন্ম হইয়াছে। ক্রমাগত বিবাদে এইসকল বিরোধী শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে; এই জন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিকূল পক্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল-প্রকৃতি, ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।

গিজো বলেন, বিশ্বজগতের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের সংগ্রাম। ইহা সুস্পষ্ট যে, কোনো একটি নিয়ম, কোনো এক প্রকারের গঠনতন্ত্র, কোনো একটি সরল ভাব, কোনো একটি বিশেষ শক্তি, সমস্ত বিশ্বকে একা অধিকার করিয়া, তাহাকে একটিমাত্র কঠিন ছাঁচে ফেলিয়া, সমস্ত বিরোধী প্রভাবকে দূর করিয়া, শাসন করিবার ক্ষমতা পায় নাই। বিশ্বে নানা শক্তি, নানা তত্ত্ব, নানা তন্ত্র জড়িত হইয়া যুদ্ধ করে; পরস্পরকে গঠিত করে; কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে না, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় না। অথচ এইসকল গঠন তত্ত্ব ও ভাবের বৈচিত্র্য, তাহাদের সংগ্রাম ও বেগ, একটি বিশেষ ঐক্য, একটি বিশেষ

আদর্শের অভিমুখে চলিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ইহা সংকীর্ণ রূপে সীমাবদ্ধ একরত ও অচল নহে। জগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজের বিশেষ মূর্তি বর্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিভক্ত বিপুল এবং বহুচেষ্টাগত। য়ুরোপীয় সভ্যতা এইরূপে চিরন্তন সত্যের পথ পাইয়াছে; তাহা জগদীশ্বরের কার্যপ্রণালীর ধারা গ্রহণ করিয়াছে; ঈশ্বর যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সভ্যতার শ্রেষ্ঠতাতত্ত্ব এই সত্যের উপরেই নির্ভর করে।

গিজোর মত আমরা উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, তিন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য বৃহদ্‌ব্যাপার, ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই। সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব? কোন্ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব? অন্য সকল সভ্যতাই এক দেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যত দিন ইন্ধন যোগাইয়াছে তত দিন তাহা জ্বলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে অথবা ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-হোমানলের সমিধ্‌কাষ্ঠ যোগাইবার ভার লইয়াছে নানা দেশ, নানা জাতি। অতএব এই যজ্ঞহুতাশন কি নিবিবে না ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে? কিন্তু, এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্তৃভাব আছে, কোনো সভ্যতাই আকারপ্রকারহীন হইতে পারে না। ইহার সমস্ত অবয়বকে চালনা করিতেছে এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাভবের উপরেই এই সভ্যতার উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে। তাহা কী? তাহার বহুবিচিত্র চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায়?

য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। ইংলন্‌ডে বলো, ফ্রান্সে বলো, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মতো হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

ইতিহাসে কোন্ গূঢ় নিয়মে দেশবিশেষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে তখন ধ্বংস অদূরবর্তী হয়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল : ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এক সময় আর্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণশূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম লইয়া পূর্বের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞানজড় শূদ্রসম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন, আবিষ্ট।

ইংরাজের আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল, যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইল, তখনি ব্রাহ্মণধর্মের মূর্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধ মূর্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই ব্রাহ্মণধর্মও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতা নিত্যধর্মকে নানা স্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে। স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে। ইহাও দেখিতেছি— য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, 'জোর যার মুলুক তার' এ নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না। ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি— যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়, এ কথা এক প্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসি ইংরাজ জর্মান রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চ স্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খৃস্টান মিশনারিদের মুখেও 'ভাই' কথার মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সুর লাগে না।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেইজন্য রাষ্ট্রীয়-মহত্ত্ব-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত

করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি; অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন, তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দুক ও দম্‌দম্‌ বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের দ্বারা যাহা পাইব তাহার দ্বারা আমরা কিছুই বড়ো হইব না।

পনেরো ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘ কাল নহে। নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ, এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে। এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানা প্রকার মিথ্যা চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষণীয় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নহে? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই কি বলে না?—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতো বধীৎ॥

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল-আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে।

কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।

* জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

নববর্ষ

বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত

অধুনা আমাদের কাছে কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হউক, দূরে হউক, দিনে হউক, দিনের অবসানে হউক, কর্ম করিতে হইবে। কী করি, কী করি, কোথায় মরিতে হইবে, কোথায় আত্মবিসর্জন করিতে হইবে, ইহাই অশান্তচিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হউক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া, মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জাতিকে পাইয়া বসে তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন, দুর্গম হিমালয়শিখরে যে লোমশ ছাগ এত কাল নিরুদ্‌বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকস্মাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বস্ত-চিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন পক্ষী এত কাল জনশূন্য তুষারমরুর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল, অকলঙ্ক শুভ্র নীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে, এবং আফ্রিকার নিভৃত অরণ্য-সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

এখানে আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই দেখি সে অক্লিষ্ট, অক্লান্ত; যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসনগ্রহণ করিয়াছে। এই নিখিল-গৃহিণীর রান্নাঘর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন্‌ ভাণ্ডারের স্তরে স্তরে ইঁহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে? ইঁহার দক্ষিণ হস্তের হাতা-বেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়, ইঁহার কাজকে লীলার মতো মনে হয়, ইঁহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে ঔদাসীন্যের মতো জ্ঞান হয়। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া স্থিতিকেই গতির ঊর্ধ্বে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে; ঊর্ধ্বশ্বাস কর্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই কর্মের চতুর্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুব শান্তির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া

রাখা—প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে, ইহাই তাহার বল। ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি; এই বিশাল স্তব্ধতা, আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়, তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্ন-বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী অতি সহজসরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বরমাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত; সৈনিক সিপাহি অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত; আচাররক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজ-রক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন করা, তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েক জন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদার্ঢ্যিষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে; ইংরাজি কোর্তা, ইংরাজের দোকানের আসবাব, ইংরাজি মাস্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল, কোথাও থাকিবে না—কোনো কাজেই লাগিবে না। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজিস্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ; তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র-

বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দারুণসহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী; তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর, আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর আস্ফালন করতালি মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত পাশ্চিমসমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি— তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে; তখন দেখিব ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে; যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব; যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব; এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর-একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

সকল দেশেই এক জন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব বেশভূষায় আসিয়া উপস্থিত হইলে স্থানীয় লোকের কৌতূহল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে— তাহাকে ঘিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া, বিব্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহার দ্বারা আহত হয় না এবং তাহাকে আঘাত করে না। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান হিয়োন্‌থ্‌সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, য়ুরোপে কখনো সেরূপ পারিতেন না। ধর্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃশ্যমান নহে— যেখানে ভাষা আকৃতি বেশভূষা সমস্তই স্বতন্ত্র, সেখানে কৌতূহলের নিষ্ঠুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষীয় একাকী, আত্মসমাহিত; সে নিজের চারি দিকে একটি চিরস্থায়ী নির্জনতা বহন করিয়া চলে, সেইজন্য কেহ তাহার একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। যাহারা সর্বদাই ভিড় করিয়া, দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নূতন লোকের চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে এক পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে সেখানে কোনো বাধা রচনা করে না; তাহার স্থানের

টানাটানি নাই, তাহার একাকিত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক হউক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারি দিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়; আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোনো কথা বলে না।

এই একাকিত্বের মহত্ত্ব যাহার চিত্ত আকর্ষণ করে না সে ভারতবর্ষকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে না। বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্মত্ত বরাহের ন্যায় ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দন্ত-দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল; তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্ব-দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল; কেহই তাহার মর্মস্থানে আঘাত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরোধ না করিয়াও নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে জানে; সেজন্য এ পর্যন্ত অস্ত্রধারী প্রহরীর প্রয়োজন হয় নাই। কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত, সর্বপ্রকার বিরোধবিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে: তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।

য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ আরামসুখ নিজের; কিন্তু তাহার দানধ্যান স্কুলকলেজ ধর্মচর্চা বাণিজ্যব্যবসায় সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে; আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার।

এই ভাবটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা করা কিছু নহে; করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, হইবেও না। এমন-কি, বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটো ছোটো সামর্থ্য-গুলিকে বলপূর্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তন্তুবায় যে মরিয়াছে সে একত্র হইবার ত্রুটিতে নহে, তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভালো হয় এবং প্রত্যেক তন্তুবায় যদি কাজ করে, অন্ন করিয়া খায়, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের ও ঈর্ষার বিষ জমিতে পায় না এবং ম্যাঞ্চেস্টার তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমোদ বলো, শিক্ষা বলো, হিতকর্ম বলো, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে, কাজেই সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়। তাহাতে কর্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে, মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতি-যোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই, তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে, মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে

বড়ো দল ছোটো দলকে পিষিয়া ফেলে, বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মতো চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই-সকল কৃষ্ণ-ধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলোর ভিতরে, বাহিরে, চারি দিকে, মানুষগুলাকে যে ভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া, প্রমোদে মাতিয়া, বলপূর্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারও থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ খেলা নৃত্য ঘোড়দৌড় শিকার ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্ক-পত্রের মতো দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যদি এক মুহূর্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায় তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলনলাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

ভারতবর্ষ ভোগের নিবিড়তাকে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লঘু করিয়া দিয়াছে, এবং কর্মের জটিলতাকেও সরল করিয়া আনিয়া মানুষে মানুষে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ভোগে কর্মে এবং ধ্যানে প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্বচর্চার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ব্যবসায়ী সেও মন দিয়া কথকতা শোনে, ক্রিয়াকর্ম করে; শিল্পী সেও নিশ্চিন্তমনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়ে। এই অবকাশের বিস্তারে গৃহকে মনকে সমাজকে কলুষের ঘনবাষ্প হইতে অনেকটা পরিমাণে নির্মল করিয়া রাখে, দূষিত বায়ুকে বদ্ধ করিয়া রাখে না, এবং মলিনতার আবর্জনাকে একেবারে গায়ের পাশেই জমিতে দেয় না। পরস্পরের কাড়াকাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষিতে যে রিপুর দাবানল জ্বলিয়া উঠে, ভারতবর্ষে তাহা প্রশমিত থাকে।

ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশিসবর্ষণে ও কল্যাণশস্যে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার, টাকা জুটাইবার ও সংকল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়া যে যেখানে, আপনার গ্রামে প্রান্তরে পল্লীতে গৃহে, স্থিরশান্তচিত্তে, ধৈর্যের সহিত, সন্তোষের সহিত, পুণ্যকর্ম মঙ্গলকর্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি— আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটীরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া, সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই— ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি— চাতক পক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া না থাকি— তবে ভারত-বর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব। বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি,

বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি আমরা যদি আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি, তবে মুহূর্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ ছোটো বড়ো, স্ত্রী পুরুষ, সকলকেই মর্যাদা দান করিয়াছে। এবং সে মর্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈতৃক কর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম যাহার পক্ষে সুলভতম, তাহা পালনেই তাহার গৌরব; তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্যাদা। এই মর্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে; বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্যাদা অনুভব করে তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্রমজীবী প্রাণপণে কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্যাদার আবরণ দেয় না। সে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থই হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে য়ুরোপের পনেরো-আনা লোক দীনতায়, ঈর্ষায়, ব্যর্থ প্রয়াসে অস্থির। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে; ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্দি দাদা আছে। গণ্ডীটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে; বড়োদের অনাত্মীয়তার ভার ছোটোদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোটোবড়োর অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্বত্রই সকল প্রকার ছোটোর সংখ্যাই অধিক ও বড়োর সংখ্যাই স্বল্প হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

য়ুরোপে এই অমর্যাদার প্রভাব এত দূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সেখানে এক দল আধুনিক স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক হইয়াছে বলিয়াই লজ্জাবোধ করে। গর্ভধারণ করা, স্বামীসন্তানের সেবা করা, তাহারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে। মানুষ বড়ো, কর্মবিশেষ বড়ো নহে; মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া যে কর্মই করা যায় তাহাতে অপমান নাই; দারিদ্র্য লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে; সকল কর্মে সকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলিয়া রাখা যায়—এ ভাব য়ুরোপে স্থান পায় না। সেই জন্য সক্ষম অক্ষম সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সমাজে প্রভূত নিষ্ফলতা, অন্তহীন বৃথা কর্ম ও আত্মঘাতী উদ্যমের সৃষ্টি করিতে থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনা বাটা, আত্মীয়-অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, ইহা য়ুরোপের চক্ষে অত্যাচার ও অপমান, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার; ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান। বিলাতে এইসমস্ত কাজে যাহারা প্রত্যহ রত থাকে, শুনিতে পাই, তাহারা ইতরভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হয়। কারণ, কাজকে ছোটো জানিয়া তাহা করিতে বাধ্য হইলে, মানুষ নিজে ছোটো হয়। আমাদের লক্ষ্মীগণ

যতই সেবার কর্মে ব্রতী হন, তুচ্ছ কর্মসকলকে পুণ্যকর্ম বলিয়া সম্পন্ন করেন, অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, ততই তাঁহারা শ্রীসৌন্দর্যে পবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া উঠেন; তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতুর্দিক হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া পলায়ন করে।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতিসত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভালো। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পরে আর-কোনো অগৌরব নাই। রামের বাড়িতে শ্যামের কোনো অধিকার নাই, এ কথা স্থিরনিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়িতে কর্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু শ্যামের যদি এমন পাগলামি মাথায় জোটে যে সে মনে করে, রামের বাড়িতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত, এবং সেই বৃথা চেষ্টায় সে বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্যাদা ও শান্তি লাভ করে বলিয়াই, ছোটো সুযোগ পাইলেই বড়োকে খেদাইয়া যায় না, এবং বড়োও ছোটোকে সর্বদা সর্বপ্রযত্নে খেদাইয়া রাখে না।

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্ধাবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সংগত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই এ কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে যদি কাজে শৈথিল্য আনে ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরি-ভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য— সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ সংযম শান্তি ক্ষমা এসমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অংগ। ইহাতে প্রতিযোগিতা-চক্‌মকির ঠোকাঠুকি-শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুব জ্যোতির চেয়ে মূল্যবান মনে করা বর্বরতামাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্বরতা প্রসূত হয় তবু তাহা বর্বরতা।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার

জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই-যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম্' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর; তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এই জন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে; তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে; তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় 'ফ্রীডম্' কোনো কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না; কারণ, আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীন ছিল। এখনো আধুনিক কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই 'ফ্রীডম্' আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। নাই হইল— এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র পরিয়াছেন এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে; যে ঋষিকবিরা ত্রিষ্টুভ্-ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীতহরিৎ বসন-খানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন, উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহু সহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার-করা ফুলে পাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচিরপ্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল নবসৌন্দর্য আমরা যদি অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই, তবে দুই দণ্ড বাদেই তাহা কদর্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্পপত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধনরজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জীব ও নিষ্ফল হয়— কারণ তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই; তাহা অসংলগ্ন, অসংগত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব; সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না; তখন সেই অম্লানগৌরব মাল্যখানি

আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবল-হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে। আমরা, যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী-সমানা। তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, 'পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।'

তিনি কহিবেন, 'ওঁ ইতি ব্রহ্ম।'

তিনি কহিবেন, 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।'

তিনি কহিবেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।'

[১ বৈশাখ ১৩০৯]

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানা-টানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান মোগল পর্তুগিজ ফরাসি ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায় এসকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না; সে দিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর-সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেই জন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই; ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম

হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি, বহু শত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুক-বর্গই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না, ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জা-বোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশন-বসন আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

যেসকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড্ কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্গার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণি-ভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে, এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্র-লোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরীরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এসমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে; সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু,

তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যেসকল চাতুরী প্রবঞ্চনা হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্চের মতো ইংরাজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরও ক্ষুদ্র; বস্তুত শতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো-আনাই সাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষা সমস্তই একটি বৃহৎ হোয়াইট্যাওয়ে-লেড্‌লের দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি, আর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এই কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরানিশালার এক কোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে সে খৃস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্স্‌ নাই সেখানে আবার হিস্‌ট্রি কিসের', তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।

যিশুখৃস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি। ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয় দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়াছে; সেও নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কী করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কী করিব তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়। ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া, ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বলো, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বলো, ফরাসি বলো, কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; তাহা দেহস্থিত প্রাণের

ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে; আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না; তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র-উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া?

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যেসকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন-মূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল—যাহাতে কোনো পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না; সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বাণিজ্যের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে; এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এইসকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনোমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেণ্ট্ কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই বিরোধশস্যেরই প্রাণবান বলবান বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত

করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা এক দিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসিবিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে এমন স্পর্ধা করিয়াছিল; কিন্তু ফল উল্টা হইয়াছে, য়ুরোপে রাজশক্তি প্রজাশক্তি ধনশক্তি জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল; নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তি-লাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়; পশুযুদ্ধভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়—আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিয়ুজিলান্‌ড্ কেপ্‌কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই; তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার মতো হইয়াছে। এরূপ স্থলে বাহিরের লোককে সে সমাজ নিজের কোন্‌খানে আশ্রয় দিবে? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া—এই

দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ, ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম; তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতিসুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

* ভাদ্র ১৩০৯

6. Monday. *Bengali*—21 Pous, 1314; *Tritiya*.

Fuslee—13 Poos. *Sambat*—3 Poos Sudi. *Hijree*—1 Zilhijah. *Uriya*—22 Pous.
Tamil—22 Margali-Chapam. *Telugu*—3 Pushya S. *Burmese*—3 Pyatho (Lazan).

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫ শান্তিনিকেতন বোলপুর

ঈশ্বরকে যে আমরা দিনরাত্রি বাদ দিয়ে চলেছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি কিছু পরিমাণেও হত তাহলে এখনি সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই, সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। এই সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কি কিছু অভাব হচ্ছে! হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে বিশ্বাসে থাকি এবং সকল সংসারের বাইরে মনে মনে ভাবি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু অভাবটা কি হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালক বয়সে মাতৃহীন। আমার বড় বয়সের জীবনে মার আবির্ভাব ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়েছি, গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন — তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময় চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম বারান্দায় গিয়ে মুহূর্তে আমার হঠাৎ কি হল জানিনে — আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন "তুমি এসেছ?"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম — মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি — তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কি হচ্ছে? তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেশন করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল এইটুকু হচ্ছে যে, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, তুমি এলে! অন্ন বস্ত্র ধনজন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং তাকে যখন না পায়, কেবল উপকরণের ভার ঘরে ঘরে পুঞ্জিত হয়, তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

অভাব। পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

অভাব

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হ'ত তা হলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হচ্ছে! হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি— আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু, ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগান-বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন— তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে— আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে, মা আছেন! তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন : তুমি এসেছ!

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম— মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি— তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই, কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে! তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেশন করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ওইটুকু হচ্ছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না 'তুমি এসেছ'। অন্নজল ধনজন সমস্তই আছে, কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণ-ভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায়, তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জগতে কোনো জিনিসের কাছে, কোনো মানুষের কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ আনাগোনা করি বটে, কিন্তু দৈবাৎ এক মুহূর্তে তার কাছে গিয়ে পৌঁছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল-সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেয়ে কেবল এক দিনের কথা মনে পড়ে যে দিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে, খেলছে, গল্পগুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনাপাওনা আনাগোনা

চলছে, তারা ভাবছে : এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

২৪? অগ্রহায়ণ ১৩১৫

আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম, দেখা বুঝি এই রকমই— সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোনো সঙ্গীর চশমা নিয়ে চোখে প'রেই দেখি, সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তখন মনে হল, আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি; সমস্তকে এই-যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলুম— অথচ এতদিন যে আমি এত লোকশান বহন করে বেড়াচ্ছি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে 'তুমি এসেছ'। এই-যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য, আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিন্তু আমাদের হাত ধরছে না— আনন্দিত হয়ে বলছে না 'তুমি এসেছ'। যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়ো। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম, কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলছে না 'তুমি এসেছ'! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না, এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম— জীব-চৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে, তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা, কী অনির্বচনীয় আনন্দ, তা আমরা জানি নে, কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাই নে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ, তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে, এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের

সত্তার দ্বারাই অনুভব করি—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে ব'লে, একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই ব'লে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই; এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখি নে—ইন্দ্রিয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে, সংসার দিয়ে, সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ বা প্রয়োজনের মানুষ বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণী-ভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়, সেইখানেই দরজা রুদ্ধ, তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত : তুমি এসেছ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে : তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি। ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন ॥ এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বদাই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে। সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে, সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়--অমৃতং যদ্‌বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান, সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না—সে আর-সমস্তই দেখে, কেবল আনন্দরূপমৃতং দেখে না।

এই-যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতনভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

২৪? অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রার্থনা

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিন্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নীদুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণ-বন্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন এক মুহূর্তে বলে উঠলেন : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্! যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব! এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেক লাভ করে এ কথা বলেন নি। তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টি-পাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'আমি যা চাই এ তো তা নয়।'

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই; স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এ-সবে আমার কোনো ফল হবে না। সে মনে করছে, হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও, 'সব পেলুম' ব'লে তার মন মানছে না। সে ভাবছে, হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরো'র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয়, এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে। একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার

মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ওই-যে বলেছিলেন 'আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব', তার মানেটা কী? অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্ত কাল বহন করে চলা? অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এ কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কিভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন?

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর-একটাতে চলেছি, কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায়, আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি, তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই-যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই। অথচ আমার মন এমন-কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না, যেটা পেলে সে বলতে পারে 'এ ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে', যাকে পেলে আর ছাড়াছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তা হলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি 'এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই'!

সেই জন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত বিষয়সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, এ-সব নিয়ে আমি কী করব? আমি যে অমৃতকে চাই।

আচ্ছা বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তা হলে অমৃত কী! আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি তা নয়। যদি না পেতুম তা হলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার কারণ, ক্ষণে ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই-যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

এই-যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে! সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার ক'রে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে! ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাই নে, আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না!

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনও শোনা গিয়েছে?

সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কণ্ঠে চিরন্তন কালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এই কথাটি সবেগে ব'লেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন?—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।—হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে! হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে! হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও, তা হলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। হে রুদ্র, হে ভয়ানক, তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্, তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো, সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্রচরণদুটি আজ স্থাপন করো। তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

৩ পৌষ ১৩১৫

দেখা

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনছে; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র তাদের বলছে, 'তোমরা আজ জানো না, কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে

দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে।' এই আলোকের দূতীটি শস্যক্ষেত্রের উপ'র তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, 'তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারি দিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয়, একদিন তোমাদের জীবনের মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।' যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আসছে, যে ফসল ধরে নি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের ক্ষেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই? আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে, 'দেখো।' বাস্— 'একবার চেয়ে দেখো।' আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনও ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনও হয় নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখি নি।

কিন্তু, তবু রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে, 'দেখো।' সেই-যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু, এ কথা মনে কোরো না আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে কোরো না আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা, ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে; আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু, শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না— দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কী অদ্ভুত জিনিস! তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি!

এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা— তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্রসূর্য-খচিত প্রাণে-সৌন্দর্যে-পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারি দিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চার দিকে পৃথিবী ঘুরছে, নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল— এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এত বড়ো জগতের সামনে আমাদের

এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে?

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে, কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে—তা হোক। কিন্তু, আমি যে বলছি চোখে দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে, আমাদের চার দিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশনবসনের ভাবনা নিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে, তার সীমা নেই—সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই-সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্‌মুক্ত ভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, 'তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যেরকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো।' কাকে দেখবে? তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না, তাঁকে না—যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারি দিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই-যে চারি দিকে আমার যে-কেউ আছে, যা-কিছু আছে, এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি।

৪ পৌষ ১৩১৫

ভাঙা হাট

মানুষের মনটা কেবলই যেমন বলছে 'চাই চাই চাই'—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর-একটি কথা বলছে, 'চাই নে, চাই নে, চাই নে।' এইমাত্র বলে 'না হলে নয়', পরক্ষণেই বলে 'কোনো দরকার নেই'।

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল 'গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই' তখন এমনি হয়েছিল যে না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে

ওই একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনোমতে একটা চুলো বানিয়ে, শুকনো পাতা জ্বালিয়ে, যা হোক কিছু-একটা রেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর-সমস্ত ব্যাপারই ছোটো হয়ে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুটো পাতালতা সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুনতে পাচ্ছি, 'ওরে, গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত্‌ রে।' যেতে হবে, এবার গ্রামে যেতে হবে। এই চলে যাওয়ার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়ো। কাল রাত্রি-বেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আজ আবর্জনা হয়ে পড়ে রইল; কাল যাকে বলেছিল বড়ো দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর-এক যুগে যাবার আয়োজন করছে। যখন নূতন প্রভাত উঠছে, যখন রাত ভোর হবে হবে করছে, তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকছে, 'ওরে, চল্‌ রে! ওরে, গোরু কোথায় রে? ওরে গাড়ি কোথায়?' তখন ওই রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, তার ছাইগুলো জমে উঠছে। ভাঙা হাঁড়ি-সরা-শালপাতায় মাঠ বিকীর্ণ। আশ্রয়গৃহগুলি আশ্রিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও লজ্জিত হয়ে আছে। সমস্তই রইল—পূর্ব-আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, এবারে যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আর-এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে এইবারকার এই প্রয়োজনগুলিই চরম, আর-কোনোদিন ভোরের বেলায় গাড়িতে গোরু জুততে হবে না। এই ব'লে আবার কাঠকুটো-ডালপালা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু, তখনও এই অত্যন্ত একান্ত প্রয়োজনের দূর সম্মুখ দিগন্ত থেকে করুণ ভৈরবীসুরে বাণী আসছে, 'প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই।'

যদি এই সুরটুকু না থাকত, যদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়োজন বাস না করত, তা হলে কি আমরা বাঁচতে পারতুম? প্রয়োজন যদি সত্যই একান্ত হত তা হলে তার ভয়ংকর চাপ কে সহ্য করতে পারত? অত্যন্ত অপ্রয়োজনের দিন ও রাত্রি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে ব'লেই আমরা দরকারের অতি প্রবল মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেও চলাফেরা করে বেড়াতে পারছি। সেই জন্যেই ভোরের আলো দেখা দেবামাত্রই রাশীকৃত বোঝা যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে আমরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারছি। 'কিছুই থাকে না' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছি, তেমনি 'কিছুই নড়ে না' বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাকছেও বটে, যাচ্ছেও বটে—এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি আশ্রয়ও পেয়েছি—আমাদের ঘরও জুটেছে আলোবাতাসও মারা যায় নি।

৮ পৌষ ১৩১৫

সৌন্দর্য

ঈশ্বর 'সত্যং'। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং, অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন, তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং'। তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোথায়?

আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই—সেদিন স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিথিল করি—তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এই জন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয় এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার, কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বদ্ধ করছে, কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।

অতএব দেখতে পাচ্ছি জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর-কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে 'ছাই তোমার সৌন্দর্য', মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব, জগতে ঈশ্বরের এই-যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্যের আয়োজন এ আমাদের কাছে কোনো মাশুল কোনো খাজনা আদায় করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়—বলে, 'আমাতে তোমাতে আনন্দ হোক, তুমি স্বত আমাকে গ্রহণ করো।'

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তা হলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম। কিন্তু, তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না—সেই জন্যে পাপ-ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না—শাসনের দায় নেই ব'লেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছার সঙ্গে স্বীকার না করে, তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছোয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জ্বেলে তোল্। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়-ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে, তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে আমি 'আমি' হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য এক মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

১৯ পৌষ ১৩১৫

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই; তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ওই-সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এই রকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেই জন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওই রকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ; তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম ব'লে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে, বাড়তে বাড়তে, মরতে মরতে, বাঁচতে বাঁচতে, আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া; হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া—সে তো লাভ নয়, সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে, 'বল কী! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে!'

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু, 'আমি ব্রহ্মকে পাব' এত বড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মতে আমাতে তফাত নেই? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি—আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে, 'আমি সমুদ্র হব।' সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত, চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত ক্ষেত, কত শহর, কত গ্রাম, কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে, পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই-সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে, কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহাগহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে 'হাঁ, সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি', তাকে উত্তর দেব—'ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে, কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলাটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা, সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে, সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।'

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর-কিছুই হতে পারি নে। আর-কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু, তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতি মুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটিকে আমরা যেন সিদ্ধি ব'লে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকু-মাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন

জমছে না বলে খুঁৎখুঁৎ কোরো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত ক'রে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা কোরো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উল্টো দিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তা হলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তা হলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে—ব্রহ্মাই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাখ ১৩১৬

তপোবন

ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল; ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি। এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (Energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি, এই জন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেই জন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন; যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশ সমিৎ জুগিয়েছে; তাঁদের প্রতি দিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য ব'লে, নির্জীব ব'লে, পৃথক ব'লে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন; সেই জন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্যেই নিখিল-চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে— বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্রাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে; দেশবিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদান-প্রদান চলেছে; অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জা-বোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপুরুষ ব'লে জেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির

সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি; তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার দিকে ভিড় করে এসেছে; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদ-গর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে। কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনি উদ্ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশ সমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো, তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন, পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে। তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে-একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটীরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্য-কুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের

বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যেসকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই—প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই-যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই-যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র—এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না; সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডীর মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। সেক্‌স্‌পিয়রের দুই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়; কিন্তু সেই-সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত। তার চার দিকে আর-কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধ বর্ণ-বিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা ক'রে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই জন্যে সেই-সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাঁচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে; কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে, কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্তপ্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলন-চাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

অকালবসন্তসমাগমে বনস্থলীতে যখন অশোকের গাছে গুঁড়ি থেকে একেবারে পল্লব পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফুল ফুটে উঠল, সহকারের শাখা নতুন কিশলয়ে ছেয়ে গেল, তখন মধুকর তার প্রিয়ার সঙ্গে এক পুষ্পপাত্রে মধুপান করতে বসে গেল;

কৃষ্ণসার হরিণ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীর গায়ে শিঙ দিয়ে কণ্ডূয়ন করে দিতে লাগল; তখন হস্তিনী পদ্মরেণুগন্ধি গণ্ডূষজল হস্তীকে পান করিয়ে দিলে এবং চক্রবাক আধখানা মৃণাল নিজে খেয়ে বাকি আধখানা চক্রবাকীকে খাইয়ে দিতে লাগল। এমনি ক'রে, কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যানির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি, যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা-পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয়, তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা, প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এই রকম এক দিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্যকারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন। রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত। তিনি ভূমিকায় বলেছেন : সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম গিয়েছিল; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথা-

পরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহ-ত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বোঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়? তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায়, কঠোর সংযমে, তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর, নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম-আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী! সে কালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর এ কালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায়, কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়। অর্থাৎ, ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। কোনো-একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ। এই জন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে : ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অনুশাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই জন্যেই তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়। এই জন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্ব-জনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন

স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়। তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই-যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল, এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে-একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখ-দুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন—এই তপোবনটি দুষ্যন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান ক'রে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধ'রে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্তলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই যেমন-হওয়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়ে-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর যেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় ক'রে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী, হেমকূটও তেমনি তপস্বী; সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ; অতএব, কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন; তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেন নি; এই-সমস্ত নদী-গিরি-অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল; এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি, তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন। প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি—

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস ক'রে, একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্‌ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম 'শরণ্যং সর্বভূতানাম্'। ইহা ব্রাহ্মী লক্ষ্মী-দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারি দিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল, কোথাও বা রমণীয় বনে কোথাও বা পবিত্র তপোবনে। রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগপক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন; এই জন্য সীতা-হরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়, সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল,

সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘন শ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

মিল্‌টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে, অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে, এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

> Beast, bird, insect, or worm, durst enter none
> such was their awe of Man ... ...

অর্থাৎ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই-যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে—এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই, ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন। মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা-প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না; মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয়; সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে'; তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গ'লে যাচ্ছে।'

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহদুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়-প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নদনদী-অরণ্য-নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি

সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্যই প্রভু-শাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই। মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে; এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এই জন্যেই দেখতে পাই, যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান; মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয়-সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র; কৈলাস পবিত্র, মানসসরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র; গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্যনিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্য-নিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি; তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ ক'রে সত্য ক'রে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায়, এই জন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে; যে লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহৎসিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে, আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়; তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না। কারণ, এই-সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা; তার মধ্যেও চিত্তের উদ্‌বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্যমাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ

করেছে, পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে। ভারতবর্ষ এই-যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রতসাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়; তার একমাত্র উদ্দেশ্য— জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে-স্থলে-আকাশে গুহায়-গহ্বরে দেশে-বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে। এই যোগভ্রষ্টতা এই বোধ-শক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল; সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে, আর এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে ব'লেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে ব'লে বড়ো এবং দূরে আছে ব'লে ছোটো, যা বাইরে আছে ব'লেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে ব'লেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক— তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়। বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি; সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় ব'লে নয়, আমাদের কামনা আছে ব'লেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি; সে জিনিসটা সত্যই বড়ো ব'লে নয়, আমাদের লোভ আছে ব'লেই।

এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া

আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়। যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন—এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞান-বিহীনের দুরাশা মাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেই জন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে, টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য ব'লে হেসে উড়িয়ে দেয় নি; তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল। অতএব, প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ ব'লে পুজো করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ :এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

বহুপ্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্যপিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয় দল ঠিক তেমনি করেই নূতন-আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু, এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে,

কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি-দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে নি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগরনগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই নগরস্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর, তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে ব'লেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই ক'রে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি ক'রে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা। ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ এই মনে ক'রে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত ক'রে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবর্দস্তি-দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদল-বদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও

কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক ক'রে নেবে ব'লে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি— একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা. কেবল মতবাদ-রূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় ব'লেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে: এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না. এই জন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল. যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না. আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে. যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী. শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

* পৌষ ১৩১৬

রোগীর নববর্ষ

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেক দিন দেখি নাই। একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড়ো মহৎ ঘটনাই ঘটুক-না, নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিতমত যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল

হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে, সেই মুহূর্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণাসভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়োই হোক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্তের বর্তমান তাহার চেয়ে ছোটো নয়। এই জন্য এই-সমস্ত ছোটো ছোটো নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারী এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে; এই জন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা— যুগ-যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দার স্থূলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে— পৃথিবীর নীচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি রুগ্ণ শরীরের দুর্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আলগা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারি দিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্নই হইবে না, এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটে না— অবসরটাকে যেন অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যের যে অন্ত নাই, জগৎ-সংসারের দাবির যে বিরাম নাই; এই জন্য যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্ত মন কাজের দিকে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অন্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায়, যাহা না থাকিলে সকল জিনিসকে যথা-পরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা খানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই, তাহার ছোটো বড়ো নানা আকৃতি আয়তন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত— তাহা হইলে ছোটোও যা বড়োও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন।

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিস হোক, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড়ো হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

এমন সময় শরীর যখন বাঁকিয়া বসিল, বলিল 'আমি কোনোমতেই কাজ করিব না', তখন দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলগা হইয়া আসিল— মনের চারি দিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া

বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ এ কথাটা যত সত্য, তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। সেই বড়ো সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়, বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে, সমস্ত রূপ রস গন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে 'তোমারই মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি'।

আমার কর্মক্ষেত্রকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাই না, কিন্তু আমার রোগ-শয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান। সেইখানে সেই অপরিসীম অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল—মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর সুনীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝখানে জীবনের পদ্মটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই তো আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই তো আমার খোলা জানালা পার হইয়া বিশ্বআকাশের অতিথিরা এমন অসংকোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ওই অন্তরীক্ষে কী সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ওই তার পায়ের নীচে আঁচল বিছাইয়া কী নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এত কাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি; যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্বণ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু সেও তো ওই বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ওই-যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল, ভিতর-বাড়িতে একি দেখা যায়! সেখানে আলোয় তো চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া তো দাঁড়ায় নাই! সেখানে মণি নাই, মানিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে তো মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধুলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে; তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজ-আস্তরণ তো কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবক-যুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে, কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া তো কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্ম-শালার বহু-কালিমা-চিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানি ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে, কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে, এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন। ইহাই আশ্চর্য—পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে, এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোকলোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ

খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়—সে জন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছে না। সবাই বলিতেছে, 'তোমার ওইটুকু খেলা, ওইটুকু হাসি-কান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পারো ততটুকুই সে তোমারই—যতদূর পর্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুর ধন—যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পারো সে তোমারই মনের সম্পত্তি।' তাই এত বড়ো জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীন ভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরও ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই তো প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারি না, কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড়ো নিভৃতে ওই একটি প্রেম আছে—চারি দিকে সূর্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ওই প্রেম। চারি দিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারই মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ওই প্রেম। ওই প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে, সে বড়ো। ওই প্রেমের টানে বড়োও যে, সে ছোটো। ওই প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ওই প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখ গুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! হাঁ, সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই তো এতবড়ো জগতের মাঝখানেও এত ছোটোকে বড়ো করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটোকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জন্যই তো ছোটোকে তাহার এতই দরকার। নইলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কী করিয়া? ছোটোর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেই জন্যই এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে, এই পুষ্প-বিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্রবেলায় ছোটোর কাছে বড়ো আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোটো হইয়াও ছোটো নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিলপরিমাণ দেশকে ও পলপরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্‌ভাসিত করা তাহার স্বভাব—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখে দুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক

আসিল। যে দিকে প্রয়াস, যে দিকে যুদ্ধ, সেই সংসার তো আছেই— কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে? সেইখানেই কি চরম দেনা-পাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই, কেবল আনন্দ আছে— কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়— সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলই আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই— অমৃতহস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন— হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্— আজ নববর্ষের পাখি সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম— আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণপত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

[বৈশাখ ১৩১৯]

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ওই তারাগুলির মধ্যে যে-খুশি সেই আপন শাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক-মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না, পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ সাবেক কালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ, ও দিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার ক'রেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা, স্বপ্ন দেখুক।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ ব'লেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ ব'লেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা!

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পারো, তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উল্টো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা তো মানো না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়ো। তখনো বলো, কাছে আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে, কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এইজন্যই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহংকার। কেননা, আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে, অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই করো তবে কোন্ মুখে বলবে তারাগুলো ছুটোছুটি ক'রে মরছে? মধ্যাহ্নসূর্যকে চোখে দেখতে গেলে কালো কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় দুর্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখব ব'লেই পৃথিবী এই কালো রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কী দেখি? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে, আমাদের হাউই তুবড়ি তারাবাজি-গুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আসতে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির। তখন তারা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলমল করে গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ভাষা নিতান্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দু-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নীচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কী-সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর-এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে, সেই-সমস্ত অ্যাপ্রুভার্-দেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই-সমস্ত অ্যাপ্রুভাররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের
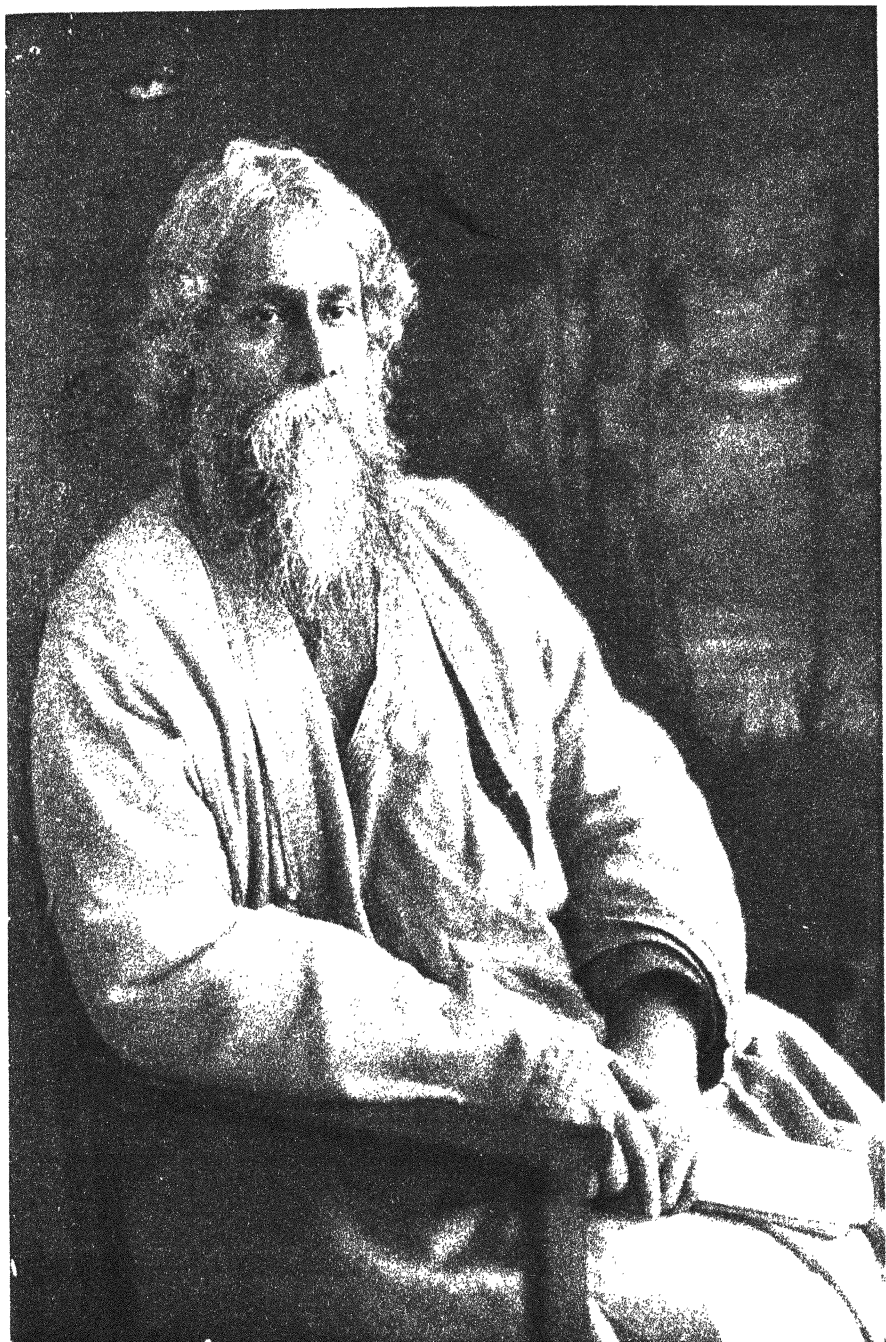
রবীন্দ্রনাথ। ইলিনয়। ১৯১৬

জোর বড়ো বেশি। সমস্ত পৃথিবী বলছে 'আমি গোলাকার', কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে 'আমি সমতল'। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে, কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত-কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক, কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন : তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে—এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি, নইলে দেখা ব'লে, জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর-এক কালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনও ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। সে চলেও বটে চলে না'ও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে। যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ওই পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।

এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত, অথচ গাছের ওই পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম, তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতের যে-সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চার দিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছি নে এমন হওয়া অসম্ভব নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর-একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় ক'রে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল— সেই জন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখতেই পাই নে, এমন-কি তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান না।

আমার মনে আছে একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেক ক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোই নি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাকতুম তা হলে হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয় তো সেই স্বপ্নবর্তীকালের রেলগাড়িতে করে চলে যাওয়ার দরুন স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মতো বেগে পিছিয়ে যেতে থাকত; তার কোনো-একটা জিনিসের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে ঘোড়া দৌড়োচ্ছে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশ ঘণ্টা করতে পারি তা হলে দেখব তার পা উঠছেই না। ঘাস প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে অথচ আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি নে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জানতে পারি ঘাস বাড়ছে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তা হলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড়-পর্বতের মতোই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যে কালের তালে চলছে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা চলছে। কালের পরিবর্তন হলে হয়তো দেখতুম বটগাছটা চলছে কিংবা নদীটা নিস্তব্ধ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্বত সূর্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘনদেশের জিনিসকে এক রকম দেখে, ব্যাপক দেশের

জিনিসকে অন্য রকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে এক রকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্য রকম দেখে—এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক-হাত আধ-হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখছে তা নয়, লোহার পরমাণুকে নিবিড় এবং স্থির দেখছে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখত তা হলে দেখত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেই জন্যেই লোহা হচ্ছে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্ছে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ, সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু পরমাণু নয়—দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈথর-পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয়, আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তিদ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন ব'লে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ, আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে—আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর-এক কথা বলে।

আমি বলি, ওই তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কলের সৃষ্টি নয়, সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বলবেন, এক-এক মন এক-এক রকমের সৃষ্টি যদি ক'রে বসে তা হলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি, তা তো হয় নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্ছে, আমার এক-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত, তা হলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বন্ধ হয়েছে ব'লেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেই জন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না, মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করছেন, এই মন-পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এ-সব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। খ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আসছে। তাই পুরাতন ঋষি বলছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর, যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়॥ তাই ব'লে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয়, সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার, যদি বিরোধ থাকে তা হলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সংকুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি, সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে এ কথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম ক'রে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত আর-এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহৃত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন 'আমি আছি'। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে: অহমস্মি। আমি আছি॥ যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন: অহমস্মি। 'আমি আছি' এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছি'র প্রকাশ কিন্তু তাই ব'লে এ কথা বলাও চলে না যে, এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছি'র মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছি'কে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছি'র মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাকতে পারে না। আপনাকে সেই জানে না, যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই, আমি সে দিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি—দূরেও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য

গতিও সত্য। অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে লুপ্ত হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয়সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায়, সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়— সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে— তার থেকেই বুঝতে পারি জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্র এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে— তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না— গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিও-চাঞ্চল্য-মাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা; বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা; কিন্তু কবি বলছে, 'আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন, সেই তো এই বিশ্বসংগীত— নইলে কিছুই বাজত না।' বীণার তার একটি নয়, লক্ষ তারে লক্ষ সুর— কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়-যন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান। এই জন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে তা নয়; এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই; কোথাও গিয়ে সে থামবে না। মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন। আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করছি নে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয় নি। এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টি-ভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

* আশ্বিন ১৩২১

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলাদেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর-কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন-কি হিন্দু মুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এ-সব হয় নাই— কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারও পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্মবুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে শুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে— ইহা মায়া নহে, স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবল-মাত্র ভারতেরই জল-বাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে নীতি আপনিই রীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই, কেবল মানিয়া গেলেই চলে —এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো— আমরাও পশ্চিম সমুদ্রপারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, 'তোমরা মরিতে বসিয়াছ। আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্তুচাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ। তোমরা স্থূলের উপাসক।' এ-সব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, 'হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি— ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।' এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা যে চলিতেছে, ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই,

এ কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে—বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রায় সংকটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর, কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর-একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ, তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এই জন্য, নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই, হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক—নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া? তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিস নয়, যেমন করিয়া পারো একটা কর্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনই হাঁ-হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বক্‌শিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয়, 'হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।'

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় 'খাঁচাটাকে ভাঙো—কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখা-দুটাকে অসাড় করিয়া দিল', নয় বলিতে হয়—ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র; কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠান্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য—কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক, তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে, যে সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে

দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক— বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কী! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোস রোস', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক-না'।

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদিয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই শরিক বটে, কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই, নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে সে শ্যাওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো-আনা জল, চার-আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ, জলই পৃথিবীতে গতিসঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কী ভয়ংকর তাহা মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত-বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালু-চাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জটি সেখানে একা স্থাণু হইয়া ঊর্ধ্বনেত্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ গণিতেছেন— কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া? নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কী উপায়ে?

জোর করিয়া চোখ বুঝিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ংকর হইয়া বসিয়া আছে— এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এক কালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর-এক প্রদেশে

ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে, মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালুচাপা পড়িয়া গেছে। এখানে-সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটোএকটা ভাঙা টুকরা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছুকিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে; কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কী? সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলই তলাইয়া যাইতেছে।

চারি দিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনোই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহুপূর্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত—সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাই-করা ও কারিগরের-ছাপ-মারা সামগ্রী ছিল না—তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁত নয়, নিটোল নয়—তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত 'মমি' মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন? তাহাদের সিন্দুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্-না কেন, সেই ইজিপ্টের নীলনদীর পলি-পড়া মাঠে আজ যে 'ফেলাহীন্' চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোটো ভাই; আগে প্রাণ, তাহার পরে মৃত্যু। যাহা-কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে—যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এই জন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর-কিছুই নাই; কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধ-সংস্কারের মোহজালকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তায় স্বকপোলকল্পিত

বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠান্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত এ কথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয় আছে। কারণ, তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে—সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ-সকল প্রাণ-বহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠান্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা—শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরস্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনীসংকেতে ওঠ্‌বোস্‌ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকান্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল! ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর-কোথায় ঘটিয়াছে?

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এই জন্য আর-কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্বাগ্রে চলার পথে

ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল, কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এ দেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন— এই জন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের এক দলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর-কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে', আক্ষেপ করিয়া বলেন 'আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না'। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ-নিবৃত্তির জন্যই লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ংকর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকালবেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়্দাড়্ শব্দে ঘরের দরজা-জানালা-গুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরও অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে! জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেক দিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্তিগুলি চারি দিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক— তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য-সাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না— মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও—এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে—

তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে—তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে, কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

* বৈশাখ ১৩২১

নবযুগ

আজ অনুভব করছি নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহতের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য, সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা; এই হল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি, সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ-অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক—এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য বলেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য, বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই-যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ কাজ মালীও করতে পারত; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না; সে কেবল তার কর্তব্য করে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে-একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে, ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করছি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'এর সমষ্টি; কিন্তু সকল বিধি-নিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়, 'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঞর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি, ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক; নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য ও অনার্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল;

ভারতবর্ষ তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার পরে আর-একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য-অনার্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরও দেখেছি, এক সময় যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মকাণ্ড-আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল, অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেছে। তখন এই বাণী উঠল যে, নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্মপীড়ন নয়— সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়; সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে কার কী এল গেল! কিন্তু, যিনি সত্যকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত; তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য তাই তপস্যা। তখন বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবা মাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি। ইহুদিদের মধ্যেও দেখি, ফ্যারিসিরা সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড়ো স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড়ো কথা নয়; কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত ক'রে হীন ক'রে রেখে পুণ্য বলি কাকে!

আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, এক-জন বিদেশী রুগ্ণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়ে শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না; সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্যমাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত ব'লে একটা কোন্ পদার্থ তাদের আছে, মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো ব'লে জেনেছে। যদি কারও মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ ক'রে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত, তা হলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাত তা নয়, সে দণ্ডনীয় হত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তা হলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে মানবধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্ধ্বে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে।

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয়-রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে 'পারব না'। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে ম'রে প'ড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের ক্ষালন। এর থেকে মনে হয়, যে অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারি নে।

আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেছে। আর্যে অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজও যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে, তবে বাঁচব কী করে? রাউন্‌ড্‌ টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না?

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশজোড়া এতবড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থির-প্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন?

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, এখনও তার শেষ হয় নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্যবস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সংকোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এত বড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না, সেই অপ্রেমের, অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক; যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।

৭ পৌষ ১৩৩৯

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত। ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘর সংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে। ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না এইটেই আশ্চর্য। বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না। আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পংক্তিতে পড়েন না, তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে— সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্য-ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ। কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন॥

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে— শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই। মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এই জন্য

জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানবপ্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে— বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিম্বা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্‌টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিম্বা টেক্‌স্‌ট্‌বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেই জন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি কাণ্ট্‌ হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে এ কথা মানিতে দোষ কী?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের

ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান। এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে, সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে, তবে বলিতেই হইবে দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব—দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না; তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এই জন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালো বাসুক আর না-বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর। ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা

জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কি না আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে—সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এই জন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এই জন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানব-সমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্তই যাক্ সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন'।

* ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

বিদ্যার যাচাই

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি

কবিদের সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মনে একটা শ্রেণীবিভাগ-করা ফর্দ লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্‌ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদিগকে চাখিয়া নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে, কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। ইহার ফল কী হইয়াছে বলি। আমাদের শিশুবয়সে দেখিতাম কবি বায়রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অল্প কিছু দিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনিলেই যেরূপ রোমাঞ্চিত হইতেন এখন আর সেরূপ হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলন্‌ডে কাব্যবিচারকদের রায় অল্পবিস্তর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এই জন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটার্লিঙ্ক্‌ ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি, যদি জন স্টুয়ার্ট্‌ মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে; তার কারণ, যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এই জন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এই জন্য নিজের হিসাব-মত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই, জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের

ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো-আনা মানিয়া লইতে হয়। এই জন্যই ইস্কুল-মাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পশার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

* আষাঢ় ১৩২৬

বিদ্যাসমবায়

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার্' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তাহার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনো দিন সে কোনো রিভার্ দেখিয়াছে কিনা, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ, এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহুদূরবর্তী, অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি-বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভার্ও রিভার্। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চায় শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই— শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই— তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড়, তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না; অনেক কালের অগৌরবটাকে এক দিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদের নাই', তখনও বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায়

যে 'আর-সকলের দেশ আছে আর আমাদের আছে স্বর্গ', তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয়, এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজদেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে; সেই জন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ-দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশের বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশ-বিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি-দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদিই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে

সেই শোগুন হইয়া আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কান-মলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম; ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলাম; এ দিকে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া, নিজের বাস্তুবাড়ি বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উল্টা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। শুটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ-সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যা-সমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিস্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য।

* আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

কলাবিদ্যা

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতার যুগ। ইহাই, হয় গায়ের জোরে নয় সম্মোহনের দ্বারা, সমস্ত পৃথিবীকে বশ করিতেছে। এই সভ্যতা পৃথিবীর যে জাতিকে স্পর্শ করিতেছে তাহারই আকৃতি ও প্রকৃতি হইতে নিজের বিশেষত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। জাপান যখন য়ুরোপের বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিল তখন হইতে তাহার বেশভূষা তাহার জীবনযাত্রার বাহ্যরূপেরও পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধপ্রণালী ব্যবসায়প্রণালী আজ পৃথিবীতে সকল দেশেই একাকার হইতেছে ইহাতে আশ্চর্য নাই, কেননা ও-দুটো যন্ত্রমাত্র এবং যন্ত্রের রূপ সকল দেশে একই রকম হইবে বৈকি। কিন্তু মানুষের মন তো যন্ত্র নহে; মানুষের বেশভূষায় গৃহ-সজ্জায় আচারব্যবহারে তাহার মানসিক প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশ করে। কালে কালে তাহার পরিবর্তনও ঘটে; এক জাতি অন্য জাতির কাছ হইতে এ-সকল জিনিসও কিছু কিছু ধার লয়, কিন্তু সে-সমস্তই সে আপনার করিয়া লয়—মোটের উপর তাহার কাঠামোটা ঠিক থাকে।

কিন্তু আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের নিজের মনের সঙ্গে তার নিজের তৈরি কলের সাংঘাতিক লড়াই বাধিয়া গেছে। মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যে তাহার মনের স্বাক্ষর কোথাও আর দেখিবার জো নাই, সর্বত্রই কলের ছাপ। এই কলের সন্ততিগণের মধ্যে কোথাও আর রূপভেদ নাই। সুলভতা এবং সুবিধার প্রলোভনে মানুষ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে—সেই প্রলোভনে মানুষ নিজের মনের কর্তৃত্বকে নিজের সৃষ্টি-শক্তিকে অস্বীকার করিতেছে। ইহাকে সুবিধার তুচ্ছ মজুরি লইয়া কলের দাসত্ব করা ছাড়া আর কী বলিব? পরদেহজীবী পরাশ্রিত (parasite) জীব যেমন স্বাধীন উদ্যমশক্তি হারায় কলাশ্রিত মানুষ তেমনি মনের রুচিস্বাতন্ত্র্য হারাইতেছে, তাহার নিত্য ব্যবহারের সামগ্রীতে তাহার আপন সৌন্দর্যবোধকে প্রয়োগ করিবার স্বাভাবিক উদ্যম নির্জীব অলস হইয়া যাইতেছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই রুচিস্বাতন্ত্র্যনাশক মরু-হাওয়া ভারতবর্ষীয় শিল্প-গুলিকে সবই প্রায় নষ্ট করিয়াছে। বহু যুগের অভ্যাসে যে নৈপুণ্য উৎকর্ষলাভ করে, একবার নষ্ট হইলে ফর্মাশ দিয়া মূল্য দিয়া যে নৈপুণ্যকে আর ফিরিয়া

পাইবার রাস্তা নাই, মানুষের সেই দুর্লভ সামগ্রী আমরা প্রায় হারাইয়া বসিয়াছি। পাখির পালকের লোভে কিম্বা স্বাভাবিক হিংস্রপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য য়ুরোপীয়েরা পৃথিবী হইতে সুন্দর-দেখিতে কত পাখি প্রায় নির্বংশ করিতেছে। এই পাখি-গুলি প্রকৃতির বহুযুগের সৃষ্টিসাধনার ধন, ইহারা মরিলে কোনোকালেই আর ইহাদিগকে ফিরাইয়া পাইব না। মানুষের সৃষ্টিসাধনার শিল্পগুলিও এমনি বহু তপস্যার ফল, তাহা এমনি সুকুমার; য়ুরোপ তাহাদিগকে বধ করিয়া সমস্ত মানুষকে শাস্তি দিতেছে, লোকালয়ের যাহা শ্রী তাহাকে চিরনির্বাসিত করিতেছে।

যাহা হউক, যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলের কাছে মানুষের রুচির পরাভব সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ঘটিতেছে, সেখানে ভারতবর্ষ নিষ্কৃতি পাইবে এমন আশা করি না—যেখানে পণ্যের হাট সেখানে বাণিজ্যলক্ষ্মীর হাতে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর, কলের হাতে কলার অপমান বর্তমান যুগের ললাটে লেখা আছে।

মানুষ আপন অন্তরতম ইচ্ছাকে ভালোবাসাকে শুধু কেবল আপন ব্যবহারের দ্রব্যের মধ্যেই প্রকাশ করে তাহা নহে; তাহার সংগীত, তাহার চিত্রকলা এই প্রকাশের প্রধান বাহন। ইহার দ্বারাই দেশ আপন অন্তরের আবেগকে বাহিরে রূপদান করে এবং তাহাকে চিরন্তন করিয়া উত্তরকালের হাতে সমর্পণ করিয়া যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতিবিশেষে যাহার তারতম্য আছে, কিন্তু প্রকারভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে-সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিচার এক নিয়মে হইবে আর ইংলন্ডের অন্য নিয়মে হইবে ইহা হইতেই পারে না। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তাহার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেই।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই, আর থাকাই শ্রেয়। ইহাকে নষ্ট করা আত্মহত্যা করারই সামিল। এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই-সকল কলাবিদ্যার 'পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নাই। স্থান থাকার যে গুরুতর প্রয়োজন আছে সেই বোধ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হইতে চলিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের বিদ্যা অভাবের অনুচর। ইংরেজি শিখিলে চাকরি হইবে বা রাজসম্মানের সুযোগ ঘটিবে, দরিদ্রের এই মনোরথ আমাদের দেশের বিদ্যাকে চালনা করিতেছে। পাছে সেই লক্ষ্যসাধন হইতে লেশমাত্র চিত্ত-বিক্ষেপ হয় এই ভাবনায় আমাদের দেশের লোক ব্যাকুল। এই লক্ষ্য-সাধনের কাছে দেশের সমস্ত মহত্তর কল্যাণকে বলিদান করিতে আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ নাই।

ইংরেজ তো ভাষা ভূগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখিতেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখিতেছে। এই-সকল ললিত-কলা-শিক্ষা-দ্বারা তাহার পৌরুষ খর্ব হইতেছে এমন প্রমাণ হয় না। সংগীতনিপুণ বলিয়া জর্মান জাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চায় পিছপাও এ কথা কে বলিবে? বস্তুত আনন্দপ্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই

আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। যে লোক কাঠের কারবার লইয়া আছে সে মনে করিতে পারে গাছের পক্ষে ফুল ফল পাতাগুলো শৌখিনতা মাত্র, উহারা শক্তির অপব্যয়, আসল সারবান জিনিস হইতেছে গাছের কাষ্ঠ-অংশ। এ কথা ভুলিয়া যায় যে, উদ্ভিদ্‌রাজ্য হইতে ফুল যদি বিলুপ্ত হয় তবে কাঠও তাহার সহমরণে যাইবে। তেমনি, যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে জাতি কাজ করিতেও ভোলে। জাপানি কাজ করিতে নিরলস, প্রাণ দিতে নির্ভীক, কিন্তু চেরি ফুল ফোটার সৌন্দর্য-সম্ভোগ লইয়া দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই উৎসব করে এবং চিত্রকলার পরম মূল্য বোঝে না এমন মূঢ় সে দেশে কেহ নাই। আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্য-ভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। ইহাতে আমাদের প্রকৃতি কর্মশক্তিকেই দুর্বল করিতেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে এই-যে দারিদ্র্য তাহার লক্ষণ ও ফল আমাদের শান্তিনিকেতনের বালকদের মধ্যেও দেখিতে পাই। এখানকার বিদ্যালয়ে সংগীত ও চিত্রবিদ্যা শিখাইবার ভালো ব্যবস্থাই আছে। ছেলেদের অনেকেরই গান গাহিবার, ছবি আঁকিবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে। যতদিন তাহারা নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন তাহাদিগকে গান গাওয়া বা ছবি আঁকা শেখানো শক্ত হয় না, ইহাতে তাহারা আনন্দই বোধ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠিবা মাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য তাহারা বুঝিতে পারে, ইহার অন্তর্নিহিত দীনতা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তখন হইতে পরীক্ষার পড়ার বাহিরের এই-সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাহাদের মন বাঁকিয়া বসে। অন্য বিদ্যার প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মে। ইহার কারণ সমস্ত সমাজের মধ্যে যে শিক্ষাগুলির প্রতি ঔদাসীন্য আছে একটু বয়স হইলে ছাত্রদের মনেও সেই-সব শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হয়। এ কেবল আমাদের এই হতভাগ্য দেশের অন্তর-বাহিরের দারিদ্র্যেরই লক্ষণ।

বাল্যকাল হইতে আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপে কলাবিদ্যার সংস্রব হইতে দূরে থাকেন। ইহাতে দেশের যে কত বড়ো ক্ষতি হইতেছে তাহা অনুভব করিবার শক্তি পর্যন্ত তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন। কিছুদিন হইল য়ুরোপের চিত্রকলার নকল ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশের একদল চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা য়ুরোপীয় গুণীদের নিকট সমাদর পাইয়াছে, আর তাঁহাদের অনেকে বিদেশে রসজ্ঞদের নিকটে খ্যাতি পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এতকাল পর্যন্ত তাঁহারা কিরূপ অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপ সহিতেছেন তাহা জানা আছে। ইহার একমাত্র কারণ, আমাদের নিজের দেশের চিত্রকলা বলিয়া কোনো পদার্থ আছে ইহা আমাদের জানাই নাই—সে চিত্রকলার মর্যাদা বুঝিবার মতো কোনো শিক্ষাই হয় নাই। য়ুরোপের নিকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্রের শস্তা নমুনা ছাড়া আর কিছু আমরা দেখিতে পাই না; আর, সেখানকার ভালো ছবিও যেমন দেখি না তেমনি সেখানকার ছবির বিচার-আলোচনাও আমরা শুনিতে পাই না। সুতরাং য়ুরোপীয় চিত্রেরও উৎকর্ষ যাচাই করিবার উপায় আমাদের হাতে নাই।

আর, সংগীতের দুর্গতির কথা একবার ভাবিয়া দেখো। কন্‌সর্ট্‌ বলিয়া যে

কাংস্যক্রেংকারঝঙ্কৃত অত্যাচারকে আমরা পাড়ায় পাড়ায় সংগীত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাহার মতো বর্বরতা আর-কিছুই নাই। ভারতীয় সংগীতের প্রাণ ইহাতে তো নাইই, তাহার পরে ইহাকে যদি আমরা য়ুরোপীয় সংগীতের নকল বলিয়া কল্পনা করি তবে সেও একটা অতি অন্যায় লাইবেল। বিবাহসভায় ও শোভাযাত্রায় ব্যান্ডের সঙ্গে শানাইয়ের ধাক্কা লাগাইয়া দিয়া সংগীতের যে মহামারী ব্যাপার বাধাইয়া দেওয়াকে উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা মনে করি, সে কি কোনো-মতেই সম্ভবপর হইত যদি সংগীতকলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দরদ থাকিত?

দেশের উদ্‌বোধনের কথা আমরা আজকাল সর্বদাই বলিয়া থাকি। মনে করিয়া থাকি সেই উদ্‌বোধন কেবল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-সভায়। অর্থাৎ, কেবল অভাবের ক্রন্দনে, দরিদ্রের প্রার্থনায়। এই আমাদের মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেইখানেই দেশের আপন গৌরব প্রসুপ্ত আছে। সেই সম্পদ যতই উদ্‌ঘাটিত হইবে আমাদের গৌরবের ততই উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নব-উদ্‌বোধনের উৎসব বিলাতী গোরার বাদ্যে অথবা দেশী সংগীতের হাড়গোড়-ভাঙা একটা বিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। আর, আমাদের দেশের নির্বাসিত লক্ষ্মীকে নূতন আবাহন-কালে মন্দিরের দ্বারে যে আলপনা আঁকিতে হইবে তার ডিজাইন কি জর্মানি হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিব?

* অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আশ্রমের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য-জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে, কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ বলে জেনেছি।

আরও একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা শস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে 'চুপ চুপ'; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর-একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে-পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছট্‌ফট্‌ করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বের্গসঁ'এর বচন! এ মহান্‌ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা: তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ্‌-কুশ-আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা—আশ্রম-বালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের

দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য-বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতিক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যম-শীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃংখল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়। সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন ক'রে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়-বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাসিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে —এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধা-জনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে ক'রে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আব্দার বেড়ে ওঠে, এমন-কি ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পারো না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছ যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই

ভালো; অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে ক'রে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত ক'রে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক্ চর্চা সেখানেই ভালো ক'রে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্ আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট নমুনা-মত রূপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো ক'রে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আল্গাভাবে ধরে নিলে— ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

* আষাঢ় ১৩৪৩

তোসামারু জাহাজ। ১৯ বৈশাখ ১৩২৩। বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা, যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না, অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল— বাড়ি গেল স'রে আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

রাত্রে বাইরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে! জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই।

কোনো-একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্তলোকের. আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়. মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জ্বালতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো; তা অঞ্জনের মতো কালো. কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো; তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখলুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে রয়েছেন।

সমুদ্রে ঝড়

২১ বৈশাখ। বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি খসে গেছে। কিন্তু এখনো তার মাটির রঙ ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি— কেবল দেখা গেল, জলে আকাশে এক দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েছে. নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদবিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা. কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দূলবিক্রীড়িত শুরু হয় নি।

পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে দিয়ে প্রসন্নমনে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানি দরোয়ানদের খচমচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত

হয়ে উঠল। জলের উপর সূর্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন ক'রে নীলাম্বরীর-ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তখনো মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে যখন শুলুম তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলছে— এক দিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর-এক দিকে ছল্ ছল্ শব্দে জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পালা ব'লে মনে হল না। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি ক'রে কখন এক সময় চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো-একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই; বলছে, যা থাকে কপালে! আর, জলে যে বিষম গর্জন উঠছে তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না এমনি বোধ হতে লাগল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লন্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এ দিকে ও দিকে চলাচল করছে, কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সংকেতঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাইরে জল-বাতাসের গর্জন আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকল— ঘুমোচ্ছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকালবেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স এবং জল কেবলই বাকি অন্তাস্থবর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়বীণা বাজাচ্ছে! এর সঙ্গে নন্দী-ভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ও দিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই— চারি দিক ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।

জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে, কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবু সে-সব বাধা ভেদ করে এক-একবার জলের ঢেউ হুড়্মুড়্ করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠছে।

কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল, চারি দিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু— আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি-ছোটোটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এত-বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না!— বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়্‌চাপড় খেয়েছে তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানি মাল্লারা এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণসংশয় ছিল। জাহাজ যে বরাবর আসন্ন সংকটের সঙ্গে লড়াই করেছে তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল— জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল। কিন্তু ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে জাপানি মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন, কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারছে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম— ঝড়ের সময় সে এক রকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুলতে পারছে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রঙ ফিকে হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখি দেখতে পেলুম— এই পাখিগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়— আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের— তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারও কণ্ঠে সুর নেই— সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্ছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

সমুদ্রের রঙ

২ জ্যৈষ্ঠ। জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গমর্তে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোমটা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতিরোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গমর্তের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রঙ যে কত রকম হতে পারে তার সীমা নেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্যাস্তের মুহূর্তে পশ্চিম-আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছাড়িয়ে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য, পূর্ব-আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য। প্রকৃতির হাতে অপর্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্যাপ্তও তেমনি; সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারও মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা কেমন করে বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ান্‌কে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোটো ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখাতে থাকে— তখন আশ্চর্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্যলীলায় রুদ্রের প্রকাশ কিরকম দেখা গেছে, সে পূর্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর-এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চার দিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্পরেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। আর-একটা বজ্র পড়ল আমাদের সামনেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জার্‌ল্যান্‌ডের ইতিহাসবিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন; মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর-একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

৫ জ্যৈষ্ঠ। এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভ'রে দেখছি আর মনে হচ্ছে, অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যত দূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না, সে

কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে-যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি— সমস্তকে অতিক্রম ক'রে, বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে-যে চলেছে সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসারযাত্রা— প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ও দিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখতে পাওয়া যায় না? না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য তো নয়— কেননা, ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি সে তো বুদ্ধিমানের চলা, তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা; সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর, যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়; কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ত আছে— সে বলছে, ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ ক'রে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যে দিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বার বার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বার বার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগোচ্ছে— ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো ক'রে কুল আঁকড়ে বসে রইল— তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্যলীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উলটো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ঐ কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে, অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেননা এ-যে তাঁর পরমা সম্পদ্। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়ছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির

আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন। সেই জন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি—আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলেছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

কোবে-বন্দর

১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের 'কোবে' বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্রযাত্রীদের ইশারা করছে, কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা; বাদলার হাওয়ায় সর্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যে রকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেই রকম ঘোরতর সর্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এ ধার থেকে ও ধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানি যাত্রী দেশে ফিরছেন, তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে। তখন কেবল একটিমাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন, তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখছি নূতনকে, তিনি দেখছেন তাঁর চিরন্তনকে।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে সেইখানে নৃত্য করছে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে।

২২ জ্যৈষ্ঠ। জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোশাক ছেড়ে আপিসের পোশাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেই জন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়।

এই জন্যে জাপানের শহরের রাস্তায় বেরোলেই, প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে খাতির করে নি; সেই জন্যেই ওরা নয়ন-মনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না; লোকে বলে জাপানের ছেলেরা-সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলা-গাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না।

পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্‌ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে— আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল্‌-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্‌লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্‌লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীরমনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে—জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে, গ'লে পড়তে দেয় না।

জাপানি কবিতা

এই-যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝর্নার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল পাখি চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের একটা বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস্‌। আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কিরকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কিভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে, তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

যাই হোক, এই কবিতার মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের

মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

জাপানি ফুল-সাজানো

কাল দুজন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সংগীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানি মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়ছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন তাঁরা অবকাশ-কালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল— এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে জাপানি নিজের এই সৌন্দর্য-অনুভূতিকে শৌখিন জিনিস ব'লে মনে করে না; ওরা জানে, গভীর-ভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে শান্তি।

চা-এর নিমন্ত্রণ

সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান-অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম জাপানির পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর-যানে ক'রে গিয়ে প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করলুম— সে বাগান ছায়াতে সৌন্দর্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে। জাপানের চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে— যেমন ওরা দেখতে জানে তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তার পরে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বসলুম। নিয়ম হচ্ছে, এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত ক'রে স্থির করবার জন্যে, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো-তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করতে করতে শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত— কারও মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয় অথচ মনে হয় যেন এ-সমস্ত ঘর কী-একটাতে পূর্ণ, গম্ গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারি দিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই।

ভালো জিনিসগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতিনের ঘর করতে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা ক'রে ক'রে স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত ক'রে তুলে, তার পরে এই রকম দুটি-একটি ভালো জিনিস দেখালে সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম।

তার পরে গৃহস্বামী এসে বললেন—চা তৈরি করা এবং পরিবেশনের ভার তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে নমস্কার ক'রে চা-তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে চা-তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুন জ্বালা, চাদানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত-যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত ক'রে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলই ঢেউ উঠছে, তার থেকে দূরে, সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত ক'রে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। এর থেকে বোঝা যায় জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিসটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্বল করে। কিন্তু, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যেই জাপানির মনে এই সৌন্দর্য-রসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

জাপানের সৌন্দর্যবোধ

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহভঙ্গীর সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে।

কিন্তু এদের সংগীতটা, আমার মনে হল, বড়ো বেশি দূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না।

অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি। অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানি রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা-কিছু চোখে পড়ে তার কোথাও জাপানির আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকদের মধ্যেই রূপরসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত— কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে, অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েছে?— ঠিক তার উলটো। এরা এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে। এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য এবং কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে।

জাপানি ছবি

হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে শৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযত। বিষয়টা এই : চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে-ভোর হয়ে চলেছে —তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দার উপর আঁকা। মস্ত পর্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবড়জং কিছুই নেই— যেমন উদার, তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না— নানা রঙ নানা রেখার সমাবেশ নেই— দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড়ো এবং খুব সত্য। তার পরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখলুম। একটি ছবি— পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে; আর কিছু না, জলের কোনো রেখা পর্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা— এটা-যে জল, সে কেবলমাত্র ঐ নৌকাটি আছে ব'লেই বোঝা যাচ্ছে; আর এই সর্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত-কিছু কালিমা সে কেবলই ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েছেন যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ— জ্যোৎস্নারাত্রি— অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু, আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই তা হলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলোবে না। হারা-সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সংকীর্ণ ঘরে, সেখানে এক দিকে প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে— প্লাম গাছের ডালে একটিও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় ক'রে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-

ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধ'রে আমার কাছে দেখা দিলে : তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' সেই শ্লাম গাছের একাগ্র-প্রসারিত শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ আলোয় আলোময়—তারই মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

জাপানের মন

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিটত না, এবং বর্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।···

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। কিন্তু, আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে সাধনা অমৃতলোককে মানে এবং সেই অভি-মুখে চলতে থাকে, যে সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সে হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা, সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মানির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কি না এবং সে ধর্মটা কী। কিছুদিন এমনও তার সংকল্প ছিল যে, সে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে সেই ধর্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে, অতএব খৃস্টানিকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু, আধুনিক য়ুরোপে শক্তিউপাসনার সঙ্গে-সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃস্টানধর্ম স্বভাবদুর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়। য়ুরোপ বলতে শুরু করেছিল, যে মানুষ ক্ষীণ তারই স্বার্থ—নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত সে ধর্মে তাদেরই সুবিধা, সংসারে যারা জয়শীল সে ধর্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এই জন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। সে জানছে পরকালের দাবি থেকে সে মুক্ত,

এই জন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহলা নয়। তার একটি অন্তর-মহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heaven-কে স্বীকার করে আসছে। সেখানে নম্র যে সে জয়ী হয়, পর যে সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তর-মহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিত—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না, শেষ পর্যন্তই এ টিঁকে থাকবে এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তর-মহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তর-মহলে মানুষের যে মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেক দিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

* বৈশাখ ১৩২৩ - বৈশাখ ১৩২৪

ভানুসিংহের পত্রাবলী

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

কবিশেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টিসৎকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরানি বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে, কিন্তু যে লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না— হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখো-না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব ব'লে ইচ্ছা করেছিলুম, কিন্তু এমন হতে পারত, তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আসতে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয়তো সব ভালো লাগবে না—তখন যে ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩২৪

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হয়ে উঠেচে। আকাশের ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝর্‌ঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজচে আর বৃষ্টিতে-ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সামনেকার সবুজ ক্ষেত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠেচে; আর তারই এক পাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেচে— ঠিক যেন একটি সোনালি সবুজ শাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব— তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জন চরে কাটিয়েচি। তার পরে কতদিন গেচে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়িবারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম; রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে

কী বলত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবি করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না; সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না। ১৮ শ্রাবণ ১৩২৫

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ করতে করতে চলেচ, কত স্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েচ—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়তো ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূব দিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রৌদ্র ধু ধু করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্চে। এক-একটা তাল গাছ তাদের ঝাঁক্ড়া মাথা নিয়ে পাগলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হল না—খাওয়ার পর এন্ড্রুজ্ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন, তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তার পরে নগেনবাবু-নামক এখানকার একজন মাস্টার তাঁর এক মস্ত তর্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আনলেন, তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেচে, তবু আমি আমার সেই ডেস্কে বসে আছি। বই, কাগজ, খাতা, দোয়াত, কলম ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জং জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা আছে যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুশকিল এই-যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ-চাপা দিয়ে জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে? আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে—সেই অলাবুনন্দিনীর 'কাহিনী' আর সেই 'চম্‌কিলা' 'সোনেকি তরহ' চুল-ওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মন খারাপ কোরো না—লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাকবে। সকলেই বলবে, তুমি এমন সোনেকি তরহ হাসি পেয়েচ কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝংকার থেকে, কোন্ প্রভাততারার আলোক থেকে, কোন্ সুরসুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্মিকল্লোল থেকে, কোন্—কিন্তু আর দরকার নেই, এখনকার মতো এই কটাতেই চলে যাবে—কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্নপ্রায়, অপরাহ্ণের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হয়ে এসেচে। ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

শান্তিনিকেতন

না, তোমার সঙ্গে পারলুম না—হার মানলুম। তুমি-যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি-সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে-সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি-সুদ্ধ একেবারে উলটে কাত হয়ে পড়বে—এত বড়ো ভয়ংকর মজা করবে, এ কী করে জানব বলো! তার পরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কাগাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে—এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার একপাটি জুতো রাস্তায় মাঝখানে ফেলে আসবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড়

করাবে—তারও উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁচে কান্না—কী মজা! যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদত তা হলেও বুঝতুম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চ'ড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে—তার পরে কিনা কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডের পরেও আবার উত্তরকাণ্ড। তুমি লিখেচ, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম আর হাত পা মাথা বুন্ধি-সন্ধি সমস্ত একেবারে উলটে-পালটে যেত তা হলে তোমাদের মতোই 'বাবা রে' 'মরলুম রে' করে চীৎকার করতুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না—নিশ্চয়ই পা দুটো উপরে আর মাথাটা নীচে করে আমি তানানানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধরতুম—

হায় রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা।
আমার গাড়ির হল উলটো মতি, কোথায় হবে আমার গতি-
খুঁজে আমি না পাই দিশা। সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উলটে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব—

যদিও আঘাত গায়ে লাগে নি
তবুও করুণ সুরে দেব আমি গান জুড়ে—
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা।

এই তো গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পরশু চললুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের সুর বসিয়ে এসরাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু গাড়ি উল্টে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তা হলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তোমার একপাটি চটি জুতো নিয়ে আসবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে মানে লয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারবে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরল, নটে শাকটি মুড়ল ইত্যাদি। ১৯ পৌষ ১৩২৫

শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণবৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাবচি, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী করে। তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখি, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেচ হাওয়া বদল করতে, আমিও এসেচি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেচ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে হাওয়ায় ছিলুম এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাত। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে—তুমি

নিজে চলে চলে ভ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলচে তাদের চলায় আমার চলা। এই হচ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ— অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচ্চে না। ঐ দেখো-না, আজ রবিবার, হাটবার, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে— আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চলেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষবাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইস্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে তা কিছুই জানি নে; একজনের হাতে ঝুলচে এক থেলো হুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চড়ে বসেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসচে ভুবনডাঙার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ-সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল— অত্যন্ত ছেঁড়াখোঁড়া রকমের চেহারা। এরাই দেখব আজ সন্ধ্যাবেলায় নীল লাল সোনালি বেগনি উর্দি প'রে কালবৈশাখীর নকিবের মতো গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ-কাওয়াজ করে আসতে থাকবে— তখন আর এমনতরো ভালো-মানুষি চেহারা থাকবে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ-পাখির দল, আরও অনেক রকমের পাখি জুটেচে— বটের ফল পেকেচে, তাই সব অনাহূতের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেচ। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পারো তা হলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোস্টে পাঠালেও আপত্তি করব না, এমন-কি ভ্যালুপেবলেও রাজি আছি। আসল কথা, ক'দিন থেকে এখানে রীতিমত খোট্টাই ফ্যাশানের গরম পড়েচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো জিব বের করে হাঃ-হাঃ করে হাঁপাচ্চে। আর এই-যে দুপুরবেলাকার হাওয়া, এ-যে কী-রকম সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না— এই বললেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লক্‌লকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাসবুনোনি— দিক্‌-লক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে ব'লেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্তের ছেলে ব'লেই খুব বুঝতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করি নে। এই দুপুরে দেখবে ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ, কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হুহু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করে যাচ্চে; এমনি তার ঘ্রাণ যে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং! গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে— কেমন যেন ঘোলা নীল, ঠিক যেন মূর্ছিত মানুষের ঘোলা চোখটার মতো। সকলেই থেকে থেকে

বলে বলে উঠচে, 'উঃ, আঃ—কী গরম!' আমি তাতে আপত্তি করে বলচি, 'গরম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন?' যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম করে সইতে পারি, কিন্তু মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল, তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি। ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার—আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় বসে তোমাকে লিখচি। মাঘের দুপুরবেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকীবীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এই রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখিটির মতো চুপ করে রোদ পোহায়। আজ উত্তুরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠচে—শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেচে—একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুন্‌গুনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচ্চে—একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থসন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে দুড়্ দুড়্ করে নেমে যাচ্চে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারও কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেচে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ—আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যানভঙ্গ করে এই ভয় আছে। ৪ মাঘ ১৩২৮

বোম্বাই

তুমি লিখেচ, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেচি—এবারে বোধ হয় পুরো মার্ক্ পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন—আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তার পরে আমেদাবাদে, তার পরে বরোদায়, আজ সকালে এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব'লে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তার মধ্যে তোমার দুখানা চিঠি। লেফাফার সর্বাঙ্গে নানা প্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে ব'লে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্তী, অতএব দু-চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, যাই হোক খৃস্টমাসের পূর্বেই ফিরব। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্যন্ত তোমায়

উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুজে দেখলুম, আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এলম্‌হার্স্ট্‌ আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়ে ছিল, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী-নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সব চেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ংকর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে—তারা ওর সঙ্গে হিন্দি বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, এজন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর-একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি তা হলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্তলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না করে বাঁচি নে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্চে আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্‌বিগ্ন হই। আমার-যে কতবড়ো দায়িত্ব সে ওকে না দেখলে ভালো করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধ হয় দুই-তিন দিনের মধ্যেই রওনা হব, অতএব যদি চিঠি লেখ তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর

জাহাজে

জাহাজ প্রায় নটার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে, ছোটো শিশু যেমন ক'রে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল-যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেচি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেচে—আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করচি। আমার কর্মের সঙ্গে পাখির গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্মর আপনার সুর যোগ করে দিতে পারচে না—অন্যমনস্ক হয়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন

অবারিত আত্মীয়তায় মিলচে না, কর্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ করে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না— মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই তো দেখচি সেদিনকার লীলালোক থেকে আজকের দিনের কর্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে প'ড়ে মনকে উতলা করে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলই জলের থেকে, আকাশ থেকে, তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, 'মনে পড়ে কি?' এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে? এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত জন্মান্তরসৌহৃদানি!

কাল দোলপূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্যন্ত আটকে পড়েছিল। সমুদ্রে যদি দোলপূর্ণিমার আবির্ভাব হত তা হলেই তার নাম সার্থক হত— তা হলে দোলনও থাকত আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখতুম।

আজ ভোরে উঠে দেখলুম, জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেচে —'মধুর বহিছে বায়ু'। আজ শনিবার, সোমবারে শুনচি রেঙ্গুনে পৌঁচব। সেখানে দিন-দুয়েক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা। তার পরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি চৈত্র ১৩৩০

পথে ও পথের প্রান্তে

তোমাকে চিঠি লিখছি কোপেনহেগেন থেকে, পড়েছি ঘূর্ণির মধ্যে। কোথাও একদণ্ড থামতে দিলে না। সত্যি কথা বলি তোমাকে, খ্যাতি-সম্মান পেয়েছি প্রচুর, তবু মন ভারতসমুদ্রের পারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তিনিকেতন থেকে খুকু লিখেছে, কাল খুব ঝমাঝম বৃষ্টি গেছে, আজ সকালে উঠেছে কাঁচা সোনার মতো রোদ— ঐ কথা ক'টা যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে; মন ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল; বললে, আচ্ছা, তাই সই, যাব সেই অধ্যাপকবর্গে, তারা যদি আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় তবু তো খোলা জানলা দিয়ে কাঁচা সোনার মতো রোদ পড়বে আমার ললাটে, সেই হবে আমার বরমাল্য। ইতিমধ্যে ভানুসিংহেব পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি ব'লে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণ-কালের জন্যে ভুলে গেলুম— কোথায় আছি। এত তফাত। এখানকার ভালো আর সেখানকার ভালোয় প্রভেদটা এখানকার সংগীত আর সেখানকার সংগীতের মতো। য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে; ধ্বনিটা দিগ্‌দিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। বলে উঠতেই হয়,

বাহবা! কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে রাগিণী বাজছে সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে, সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূরে থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান— মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেই জন্যে অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে। আমার নিজের সেদিনকার চিঠি যেন আমার আজকের দিনকে লেখা। কিন্তু জবাব ফিরিয়ে দেবার জো নেই; সেদিনকার ডাকঘর বন্ধ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিঠি বন্ধ করা যাক। সামনে আছে, যাকে বলে এন্‌গেজ্‌মেন্ট্‌; আর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি ৮ অগস্ত্য ১৯৩০

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি— আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে— পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশে ভরা— সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন-পাখা-ওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তারই সঙ্গে— আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন— কোনো ভারই তার কাছে ভার ছিল না— নদী যেমন আপন স্রোতের বেগেই আপনাকে সহজে নিয়ে চলে সেও তেমনি আপনার ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্ত-কিছুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছিল— যে ভবিষ্যৎ ছিল অশেষের দিকে অভাবনীয়। এখন আমার ভবিষ্যৎ এসেছে সংকীর্ণ হয়ে। তার প্রধান কারণ, যে লক্ষ্যগুলো এখন আমার দিনরাত্রির প্রয়াসগুলিকে অধিকার করেছে তারা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। তার মধ্যে অচরিতার্থ অসম্পূর্ণ আছে অনেক, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নেই। এইটেতেই বোঝা যায় যৌবন দেউলে হয়েছে, কেননা যৌবনের প্রধান সম্পদ হচ্ছে অকৃপণ ভাগ্যের অভাবনীয়তা। তখন সামনেকার যে অজানা ক্ষেত্রের ম্যাপ আঁকা বাকি ছিল, মাইল-পোস্ট্‌ বসানো হয় নি সেখানে, সম্ভবপরতার ফর্দ তলায় এসে ঠেকে নি। আমার শিলাইদহের কুঠি, পদ্মার চর, সেখানকার দিগন্তবিস্তৃত ফসল-ক্ষেত ও ছায়ানিভৃত গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে, যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায় নি। যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠে নি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত করে রেখেছিল— সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি— কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানাঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট করে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হল প্রোগ্রাম— হাপরের হাঁপানি-শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়ি-পেটা। যথানির্দিষ্টের শাসন আইনে-কানুনে পাকা হল, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস করে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শালবীথিচ্ছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না— সেই

মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখে অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষদিন পর্যন্তই বলতে পারতুম, আমার পাকবে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিত হল কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজারদর খতিয়ে হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, 'নিজবাসভূমে পরবাসী হলে।' এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে— সে দিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে, পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানাঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ইতি ৮ এপ্রেল ১৯৩৫

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

৫ অক্টোবর ১৯২৪। মানুষের আয়ুতে ঘাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ, উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সামনে এসে পড়ে, পূর্বে পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

জীবনের মাঝমহলে, যে কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত 'তোমার বয়স কত', তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ, আমার বয়স হচ্ছে কুষ্ঠির শেষ দিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে 'নেতা হও', কেউ বললে 'সভাপতি হও', কেউ বললে 'উপদেশ দাও'। আবার কেউ বা বললে, 'দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।' অর্থাৎ, স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

এমন সময়ে ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেল বেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে চা খেতে-খেতে একটা জরুরি কথা ভাবছি।

ভাবনাটা এক দমে এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চলে গেল। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল যে, ওই ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে; কোনো-একটা অন্যমনস্কতার ঠেলায় বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায় নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ওই ছেলে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েছে, দিগম্বর শিবের মতো। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি ক'রেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তা হলে ঠকতুম না। তা হলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে অকালে যুগান্তর-অবতারণার যে-সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য আমি যে একলা ভোগ করতুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্যে ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে বলা যেত : পীয়তাং ভুজ্যতাম্।

চায়ের পাত্রটা ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, যে পুলকটাতে আজ মন আবিষ্ট হয়েছে সেটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি কী করে। বয়স যখন ছত্রিশের নীচে ছিল তখন বলা-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিয়ে বলার ধার ধারতুম না। কেননা, তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটছে, যারা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না তারা আমার ঠিকানা পায় নি। আজ পনেরো-ষোলো বিশ-পঁচিশ আশি-পঁচাশি প্রভৃতি নানা-বয়সের প্রাচীন লোকের ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছি। ওদের বোঝাব কী করে, এই দুর্ভাবনা এখন ভুলে থাকাই শক্ত। মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিস আছে, স্বরাজ পররাজ নৈরাজের ভাবনা আছে,

এরই মধ্যে ওই গাখোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের-আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা-মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব।

আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেক কাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভবেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার?

মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, 'কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই; সে অন্নে নিজের জোর দাবি খাটে না, তাই তো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।' এই কথাই কাল বলছিলেম, বাঁধা পাওয়ায় পাওয়ার সত্য ম্লান হয়ে যায়। না-পাওয়ার রসটা তাকে ঘিরে থাকে না। ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই মিলেছে, সে হল মানুষের।

ছেলেবেলা হতেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগীর মতো অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন-মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মী-ছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত বিরাম নেই। শ্রোতা যারা তারা উপলক্ষ, বস্তুত কথাগুলো নিজেকেই নিজে শোনানো; যেমন বাষ্পরাশি ঘুরতে ঘুরতে গ্রহ-তারা-রূপে দানা বেঁধে ওঠে তেমনি কথা-বলার বেগে আপনিই তার সজাগ মনে চিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে। বাইরে থেকে মাস্টারের বাচালতা যদি এই স্রোতকে ঠেকায় তা হলে তার আপন চিন্তাধারার সহজ পথ বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর পক্ষে অতিমাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যাটা ভাবনার স্বাভাবিক গতিকে আটকিয়ে দেওয়া। বিশ্বপ্রকৃতি দিনরাত্রি কথা কইছে, সেই কথা যখন শিশুর মনকে কথা কওয়ায় তখন তার সেই আপন কথাই তার সব চেয়ে ভালো শিক্ষাপ্রণালী। মাস্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে 'চুপ'। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো

নয়। যে শিশুশিক্ষাবিভাগে মাস্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলবৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না ব'লে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে-বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনোদিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ ক'রে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধি নি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলে মেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গমূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি?

ক্রাকোভিয়া জাহাজ। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারি নি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম; শত্রুরা ভাবে অহংকারেই দূরে দূরে থাকি। যে ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ত দিলে না।

সুখদুঃখের হিসাবনিকাশ নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তকরার করে লাভ নেই। আমার একলা-আকাশের ফাঁকটাকে ভর্তি করতে হবে, সেই প্রত্যাশাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। দৈবের এই দাবিটিই আমার সম্মান; একে রক্ষা করতে হলে পুরাপুরি দাম দিতে হবে। তাই শূন্য আকাশে একলা বসে ভাগ্যনির্দিষ্ট কাজ করে থাকি। তাতেই আমার হওয়ার অর্থটা বুঝি, কাজেই আনন্দও পাই। বাঁশির ফাঁকটা যখন সুরে ভরে ওঠে তখন তার আর কোনো নালিশ থাকে না।

শরীরে মনে প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া যখন জোরে বয় তখন আত্মপ্রকাশের দাক্ষিণ্যেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার মেলে। কিন্তু যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় ক'মে, অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে ঘর বাঁধবার সময় পাই নি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনই আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে; তখন বুঝতে পারি সেই-সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয় বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।

দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে

মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক। রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল—তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে। কিন্তু, যে অনাদি অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি সেখানকার প্রচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রাপথের পাশে পাশে মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আমার তাপ জুড়িয়েছে, আমার ধুলো ধুয়ে দিয়েছে, সেই তীর্থের জল ভরে রইল আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়কন্দর থেকে বারবার যে বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে পৌঁচেছিল, কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায়, কত হাসিতে—শরতের ভোরবেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথরাত্রে—কত ধ্যানের শান্তিতে, পুজোর আত্মনিবেদনে, দুঃখের গভীরতায়—কত দানে, কত গ্রহণে, কত ত্যাগে, কত সেবায়—তারা আমার দিনের পথে সুর হয়ে বেজেছিল, আজ তারাই আমার রাত্রের পথে দীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। সেই অন্ধকারের ঝরনা থেকেই আমার জীবনের অভিষেক, সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ: আজ আমি তাকে বলতে পারব, হে চিরপ্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ করেছ রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত: আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্তির যে জয়স্তম্ভ গেঁথেছি কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তার ভিত। সেই জন্যেই আজ গোধূলির ধূসর আলোয় একলা বসে ভাবছিলুম—রঙিন রসের অক্ষরে লেখা যে লিপি তোমার কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসেছিল ভালো করে তা পড়া হয় নি, ব্যস্ত ছিলুম। তার মধ্যে নিমন্ত্রণ ছিল। কোথায়? কারখানা-ঘরে নয়, খাতাঞ্চিখানায় নয়, ছোটো ছোটো কোণে যেখানে ধরণীর ছোটো সুখগুলি লুকানো। তাই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে দেখছি, কতবার বঞ্চিত হলুম। জনতার জয়ধ্বনির ডাকে কতবার অন্যমনে গভীর নিভৃতের পাশ দিয়ে চলে এসেছি; মায়ামৃগের অনুসরণে কতবার সরল সুন্দরের দিকে চোখ পড়ল না। জীবনপথে আশে-পাশে সুধার-কণা-ভরা যে বিনা মূল্যের ফলগুলি পাতার আড়ালে ঢাকা ছিল, তাদের এড়িয়ে উপবাসী হয়ে চলে এসেছি ব'লেই এত শ্রান্তি, এত অবসাদ। প্রভাত যেখান থেকে আপন পেয়ালা আলোতে ভরে নেয়, রাত্রি যার আঙিনায় বসে প্রাণের ছিন্ন সূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে, ওই লুকিয়ে-থাকা ছোটো ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্যগর্ভ থেকে রস পেয়ে ফলে উঠছে, সেই অন্ধকার—যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

আত্মপরিচয়

সপ্ততিবর্ষপূর্তি-উৎসবের প্রতিভাষণ

যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলির মতো, চারি দিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধে নি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মর্চে-পড়া তলোয়ার -খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা -সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে-সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল—তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।

এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর-উপকরণ-সমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা-জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল, কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুর-বাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশ-ভূষাতেও তাই, চাল-চলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন-কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই, প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে—সাধারণত বাংলাদেশে ধর্ম-সাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্‌বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন এক দিকে, তেমনি অন্য দিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-

সম্ভোগে আন্দোলিত, সার্ ওয়াল্টর স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' আর তার পরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশমুক্তিকামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। 'হিন্দুমেলা'র পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়', গণদাদার লেখা 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে', বড়দাদার 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই-সকল আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উদ্‌যোগ, এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলিভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁওয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালী পড়ে নি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝর্নার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ-বাগানের পুকুরে। মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইয়ো হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ—লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি; মাস্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল-ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন্-একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দমেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী -মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট-অক্ষর ছয়-অক্ষর দশ-অক্ষরের চৌকো চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙা-গড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি

সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা-কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য— প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনো সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠে নি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব চেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি— আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাবসত্ত্বেও, বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও, আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম বসে। কখনো কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশকুসুমের মালা গেঁথে, কখনো গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার করুণ ধ্বনি শুনতে শুনতে অদূরগঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্যে থেকে হঠাৎ পরের মনের কনুইয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিও নি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর-কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতিপরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করে নি। এ ছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই-যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেছে, যে ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হলে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তিস্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করে নি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার-দরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্যমূল্যের কমতি হয় না।

ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন-সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামল পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্ররসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে : যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে— বলে উঠছে 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ', যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে, যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান ব'লেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার

নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে; যা রয়েছে তোমার চারি দিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা, আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে; তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে— তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে— আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে— আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি আবাল্যঅভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি— তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে— এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কী ইঙ্গিত আছে।

* পৌষ ১৩৩৮

সভ্যতার সংকট

অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পঠিত

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে। নিয়তই আলোচনা চলত সেক্স্‌পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে, এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, এক সময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম, সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে

সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। এই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু-কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত-মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি এক দিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য উগ্র হয়ে উঠল।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী-রকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর, দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে

শিক্ষাবিস্তারের, আরোগ্যবিস্তারের, কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পর-জাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এই রকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।

দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তরচীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল! পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলন্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদ্‌গ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও

ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি।

য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী ক'রে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসনচালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ-শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা-রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান্ এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজজাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এন্ড্রুজের নাম করতে পারি। তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল; আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশনের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকল-প্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি

না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী-রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর, আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।

আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম—ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট—সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্ন-স্তূপ। কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

নববর্ষ
১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৮

ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারি দিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে— দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছলছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহার কাঁচা সোনার মতো রঙ, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। রৌদ্রের এমন রঙ আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম-রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্যমহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এই জন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়—কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেই জন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পেঁছায় না সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে

যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর, চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই-যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণবাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম, কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা-ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে— কখন্ ডোবে, কখন্ ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই-যে অশথগাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিল্‌বিল্ করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীত-কালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল

আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসখুস করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত তখন আমার সাধ যাইত, সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি— এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসমি। যখন-তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম, তাহাদের কুসি-খুশি-রাক্কুসিকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি— আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া বাতাস কেমন হা-হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম, তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া, আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া, গায়ের গহনা ফেলিয়া, আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত তখন আমার মনে হইত, যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুশি-রাক্কুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি

দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন, সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনও দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন্ কাটিয়া গেল, গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্রমাসের শেষাশেষি এমন এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই এক দিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন জীবন্ত সে দিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন— তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের-সুখদুঃখের-স্মৃতিলেশমাত্র-হীন, আজিকার এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি— তাহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেইদিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ওই শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননী-দিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত, কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত— আহা, কী রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন তখন আমি জলের

কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্বউপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণপুটের মতো ফাটিয়া চারি দিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশসরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে-এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী! স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজূট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্রমাসে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-একজনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী!'

আর-একজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওমা, তাই তো গা, এ যে আমাদের চাটুজ্জেদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু!'

আর-একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না; সে কহিল, 'আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ!'

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, 'আহা, সে কি আর আছে! সে কি আর আসবে! কুসুমের কি তেমনি কপাল!'

তখন কেহ কহিল, 'তার এত দাড়ি ছিল না।'

কেহ বলিল, 'সে এমন একহারা ছিল না।'

কেহ কহিল, 'সে যেন এতটা লম্বা নয়।'

এইরূপে এ কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল। তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ-ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল্ ছল্ আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল

না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না— কুসুমের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছে-পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে, অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্ধ্বচীৎকারধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্ব-জন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী?'

কুসুম কহিল, 'আমার নাম কুসুম।'

সে রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম, কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে এক ধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত? কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত; সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত, দেবসেবায় আলস্য করিত না, পূজার ফুল তুলিত, গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান-সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যা বেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব

একেবারে দূরে হইয়া যায়— অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণহৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, 'প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন?'

'হাঁ, তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? আজকাল দেবসবায় তোমার এত অবহেলা কেন?'

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

'আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।'

কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'প্রভু, আমি পাপীয়সী, সেই জন্যই এই অবহেলা।'

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।'

কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল— সে হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন। তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, 'তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।'

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল— 'আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বাম-হস্তে আমার দক্ষিণহস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব, কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম, আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না; আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।'

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম, সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।'

কুসুম জোড়হাতে কহিল, 'তাহা বলিতে পারিব না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো।'

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, 'নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে?'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'হাঁ, বলিতেই হইবে।'

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'প্রভু, সে তুমি।'

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল অমনি সে মূর্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, 'তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব, পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম; আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো, এই সাধনা করিবে।'

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীরস্বরে কহিল, 'প্রভু, তাহাই হইবে।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তবে আমি চলিলাম।'

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, 'তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।'

বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে? চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

* কার্তিক ১২৯১

পোস্ট্‌মাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্ট্‌মাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট্‌আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্ট্‌মাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্ট্‌মাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্ট্‌মাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ-শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্ট্‌মাস্টার ডাকিতেন—"রতন।" রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, "কি গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্ট্‌মাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্ট্‌মাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্ট্‌মাস্টার ফস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে।

পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্ট্‌মাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্য-ক্রমে পোস্ট্‌মাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্ট্‌মাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমনকি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্ট্‌মাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্ট্‌মাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্ত-সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্ট্‌মাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্ট্‌মাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রতন।" রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্ট্‌-মাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই

যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্ট্‌মাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যাদিনের মতো যথা-সাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্ট্‌মাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল— 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্ট্‌মাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্‌ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্ট্‌মাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্ট্‌মাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্ট্‌মাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্ট্‌মাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্ট্‌মাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্ট্‌মাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্‌টপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চট্‌পট্‌ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্ট্‌মাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্ট্‌মাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্ট্‌মাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল—'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্ট্‌মাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্ট্‌মাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্ট্‌মাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্ট্‌মাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"—বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্ট্‌মাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট্‌আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

* ১২৯৮

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনও তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি

পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবাটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্‌ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক, শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া, রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের

ছিদ্র দিয়া দেখা গেল পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি, আয় আয়।' এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।'

বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন দুষ্টামি করিয়া, কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া, এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্য-মুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল—কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু—খোকাবাবু—লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার!'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না। কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে

তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চার দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাবু—খোকাবাবু আমার' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি নে মা!'

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মা-ঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।' শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, 'কেন! তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

২

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না— রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল— 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে

সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যেসকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল—সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্র-নিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালো-বাসিত; এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুৎখুৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৩

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, 'জয় হোক মা!'

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে?'

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।'

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।'

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—'

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে! কোথায় সে?'

'আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।'

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে! এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে!

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাই-

চরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব?'

কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা, থাক্‌। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।'

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।'

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।'

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।'

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু!'

'তবে কে?'

'আমার অদৃষ্ট।'

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।'

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

* অগ্রহায়ণ ১২৯৮

একটা আষাঢ়ে গল্প

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্যন্ত আরও অনেক-ঘর গৃহস্থ আছে, কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ; নহলা-দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু, চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই। সকলেই যথানির্দিষ্ট-

মতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়—বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলাফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ-মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারও কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি ঝট্‌পট্‌ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোনো-একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এক কালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত, গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত। এখন কেবল পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখি উড়িয়াছে কি মরিয়াছে কি জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য স্তব্ধতা এবং শান্তি। পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলই সুসংযত, সুবিহিত—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই, কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান-শব্দ-পূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্ব-কোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে, সেই বিদেশে, এক দুয়ারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপন-মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ওই দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা

সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মানিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়—কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, 'মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বলো।' মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন; বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, 'সাঙাত, পড়াশুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি; এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।'

রাজার পুত্র কহিল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।'

কোটালের পুত্র কহিল, 'আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।'

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, 'মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।'

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল, তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল, নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক-নৌকা শঙ্খ, চন্দনদ্বীপে গিয়া এক-নৌকা চন্দন, প্রবাল-দ্বীপে গিয়া এক-নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর-চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল তখন সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।

সব-কটা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্‌খান্‌ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথা-নিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগুলাও তাহাদের পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তর্ক উঠিল—এই-যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন

সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে।

প্রথমত, ইহারা কোন্ জাতি— টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা-নহলা?

দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোত্র— ইস্কাবন, চিঁড়েতন, হর্তন, অথবা রুহিতন?

এ-সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোরূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে— ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈঋতকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এত বড়ো বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্বে আর-কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ-সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্যন্ত অবাক। তিরি কহিল, 'ভাই দুরি, ইহাদের বাচ-বিচার কিছু নাই।'

দুরি কহিল, 'ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচ-জাতীয়।'

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল এখানকার মানুষগুলো কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা এক প্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা-কিছু করিতেছে তাহা যেন আর-একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুৎলাবাজির দোদুলামান পুতুলগুলির মতো। তাই কাহারও মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারি দিকে এই জীবন্ত নির্জীবতার পরমগম্ভীর রকম-সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ-হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এমনি একান্ত যথাযথ, এমনি পরিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া, ম্লান হইয়া, নির্বাপিত হইয়া গেল— চারি দিকের লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল, 'ভাই সাঙাত, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর এক দণ্ড নয়। এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।'

রাজপুত্র কহিল, 'না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মতো দেখিতে— ইহাদের মধ্যে এক-ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।'

৫

এমনি তো কিছুকাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগবাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না; বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে-একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য আছে ইহারা তদ্‌দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন?'

তিন বন্ধু উত্তর করিল, 'আমাদের ইচ্ছা।'

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মতো বলিল, 'ইচ্ছা! সে বেটা কে?'

ইচ্ছা কী সেদিন বুঝিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এ দিক আছে তেমনি ও দিকও আছে—বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল, বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ওই সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্বিকারমূর্তি বিবি এতদিন কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, নির্বাক্‌ নিরুদ্‌বিগ্নভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্ণে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মতো ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্ম ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধ নেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'একি সর্বনাশ! আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা মূর্তিবৎ—তাহা তো নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!'

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, 'ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধুর্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল, যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈর্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।'

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, 'সত্য নাকি সাঙাত!'

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ

হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিত ভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'বিবি, তোমার ভুল হইল।' শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবত-রক্ত কপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়, 'কিছু ভুল হয় নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।'

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল! তাহার গতিতে এ কী সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব-অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগুলা পর্যন্ত কেমন হইয়া গেল।

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে, কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা এক সুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে— আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গ-রাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গিতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারও বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারও ঈর্ষা, কাহারও অনুরাগ, কাহারও ব্যাকুলতা, কাহারও সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, 'সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার শ্রী নাই— আমার চাল-চলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।'

সাহেব ভাবিতেছে, টেক্কা সর্বদা ভারি টক্‌টক্‌ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে; মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!' বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আ মরিয়া যাই! গর্বিণীর এত সাজের ধুম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকম-সকম দেখিয়া লজ্জা করে!' বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায়, কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্তা হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলো পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া, শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া, অলসভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন-মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়—যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খ্যাপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্তের মতো ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখি ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্‌ঝর্‌ মর্‌মর্‌ করে এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্‌থম্‌ করিতেছে—কথা নাই, কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি—কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো—কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে; কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাঁশি আনো, তূরীভেরী বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি করো, হর্‌তনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।'

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দুরি তিরি তূরীভেরী লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাস্যে তুচ্ছ আলাপ! ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, লতায় বৃক্ষে, নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধুর স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্ব-দৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো

করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, যাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল; হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারানী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্বের মতো সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাম্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বেষ বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন, কেহ ভালো কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ কাহারও বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য-বিধান-মতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

* আষাঢ় ১২৯৯

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, 'বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?'

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই, সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। 'দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।'

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'বাবা, মা তোমার কে হয়?'

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, 'মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্ গে যা। আমার এখন কাজ আছে।'

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!'

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানব-সন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল— আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি

লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, তোমার লড়কী কোথায় গেল?'

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম— সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্‌ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, 'উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ? অমন আর দিয়ো না।' বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুই এ আধুলি কোথায় পেলি?'

মিনি বলিতেছে, 'কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।'

তাহার মা বলিতেছেন, 'কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি?'

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, 'আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।'

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই-যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে— যথা, রহমতকে দেখিবা মাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?'

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, 'হাঁতি।'

অর্থাৎ, তাহার ঝুলির ভিতর যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের

সুক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সুক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত— এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!'

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ— সে উল্‌টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?'

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, 'হামি সসুরকে মারবে।'

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী-পর্বত-অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে— পাগড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উটের 'পরে, কেহ-বা পদব্রজে, কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক— কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আর্‌সোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটি-

কতক প্রশ্ন করিলেন, 'কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই? একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব?'

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল, কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না সে দিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন দেখি মিনি 'কাবুলিওয়ালা' 'ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

এক দিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুই তিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারা-ওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে 'কাবুলিওয়ালা' 'ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?'

রহমত হাসিয়া কহিল, 'সিখানেই যাচ্ছে।'

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, 'সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব—হাত বাঁধা।'

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সাহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পুজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাস-বাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমন-কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্ব-জগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুং ঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, 'কী রে রহমত, কবে আসিলি?'

সে কহিল, 'কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।'

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ

দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, 'আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।'

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'খোখীকে একবার দেখিতে পাইব না?'

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা— ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক-বাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্‌ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল— তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, 'আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।'

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, 'এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্‌ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।'

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, 'আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে— আমাকে পয়সা দিবেন না।— বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।'

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক-টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে— যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম— তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।

আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে

ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?'

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না— রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে— তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে।

সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, 'রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।'

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসবসমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

* অগ্রহায়ণ ১২৯৯

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা-অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বল্‌ জ্বল্‌ এবং বাতাসে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বর আগমনসংবাদ বাড়ির কেহ

জানিত না, সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ-সমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল, তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না; অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃন্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত, ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-পূর্বক মৃন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যে দিন ঘাটে আসিয়া লাগে সে দিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমনকি, অনবকাশের

সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে, কিন্তু এক-একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর-একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয় সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে; সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক, দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ-অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, 'বি. এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না।' এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর-কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই; কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে

লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, 'আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।'

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশ-করা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া, সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া, রঙ করিয়া, খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া, একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার-প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোল-বিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন-মোচনে রাখাল খিল্‌ খিল্‌ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা-পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমনকি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই এক দিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া

তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী-সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বার্নিশ-করা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহু চেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া, প্যান্টলুন চাপকান পাগড়ি-সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুত বেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্বণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্ত দিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ-নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং 'হারমোনিয়ম-শিক্ষা' বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ রায়, বি. এ., কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, 'মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিন দিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু, তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ

করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানি-রূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল-ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয়-কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পুজোর সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া, সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, "এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা-অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত হৃদয়ে মৃন্ময়ী মনে করিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ি সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশুড়ি যে ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল, এ ঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ি মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃন্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্‌খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।"

মৃন্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু, অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ি মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়্ ফড়্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এসো আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃন্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী শাশুড়িকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই; বলে 'বাবার কাছে যাব'। অনাসৃষ্টি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি

যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃন্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্না-রাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্ দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্ঝম্ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থোলে কাঁধে করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো-না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানি নে।" এই বলিয়া ঘাটে-বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও! মিনু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মৃন্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত; সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্র-মাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তখন মৃন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-এক দিনের

জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।”

মা অপূর্বকে ‘ন ভূতো ন ভবিষ্যতি’ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, “মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?”

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, “যাব।”

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, “তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।”

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন-সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই-সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুনসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, “বাবা।” সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ

এবং যুবরাজমহিষী; এই-সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব লোকাভাব অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর-জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শন-পূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রু-গদ্‌গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ, নিস্তব্ধ অভিমান, লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, "বউয়ের কী করবে।"

অপূর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন, "না বাপু, কাজ নাই; তুমি তাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে 'তুই' সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্নকণ্ঠে কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃন্ময়ী কহিল, "না।"

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?"

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি.এ.-পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ম ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না।

"বোধ হয় দু-বৎসর কিম্বা তারও বেশি হতে পারে।"

মৃন্ময়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিন-মুখো রজার্সের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?"

মৃন্ময়ী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

মৃন্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু, অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল; কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো, তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃন্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপূর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল।

হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল— কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্ব-পত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।"

এ দিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই-যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।'

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পুষ্করিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, 'আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।'

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, 'মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই।' মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, 'তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন।' অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয়

পাইল না, ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্‌কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।' মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর-একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর-কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন, ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল, অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে-মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেক-দিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে।

তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া, বিষণ্ণ হইয়া, আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া, বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, 'মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।'—শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো?" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল, "সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা—" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশুনা—" ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভগ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁৎকে উঠতে পারে।"

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না— সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।"

দাদা কহিল, "না, বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে এক রাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপূর্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না, চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি। তা, আলো এনে দেব কি, দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না, দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখি নে।"

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুট-তুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

* আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পুজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা-বার্তা শুনিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রাশিয়ানরা যে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নব-পরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনও বিজ্ঞান বলে, কখনও বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনও পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ়

বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো-এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে—কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।—

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্প-বয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়-শত-সোপান-ময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, 'ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনও এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না।' আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, 'তথাস্তু।' এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম-প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে

থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ও পারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্ণের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এ পারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল—এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো-আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণ-কারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্তমনে কান

পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যা-ছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে—শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ক মসলা-সুগন্ধি রীতি-মত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-টুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড়্‌গড়্ শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট্ অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্র-শব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতিবৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুলশূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর এক প্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে

প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তর-স্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম— ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনও বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প্ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও কবিবরেরাই বলিতে পারেন কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল— ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম— ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লান-ভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না

বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপিচুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ড-শূন্যতা-ময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি -ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ জাগিয়া উঠে।

প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনও যাই নাই। সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য-আহ্বান-রূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্‌রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের এক প্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্‌-খাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচাঁদ

জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা-অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে 'তফাত যাও' 'তফাত যাও' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনও এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভি-সম্পাত করিতে থাকিতাম—আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবন্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ, মিথ্যা, এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যাণ্ট্‌লুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া—ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া—রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহু-কুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘর-গুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত, তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে, এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্‌রান রঙের পায়জামা, এবং দুটি শুভ্ররক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির-ফুল-কাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানির ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার

আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া— মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালীগিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে, যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত; কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম; আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত; এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না, কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লব-রাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদশাহের

ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল? সেখানে সে কী ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার! দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাব্‌শি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্‌ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্‌ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, 'তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়! সব ঝুঁট হ্যায়!' চাহিয়া দেখিলাম সকাল হইয়াছে; চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না—যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্‌ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম টম্‌টম্‌ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনি সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি; বলি, 'হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার

মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই; কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে?

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, 'তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়! সব ঝুঁট হ্যায়!'

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথা-নিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মেহের আলি, ক্যা ঝুঁট হ্যায় রে?'

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল, 'তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়! সব ঝুঁট হ্যায়!'

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।'

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি

পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই?'

বৃদ্ধ কহিল, 'একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।'

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট্ ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড্ ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

* শ্রাবণ ১৩০২

পুত্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন, সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধূর অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন, সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বুঝিতেন এবং পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞলোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও যখন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন পুন্নাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে এক প্রকার বিমুখ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎটাকেই তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুর্মূল্য বর্তমান, তাহার নববিকশিত যৌবন, বিনা প্রেমে বিফলে

অতিবাহিত হইয়া যায় এইটেই তাহার পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয় ছিল। পারলৌকিক পিণ্ডের ক্ষুধাটা সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল, মনুর পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়ের তিলমাত্র তৃপ্তি হইল না।

যে যাহাই বলুক এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর পিস্‌শাশুড়ির এবং অন্যান্য গুরু ও গুরুতর লোকের সমুচ্চ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জনের শিলা-বৃষ্টি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফুলের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুদ্ধঘরে রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বিনোদার বঞ্চিত যৌবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এই-সকল চাপাচুপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুসুমের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে পুৎনরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাট্টা-গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসুম যেদিন তাস খেলিবার সাথি না পাইত সেদিন তাহার তরুণ দেবর নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে এ-সব গুরুতর কথা অল্পবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত্র দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরূপে বিনোদার সহিত নগেন্দ্রের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নয়নমন পড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বুঝিতে কুসুম এবং বিনোদার কাহারও বাকি রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, কর্মফলের গুরুত্ব বোঝা অল্প বয়সের কর্ম নহে। কুসুম মনে করিত এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে ষোলো-আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিঞ্চন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ম ক্ষমতাটা একজন পুরুষ মানুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইরূপে তাসের হারজিৎ ও ছক্কাপাঞ্জার পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্‌-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দুপুরবেলায় বিনোদা কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুম তাহার রুগ্‌ণ শিশুর কান্না শুনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই বুঝিতে

পারিতেছিল না; রক্তস্রোত তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্‌বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরার মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছিল।

হঠাৎ এক সময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্রকর্তৃক এই অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমন সময় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গম্ভীরস্বরে কহিল, 'বৌঠাকরুন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।'

বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হ্রস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই সুদীর্ঘতর করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদূর নিরপরাধ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল না, নতমুখে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবির্ভাব-সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল, 'কলঙ্কিনী, তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।'

বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও করিল না।

তখন বিনোদা জানিত না যে, 'প্রজনার্থং মহাভাগা' স্ত্রী-জন্মের মহাভাগ্য সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলৌকিক সদ্‌গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন, তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবলই কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধূতে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদুলি জলপড়া এবং পেটেণ্ট্‌ ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙ্গের কঙ্কালজয়স্তম্ভ ধিক্‌কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তবু কেবল গুটিকতক অস্থি ও অতি অল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশুও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাঁহার

অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাঁহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অন্নে তাঁহার অরুচি জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরও একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন—কারণ, সংসারে আশারও অন্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ঐ কন্যার পুত্রস্থানে যেরূপ শুভযোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাবৃদ্ধির আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রস্থানের শুভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে একটা প্রচুরব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহুকাল ধরিয়া বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন 'আমার অন্ন কে খাইবে' তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, 'কী খাইব?'

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সায়াহ্নে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান খাইয়া খুরি সরা ভাঁড় এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে ম্যুনিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বল-মণ্ডিত দালানে একটি স্থূলোদর সন্ন্যাসী দুই সের মোহনভোগ এবং দেড় সের দুগ্ধ-সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড়করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজন-ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল, 'বাবু, দুটি খেতে দাও।'

বৈদ্যনাথ শশব্যস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!' গতিক মন্দ বুঝিয়া স্ত্রীলোকটি অতি করুণ স্বরে কহিল, 'ওগো, এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।'

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

* জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ-পটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থ-মূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, 'মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন?'

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মীকর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকুরের যেমন এক রকম বহুকালজীর্ণ সংস্কার-বিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, 'আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।'

'কী করা হয়?'

'ব্যাবসা করিয়া থাকি।'

'কী ব্যাবসা?'

'হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।'

'কী নাম?'

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'এখানে কী করিতে আগমন?'

আমি কহিলাম, 'বায়ুপরিবর্তন।'

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, 'মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।'

আমি কহিলাম, 'এ কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।'

তিনি কহিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন?'

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, 'এই বাড়িতে।'

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্ত-ধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল

আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চাল চলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টাণ্ট্‌-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র অগ্নিবাণ ও নাগপাশ-বন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা

হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল— ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর-কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলো ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা-কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল

কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকরনার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা— ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া-চিরিয়া চুনিয়া-চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসামান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না। এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরুদুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন। একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়— এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী-নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্ধুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত

না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিট-কয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখ-দেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্‌ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন-সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল

কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন? তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু-কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী?'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল—অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক,

যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়?'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।'

মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে, কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-স'কে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল। ভালো বাংলা লিখিল না, কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ! আমাকে আজিও চিনিল না!

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে—বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।'

আরও শতাব্দী-পাঁচ-ছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি!

দিন-দশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্‌ করিয়া একটা ঘা লাগিল! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যাবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি! এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল— কোন্‌ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্‌ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল— বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্-স্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্ত-রচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যাণ্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো। যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প্ সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ-মুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী। সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জড়-সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো; তোমার জিনিস-গুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো—এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিকষপাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া-ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া-ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরও একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে

গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধদ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠান্ডা, এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরও একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের

ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবল-বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-গুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসব-জাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে : সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শয়নকক্ষের

দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে, প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কংকালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজু-বন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি! আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে-দুটি আয়ত-সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্ব-শরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোওয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোওয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্‌ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডাল-পালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র

ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাক্‌ভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিক ক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেক ক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?'

তিনি কহিলেন, 'না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—'

আমি কহিলাম, 'দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।'

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, 'আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল?'

আমি কহিলাম, 'নৃত্যকালী।'

* অগ্রহায়ণ ১৩০৫

ফেল

লেজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম। প্রাচীন হালদার-বংশ দুই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারও মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, এক-বয়সি, এক ইস্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শখ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্‌ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মশলা ও কুলপির বরফ, লাঠিম ও মার্বল্‌গুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের

স্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইস্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাস্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে এক ঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি. এ. উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্‌ট্রান্স্‌-ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এন্‌ট্রান্স্‌-ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন আংটি বোতাম ঘড়ির-চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্‌মক্‌ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এন্‌ট্রান্স্‌-ফেলের জুড়ি চৌঘুড়ি বি. এ. পাসের এক ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলার ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সব চেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না, পাছে আরও ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারও ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমা-সুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশি লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন কহিল, 'যিনি যাই করুন, ফস্‌ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা পূর্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।'

কথাবার্তা তো প্রায় এক প্রকার স্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসী-চাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, 'দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।'

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধূর জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, 'খবর নিতে হচ্ছে তো।'

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্‌ছড়্‌ শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া

আসিয়া কহিল, 'কলকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।'

নলিনের বুক দমিয়া গেল; কহিল, 'বল কী হে!'

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, 'খাসা মেয়ে।'

নলিন বলিল, 'এ তো দেখতে হচ্ছে।'

পারিষদ বলিল, 'সে আর শক্তটা কী?'

বলিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে ততই বোধ হইতে লাগিল, মেয়েটি রাওলপিণ্ডজার চেয়ে ভালো দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন ঠেকছে হে?'

হাজরা কহিল, 'আজ্ঞে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।'

নলিন কহিল, 'সে ভালো কি এ ভালো?'

হাজরা বলিল, 'এই ভালো।'

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশি ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্ষভাবে চিত হইয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে কহিল, 'ওহে হাজরা, কী করা যায় বলো তো।'

হাজরা বলিল, 'মহারাজ, শক্তটা কী?'

বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, 'তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন, 'তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্বমাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভ-বিবাহ সত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, 'বি. এ. পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা! এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়ো-বাবু ফেল।'

অনতিকাল পরেই ননীগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে হলুদ।

নলিন কহিল, 'ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।'

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে

কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, 'আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল! শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল!' ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, 'এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছ।'

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোটোখাটো সমস্ত খুঁত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল— 'বাহবা, অপরূপ রূপমাধুরী! এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এতবড়ো গাধা!'

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, 'দরোয়ান!'

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল। বাবু হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'অব্‌হি ইস্কো কান পকড়্‌কে বাহার নিকাল দো।'

* আশ্বিন ১৩০৭

রাসমণির ছেলে

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই— শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়াপরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া

তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন-কি, তাহার বড়ো ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল, এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন-কি ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে, ইহা গ্রামের লোকের কাহারও ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু, শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতা-বশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, 'বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদের, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কী?'

শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের 'পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মতো থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনো-দিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না; কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, 'খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে, তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।'

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন—তাহার যে কোনো-একটা জায়গায়

জোড় আছে এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায়, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'খুড়ামহাশয়, কাণ্ড কী? আপনি এত ভাবিতেছেন কেন? বিষয়ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।'

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, 'সত্য নাকি! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।'

তারাপদ কহিলেন, 'বিলক্ষণ! জানেন না তো কী! দেশসুদ্ধ লোক জানে, পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন— সেই ভাবেই তো এপর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।'

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বাড়ি?'

তারাপদ কহিলেন, 'ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।'

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া তাঁহার ঔদার্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনো-দিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'ওমা, সেকি কথা! আলন্দি তালুক তো আমার খোর-পোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম— তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন!'

ভবানী কহিলেন, 'তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর-কিছু দেন নাই।'

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, 'সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন? কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।'

সিন্দুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে, কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে, নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে, তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, 'উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।'

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য—সামান্য দুটো-একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর, আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র, কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন, 'ভারি জিতিয়াছি।' তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয় পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মতো বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল, ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন মা। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বারবার করিয়া বলিতেন, 'ধর্মে ইহা কখনোই সহিবে না।' ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, 'আমি আইন-আদালত কিছুই বুঝি না; আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।'

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাসবাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনার জিনিস। সতীসাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল—কারণ, মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরও অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই-যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই-যে পূর্বেকার চাল-চলনের ব্যত্যয়, এ যেন দু দিনের একটা অভিনয়মাত্র—এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেক কালের ধুমধাম চলিল না, নমোনমো করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, ইহারা জানে না এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য—তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কতবার

পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু-ভৃত্যে ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-কি কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপর বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্‌বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক-একবার চঞ্চল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে, নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শখ ছিল— বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন— কিন্তু যাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে— স্বয়ং স্বর্গীয় কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্বাণপ্রায় কুল-প্রদীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। 'এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না' ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না, প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্‌বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন; ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব-বংশে তাঁহার স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত— চৌধুরীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন; বলিতেন, 'আমি গরিবের মেয়ে, মান-সম্ভ্রমের ধার ধারি না; কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্‌, সেই আমার সকলের চেয়ে

বড়ো ঐশ্বর্য।' উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল, এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই-একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা, এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগমাত্র করিতেন না; উপস্থিত প্রয়োজনেই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিতের দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারও কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ, এ সংসারে সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহা-বৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনি আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকা ফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রান্নাঘরের ধোঁওয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে; আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন, আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি করাইয়া লওয়া, তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, টানাটানি করিয়া, দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে, অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন, অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহ্মত্র অল্পস্বল্প যা-কিছু এখনও বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা-আদায়ের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এত কষাকষি কোনোদিন ছিল না—ভবানী-চরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উল্টা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা

তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখনো কখনো মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমানুষিয়ানার কিছুই বোঝেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া, ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া, ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্, তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে, সে বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই—এই তাঁহার অকর্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলোর ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন, এবং পুরুষ-মণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন—সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এপর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু, কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, 'বেচারা করিবে কী, উহার দোষ কী, ও বড়োমানুষের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর তো উপায় নাই।' এইজন্য, তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে

দিতেন না—হয়তো বলিতেন, 'ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!' বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্‌কার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন—ভবানীচরণ তখন তাঁর প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানীচরণ অম্লানমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর—তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—'নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে যে খুশি আসে যায়, কে চুরি করিয়া লইয়াছে।'

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু, নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাঁহারই গর্ভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপে শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মুশকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবল পক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায়, এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়!

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড়-জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুশি হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জানে না—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক?' কিন্তু, ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই

ভবানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থসমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যাবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালী, ছিপ ছড়ি ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা-পাড়-ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নর-নারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই-সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মূর্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন্-এক জায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে। এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারির মতো তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন।

রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, 'পাগল হইয়াছ!'

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'আচ্ছা দেখো, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও, সেটার তো প্রয়োজন নাই!'

রাসমণি বলিলেন, 'প্রয়োজন নাই তো কী!'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'কবিরাজ বলে উহাতে পিত্তবৃদ্ধি হয়।'

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, 'তোমার কবিরাজ তো সব জানে!'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'আমি তো বলি, রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।'

রাসমণি কহিলেন, 'পেট ভার করিয়া আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।'

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত—কিন্তু, সে দিকে ভারি কড়াক্কড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু, বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনো-

দিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্তিটি ভবানীচরণের দই পায়স ঘি লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন; তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামি পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, 'সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই—তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।'

জামিয়ারের চেয়ে অল্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না—কিন্তু সে জানিত, এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না—গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল?'

ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, 'রোস্—এখনই কী! সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক।'

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যতর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কী-একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।'

রাসমণি কহিলেন, 'বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন! ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কী যেন ভাবে।'

রাসমণি কহিলেন, 'ও একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দুষ্টামি করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।'

দুর্গপ্রাচীরের এ দিকটাতেও কোনো দুর্বলতা দেখা গেল না—পাথরের উপরে গোলার দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানী-চরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব কষিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন ক্ষুধা একেবারেই নাই।

এবার দুর্গপ্রাচীরে মস্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাক-নাম ধরিয়া বলিলেন, 'ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অর্ধেক চুরি করা হয়, তা জান!'

কালীপদ নাকী সুরে কহিল, 'আমি কী জানি! বাবা যে বলিয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।'

তখন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ, কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি, কত দুঃখ, তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই—তিনি যাহা করিতেন, খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন—কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া, এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন, তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গেল এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও এক রকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু, মেমের দিক হইতে মন এক মুহূর্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন; কঠোর স্বরে কহিলেন, 'তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর, যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।'

এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে, এমনি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'বাবা, আমার সেই মেম—'

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না; কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, 'রোস্ বাবা, আমার একটা কাজ আছে—সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে।'—বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রোশনচৌকিতে সকালবেলাকার করুণ সুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'মা, আমার সেই পাথা-করা মেম চাই না।'

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুপারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কী-একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি ফেলিয়া রাসমণি তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, আজও দধি-পায়সের সদ্‌গতি হইবে না, এমন-কি মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনই এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দধি পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনই এটা বাহির করিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেম-মূর্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, 'আজ রান্নাটা বড়ো উত্তম হইয়াছে। অনেক দিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর, দইটা যে কী চমৎকার জমিয়াছে সে আর কী বলিব!'

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখা-খাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের একঘেয়ে পাখা-নাড়ায় সে নিশ্চয়ই এক দিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত— কিন্তু অষ্টমীর দিনেই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গুরুপুত্রকে দুই টাকা নগদ দিয়া কেবল এক দিনের জন্য এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্স-সমেত পুতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই এক দিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেক দিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, 'কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।'

মা বলিলেন, 'সে তো ঠিক কথা বাবা! কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।'

কালীপদ কহিল, 'আমার জন্য কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।'

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষয়-সম্পত্তি যে কিছুই নাই, সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, 'কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।' কিন্তু, পুরুষানুক্রমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কী করিয়া কাহারও মাথায় আসিতে পারে, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, 'কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন— অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।'

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা, তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড়ো করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়, ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন, 'এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে।' সংসার-খরচ হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো পুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত

উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই—এমন-কি, হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পুল বাঁধা হইতেছে, এ-সমস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। 'শুনেছ ভায়া? গঙ্গার উপর আর-একটা যে পুল বাঁধা হচ্ছে—আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে।' বলিয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালো করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন। 'দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর-শেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!' গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, 'আমি বলে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই।' মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গঙ্গা যখনই যাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতায় কালীপদ বহু কষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া, পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা-উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না। সুতরাং, যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তবু পড়াশুনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক, সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক, তবু সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ-জাতীয় আত্মীয়কে

আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল—সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু, আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালোবাসে; কিন্তু আত্মীয়দের মুশকিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়—কাহারও সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারও সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে, অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়, তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো-লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতি-ঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু, শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল—এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিয়া খাইতে দিত না; দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালোবাসিত। কিন্তু, এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার-দেখানো, পাঁঠা-খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা—তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী শৌখিন সাবান এবং এসেন্স্ আর তারই সঙ্গে এক-আধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, 'তোমাকেই কিন্তু ভাই পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।' দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, 'আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ!' বলিয়া সব চেয়ে শৌখিন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত 'হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।' খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত—অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে

তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া, একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া, বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলার্‌শিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁষে নাই— এবং যদিও সে জানিত শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা এক মুহূর্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে, তবু কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তবু দূরে থাকিবে, শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়-চোপড় এবং মশারি-বিছানা যখনই দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনই সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো এবং সে দুইসন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই-একটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য দুই-চারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু, এই মুখচোরা মানুষের মুখ খুলিতে পারিল না। তার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপ্‌ধাপ শব্দ ও সবেগে গান বাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথা ধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত, তিন-চারি দিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা

কলিকাতা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন, কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে, এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ-ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত করিয়া সকলের লক্ষ হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার এক পাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতা-মেরামতওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।' কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।' 'এই-যে, এইখানেই আছে' বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ.এ. পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধুম করিয়া সরস্বতী পূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে, কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এপর্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। 'উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই, তবে উহার এত বড়াই

কিসের? ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!'

সরস্বতী পুজো ধুম করিয়া হইল— কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু, কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত— সকল দিন সময়মত আহার জুটিত না। তা ছাড়া, পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালোমন্দ কমবেশি সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথা ধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করিল না বটে, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরও একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্বেও বিনা ভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল, এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু, যথাসময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেক-কাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা ময়লা-কাপড়ে-বাঁধা মস্ত-পুঁটুলি-সমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা-আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত, তাহার অবর্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিসগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত— কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন; যে আধারে সেগুলি রক্ষিত সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসজ্জার কোনো লক্ষণ নাই; তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে— কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য। আগের বারে এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগুলিকে তক্তাপোশের নীচে পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালা-চাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, 'ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে— সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে, একেবারে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক্ অব বেঙ্গল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই, পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়না কোটটার লোভ সামলাইতে না পারি! ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নূতন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।'

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালি-খসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশরীর সংকুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বন্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে, তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, 'এবারে কালীপদ কোন্‌ সাত রাজার ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির করো।'

এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা। তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে, প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে, সেই অবকাশে জন দুই-তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তাপোশের নীচে হইতে আচার চাটনি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু, সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা-কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সমস্ত কাপড়-চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রায় তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো-হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্য কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় কালীপদর মতো যেন কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয়, তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোওয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কিরকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্তদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত, মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল, এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল, হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে, তাহার কাপড়-চোপড় সমস্ত উলট-পালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলো আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলার দুই-একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিসপত্র নাড়া-নাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোট-খানি— জীবনের কত মুহূর্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দুঃখের সংগী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহত্তম আশীর্বাদ পাইয়াছে, এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্র-মন্থন-করা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মতো মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, আর ঠিক তারই পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে— এও সেইরকম।

উপরের তলায় অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল, এ চোরের কাজ নয়। এক মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল, শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন ধনমদগর্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ— তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথা ধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে— সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের-ছাদ-ওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহ বা চৌকিতে, কেহ বা বেতের মোড়ায় বসিয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিল, 'দিন্‌ আমার নোট দিন্‌।'

যদি সে মিনতির সুরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জন করিয়া উঠিল, 'কী বলেন মশায়! কিসের নোট!'

কালীপদ কহিল, 'আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।'

'এত বড়ো কথা! আমাদের চোর বলতে চান!'

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মতো গুমরাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা এক-শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, 'দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসো গে যাও।'

সহচররা কহিল, 'পাগল হয়েছ! তেজটুকু আগে মরুক—আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্‌ন্‌ অ্যাপলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।'

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল। ভাবিল, হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী-যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-তিনবার ডাকিল, 'কালীপদবাবু!' কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়্‌ বিড়্‌ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, 'কালীপদবাবু, দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।'

দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না। কিন্তু, তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, 'দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।'

কেহ কেহ পরামর্শ দিল, 'পুলিস ডাকিয়া আনো—কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে! কাল যেরকম কাণ্ড দেখিয়াছি, সাহস হয় না।'

শৈলেন কহিল, 'না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো।'

অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, 'এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।'

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তক্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া, তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে; তাহার রক্তবর্ণ চোখদুটা খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেক ক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার আত্মীয় কেহ আছে?'

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন বলুন দেখি।'

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।'

শৈলেন কহিল, 'ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই— আত্মীয়ের খবর কিছুই জানি না। সন্ধান করব। কিন্তু, ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য?'

ডাক্তার কহিলেন, 'এ ঘর হইতে রোগীকে এখনই দোতলার কোনো ভালো ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।'

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত, প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুই তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিযত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি, আর-একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয়-আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল, তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং

তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্যন্ত পরম স্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোটো, তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, 'ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস। আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।' তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল, সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন-কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না। কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভনসত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভর্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

৪

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতিযত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখো যেন অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝ আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।' চৌধুরীবাড়ির বধূর পক্ষে হট্‌ হট্‌ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে, প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল— ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, 'এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।'

কিন্তু সে যে তাঁহাকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, 'জ্বর পূর্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।' কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না এ কথা ভবানীচরণ মনেই

করিতে পারেন না। বিশেষত, তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্যসাধন করিবে—সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে, এ কথা কে বলিবে? বিশেষত, কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এইপ্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, 'সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবতই বা কী!'

জ্বর কিছু-কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না—এ কোন্ ঘর। মনে হইল 'এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!'

তখন তাহার বেশি-কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সংকট উপস্থিত হইবে, সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

এক সময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; ভাবিতে লাগিল ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, 'আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন।'

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল, এই যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধুর মতো ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খুশিই হইত—কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি

দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তখন তাহার শৌখিন চাদরের সুগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত; তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তারেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁৎসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্যলোকের ঐশ্বর্যবিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না— আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল, ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাশা চলে। তাহাদের উভয় পক্ষের হাস্য-কৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুনদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুনদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনন্দ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায়, যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল— এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্‌ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান ছিল— কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃথা গর্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। 'আমরা গরিব' এ কথাটাকে কোনো 'কিন্তু' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্যের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু, সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল, তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত, শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহ-শালিনী ভ্রাতৃজায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারের গৃহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কী অজস্র আদরই তাঁহারা লুঠিয়াছিলেন— সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু, এই-সমস্ত সুখস্মৃতি-আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যাইবে এ সম্বন্ধে

তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই—তাঁহার সতীসাধ্বী মা'র কথা কখনোই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত, এটা তাহার পিতার একটা পাগলামি মাত্র। তাহারা মায়ে ছেলের এই পাগলামিকে আপসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে, কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, 'না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।' কিন্তু, এরূপ তর্কে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সেও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর-সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সামনেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী! কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত, 'তা, বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা তো তোমার ছেলেরই মতো, তারা তো তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম সুখের কথা?' শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে। অথচ, তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই, এ কথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু, এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না; অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত, এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত, কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ ফসকাইয়া গিয়াছে, আর তো সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল; এ সম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, 'বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও— সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।'

শৈলেনও বলিল, 'এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর, আমরা তো আছি।'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কৈ ভাই! বিশেষত তোমার ঠাকরুনদিদি যখন যেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াই-বার জো নাই।'

শৈলেন হাসিয়া কহিল, 'ঠাকুরদা, তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকরুনদিদিকে একে-বারে মাটি করিয়াছ।'

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাতবউ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।'

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদরযত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে— তাহার গা যেন আগুনের মতো গরম। কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, 'এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।'

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, 'দেখো ঠাকুরদা, তোমারও কষ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকরুনদিদিকে আনানো যাক।'

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক, একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করো।'

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পেঁাছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল— সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না— তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল, স্বামীর মধ্যে আবার দুইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল, 'আর আমার সয় না।' তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে 'দয়াময় হরি' বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই, তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালীর দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয়খণ্ড রয়াল-রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর— হায় হায়— তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি-যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল— জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোটো জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল— যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকা-লতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে— তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময়— পূজার সময়— কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। 'ওরে বাপ আমার!' বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃদ্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল।

বাহিরে বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল।

এমন সময় অন্ধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু, বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে— ও যে ভিজিবে— এই অসম্ভব

উদ্‌বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে— তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু, সে যেন মাথায় কালীপদরই মতো হইবে। 'এসেছিস বাপ!' বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার 'কালীপদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন, একটা পুরাতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কী ও?'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'সেই উইল।'

রাসমণি কহিলেন, 'কে দিল?'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।'

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কী হইবে?'

ভবানীচরণ কহিলেন, 'আর আমার কোনো দরকার নাই।'

বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, 'আমি বলি নাই কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?'

রামচরণ মুদি কহিল, 'কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এস্টেশনে এসে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর-দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল— আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী-একটা দেখিয়াছিলাম।'

'আরে দূর' বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

* আশ্বিন ১৩১৮

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, 'মৃণাল মেয়ে কিনা, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষে পেত?' চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকরা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি! তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পুজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে! মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন-কি সমস্ত পাড়ার, এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের

মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁতগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত। কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো? তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি। সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি— আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে, চিবিয়ে চিবিয়ে, খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সে দিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সে দিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো; অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তা হলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়-সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী? মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে এ আবার কোথাকার আপদ! আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো—

দেখলুম তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কত বড়ো অপমান! দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়!

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে, আমার কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে; ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না— রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যত দূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, 'মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।' আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল।

আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল!

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ

লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো সর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটি কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়; কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্য আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চার দিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল। হয়তো সে ঘামাচি, নয়তো আর-কিছু হবে—তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-এক দিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু, সেই দুই-এক দিনের সবুর সইবে কে? বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভাণ করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ—শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না; মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি—এত দিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, 'দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।' যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ

করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাব গাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্‌ স্বর্গ থেকে আসে! গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক-একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এ দিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন, সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনো রকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়ি-তল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না—কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফর্মাশ করলে, ও মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মোতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এ দিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই—তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় করো। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচো না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-

দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, 'বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।'

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, 'দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন!'

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'বিন্দু, তুই ভয় করিস নে—শুনেছি তোর বর ভালো।'

বিন্দু বললে, 'বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে?'

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব? আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে?

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে। কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, 'দিদি, বিয়ের আর পাঁচ দিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি?'

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম; কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজ-ভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, 'দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।'

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, 'জানিস তো বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই। বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'দিদি, আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?'

আমি বললুম, 'না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।'

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

'সত্যি বলছিস বিন্দি?'

'এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু, তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।'

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বৈ তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল, কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি—বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় ব'লেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, 'এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।'

তোমরা বললে, 'বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।'

আমি বললুম, 'ও কখনো মিথ্যা বলে নি।'

তোমরা বললে, 'কেমন করে জানলে?'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয় জানি।'

তোমরা ভয় দেখালে, 'বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।'

আমি বললুম, 'ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুনবে না?'

তোমরা বললে, 'তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি? কেন, আমাদের দায় কিসের!'

আমি বললুম, 'আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।'

তোমরা বললে, 'উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি?'

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব?

ও দিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে—কিন্তু, কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'তা, দিক থানায় খবর।'

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, 'ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব? তা, পাগল হোক, ছাগল হোক স্বামী তো বটে।'

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয় নি; সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল, কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন! তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ

করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল। তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ.এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, 'বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে শরৎ! বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।'

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে, কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে, তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, 'আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ?'

আমি বললুম, 'সেই যা সব-গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম— কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।'

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, 'বিন্দুকে আবার এনে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

আমি বললুম, 'বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।'

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাই-ফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম, অথচ কিছু করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, বিন্দু তার খুড়ততো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমার যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, 'যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।'

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, 'ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।'

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম, 'কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?'

সে বললে, 'না।'

আমি বললুম, 'রাজি করাতে পারলি নে?'

সে বললে, 'আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।'

যাক, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল— মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।

তোমরা বললে, এ-সমস্ত নাটক করা!

তা হবে। কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে। যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একটু ভেবেচিন্তে এমন একটা নতুন ধরণে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে। মরেছে বৈ তো না; বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সে জন্যে নয়।

কিন্তু, আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা

নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন ক'রেই ডাক দিক-না কেন, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে? তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে? কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা! কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত, আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু, মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল! কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া! কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে. মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু! তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

—তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন

মৃণাল

* শ্রাবণ ১৩২১

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পোঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু, আজ সমস্ত ভয়-ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ-যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোওয়াইয়া পথে দাঁড়াইব এটা তত কঠিন না— কিন্তু, আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুর্‌মার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না। এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পর্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মতো কিল্‌বিল্‌ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজ-ময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিতভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো-একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর-সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের

দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বাল্যলীলায় মস্ত যে-একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত— দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্‌ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত! পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত— কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায়; তার সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু, আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী-যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, 'অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জানো! ইহাতে পাপ হয়।' শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপর আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু যখন তার ছোটো বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, 'উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।'

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি

সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম, বি.এল.-পাস-করা একটি টাটকা মুন্‌সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব—আমি তো জানিতাম সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু, কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে এক দিনের মধ্যেই এই হাজার-লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু, বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে 'বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি'। খুব কষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস; সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজার-দর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি এক রকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু, অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমন-ভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর প্ল্যান এস্টিমেট এবং প্রস্পেক্টস লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু, বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। একে তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, 'বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।'

প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, 'ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।'

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, 'কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা, কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছেন— কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।'

তখন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকলপ্রকার ব্যাবসা পুরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, 'আমার সম্বল নাই যে।'

সে বলিল, 'বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী?'

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এত দিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, 'ঠাট্টা নয় দাদা! সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।'

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না; কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড় কাগজ কালী বোতাম সাবান যতই আনাই বিক্রি হইয়া যায়— একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার

মনের সেই রকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে-সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়, কোথায় কত দর, দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত, চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া এক-দম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লক্ষে কত লাভ হওয়া উচিত— কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালীতে, অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধুলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, 'মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ-সব কিছু-কিছু বুঝি; কিন্তু আজ হইতে, দাদা, তোমার সাক্‌রেদ হইলাম।'

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, 'যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য— মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।'

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই, কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, মুনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদ-বশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা, তার উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্‌ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু

সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেক দিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না, কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দারোয়ান পর্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু-কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম লোভের মতো রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে; কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, 'তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।'

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, 'অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।'

আমি বলিলাম, 'যেরকম দশা সিঁধ কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।'

প্রসন্ন কহিল, 'যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।'

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, 'দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চলো!'

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা! দুর্বলতার দিনে মানবপ্রকৃতির ভিতরকার সাবেক-কেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।

শুনিলাম আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু, এইবার বৃহস্পতি অনুকূল—এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু, সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, 'খোলো দেখি।' খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে

ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, 'আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন?'—এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব! চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, 'কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।'

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হইল?'

আমি বলিলাম, 'আজ আর সময় হইল না।'

সে কহিল, 'মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।'

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরিয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগ্য, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না

মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু, অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল— তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল, আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না। অনু জিজ্ঞাসা করিল, 'বউদিদি এলেন না?'

আমি বলিলাম, 'শরীর ভালো নাই।'

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, 'সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।'

আমি বলিলাম, 'অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখাশুনার কোনো ত্রুটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।'

অনু কহিল, 'এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, 'একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছু এ দিকে ও দিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর, যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা-কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।'

আমি কহিলাম, 'অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।'

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের

মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, 'আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে?'

অনু কহিল, 'আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।'

আমি কহিলাম, 'কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।'

অনু কহিল, 'আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।'

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, 'সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর, এই পান্নার কণ্ঠীটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।'

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল—আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমন নামিলাম দেখি প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা, খবর ভালো তো?'

আমি বলিলাম, 'এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।'

প্রসন্ন কহিল, 'কিন্তু—'

আমি বলিলাম, 'সে জানি না—যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।'

প্রসন্ন বলিল, 'তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসংকারে লাগিবে।'

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উল্টা। টিকার আগুন ধরিতে সময় লাগে, কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু—কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে, সুবোধের কাছে মুখ দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু, সুবোধের কী এক রকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না— যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সে'ই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ণ মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না; তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিস-পত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত— যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, 'এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ।' আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম।

আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল— সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানা রকম করিয়া কল্পনা করিত। জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী-একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি— সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়— হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায়, তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই, তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পঞ্চম বারকার বলাটাকে সৃষ্টি করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতায় গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকর-বাকর, কারও শান্তি ছিল না।

এ দিকে আমার পরিচিত যে-কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, 'সুবোধকে ডাকিয়া দাও।'

সে বলিল, 'সুবোধ শুইয়া আছে।'

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, 'শুইয়া আছে! এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!'

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, 'প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।'

সর্বদা আমার ফাই-ফর্মাশ খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এ দিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে; সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়; চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্মকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, 'বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।' যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, 'সে হচ্ছ তুমি, আলস্য-মহাসাগর।' পারৎপক্ষে সুবোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না; কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত

ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে! আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া! সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, 'টাকা পাই নাই।'

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'? নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে—কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালো-মানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে শয়তান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, 'টাকা বাহির করিয়া দে!'

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, 'না, দিব না, তুমি কী করিতে পারো করো।'

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনোমতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম, আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল—সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন, মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম! এ কী করিলাম! ভগবান, আমাকে এ কী বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কী দরকার ছিল! আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্‌ণ বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে; এই অন্ধকার যেন মুহূর্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন

একেবারেই ভাবিতে পারিল না। ধড়াস্‌ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কী সুন্দর তার মুখখানি, কী করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, 'আয়, বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!'

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না; ভাবিল আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না।

ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, 'এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল?'

আমি বলিলাম, 'আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।'

তিনি বলিলেন, 'এ তো এক দিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।'

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, 'বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েক দিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।'

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিন-রাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, 'এইটি তুমি রাখো।' বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

* ভাদ্র ১৩২১

শেষের রাত্রি

'মাসি!'

'ঘুমোও যতীন, রাত হল যে।'

'হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিলুম, মণিকে তার বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—'

'সীতারামপুরে।'

'হাঁ, সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতদিন ও রোগীর সেবা করবে! ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।'

'শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন!'

'ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—'

'তা সে নাই জানল—চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।'

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মত।

'বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।'

'হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—'

'বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।'

'ভাবছি আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।'

'সে কী কথা! যতীনকে একলা ফেলে যাবে! ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো?'

'ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—'

'তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী ক'রে!'

'আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে—শুনেছি ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—'

'তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু, যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন সে আমি ব'লে রাখছি।'

'তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—'

'তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে? কিন্তু, তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।'

'আচ্ছা, বেশ—তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—'

'দেখো বউ, অনেক সয়েছি—কিন্তু, এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।'

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিক ক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'একি সই, গোসা কেন?'

'দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।'

'ওমা, সেকি কথা! যাবে কোথায়! স্বামী যে রোগে শুয়ে আছে।'

'আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে। বাড়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন করে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি।'

'তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক!'

'তা আমি, ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।'

'তা, কী করবে শুনি?'

'আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।'

'ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে!—চললুম, আমার কাজ আছে।'

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে—এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, 'মাসি, এই জানলাটা আর একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।'

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ততীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা—সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, 'মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু, দেখো—'

'না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম—সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়।'

'মাসি!'

'যতীন, ঘুমোও বাবা!'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও। বিরক্ত হোয়ো না মাসি!'

'আচ্ছা, বলো বাবা!'

'আমি বলছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে। একদিন

যখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—'

'না বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।'

'মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো-একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—'

'ঠিক কথা যতীন!'

'সেইজন্যই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।'

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন— যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা— মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একটু চাহিতে শিখুক— মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।'

কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারী-দেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, 'আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো— সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি? কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে!'

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

'আমি ভাবছি, মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে?'

'অল্প বয়স কিসের যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো, বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে ক্ষতি হয়েছে কী! তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের?'

'মাসি, মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—'

'ভাবো কেন যতীন! মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য!'

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।

'মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?'

'নটা বাজবে।'

'সবে নটা? আমি ভাবছিলুম বুঝি দুটো তিনটে কি কটা হবে। সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন?'

'কালও সন্ধ্যার পর এই রকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।'

'মণি কি ঘুমিয়েছে?'

'না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়।'

'বলো কী মাসি, মণি কি তবে—'

'সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে!'

'আমি ভাবতুম, মণি বুঝি—'

'মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়? দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।'

'আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম তোমারই হাতের তৈরি।'

'কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়! তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে ক'রে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত! ও তো তাই চায়।'

'মণির শরীর বুঝি—'

'ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কিনা, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।'

'মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী করে!'

'আমাকে ও বড্ডো মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়—ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।'

আকাশের তারাগুলি যেন করুণাবিগলিত চোখের জলের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস করিয়া যতীন বলিল, 'মাসি, মণি

যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—'

'এখনি ডেকে দিচ্ছি বাবা!'

'আমি বেশি ক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—'

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এ দিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না? পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না? কিন্তু, পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়; কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে— কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ-মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনের এমনতরো নিরালা পাঁচ-মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে!

৩

'একি বউ, কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'সীতারামপুরে যাব।'

'সেকি কথা! কার সঙ্গে যাবে?'

'অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।'

'লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।'

'টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ্ করা হয়ে গেছে।'

'তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো— আজ যেয়ো না।'

'মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী?'

'যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।'

'বেশ তো, এখনো সময় আছে— আমি তাঁকে বলে আসছি।'

'না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।'

'তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন— আজ যদি না যাই তো চলবে না।'

'আমি জোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ এক দিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বোসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।'

'তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।'

'না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিন্তু, যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে —ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।'

'মাসি, তুমি অমন করে শাপ দিয়ো না বলছি।'

'ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।'

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু, ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, 'এই এক কাণ্ড করে বসেছে!'

'কী হয়েছে? মণি এল না? এত দেরি করলে কেন মাসি?'

'গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে বলে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কী, আরও তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ঠাণ্ডা করে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।'

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

'মাসি!'

'কী বাবা?'

'আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।'

'না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় এ কথা আমি মনে করি নে।'

'মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।'

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষত্র-বেদীর উপরে সে বসিল; নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, 'এত দিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল। অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

৪

'কষ্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার বলে মনে হচ্ছে না—এ দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি মাসি!'

'পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন?'

'আমার মনে হচ্ছে, মাসি, মণিও যেন চলে গেছে—আমার বাঁধন-ছেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।'

'বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।'

'আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে। সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমার দেখবার দরকার নেই যতীন!'

'মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—'

'সে আবার কী কথা! আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।'

'কিন্তু, এই বাড়িটা—'

'কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।'

'মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—'

'সে কি জানি নে যতীন! তুই এখন ঘুমো।'

'আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি! ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।'

'সেজন্যে অত ভাবছ কেন বাছা!'

'তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—'

'ও কী কথা যতীন! তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব! আমার এমনি পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি বাপ!'

'কিন্তু, তোমাকেও আমি—'

'দেখ্ যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি!'

'মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—'

'দিয়েছিস যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভরে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুক-মুলুক—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।'

'তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু, মণির বয়স অল্প, তাই—'

'ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে! ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—'

'কেন ভোগ করবে না মাসি!'

'না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।'

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, 'এমনিই বটে—আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত বড়োই ফাঁকি।'

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।'

'কম কী দিয়ে যাচ্ছ বাছা! এই ঘরবাড়ি-টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনোদিন বুঝবে না? যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।'

'আর-একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল—আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'এসেছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে বসে বসে অনেক ক্ষণ বাতাস করে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।'

'আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে—দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়েছে—ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ—ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি, নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।'

'বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'না মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।'

'জানিস যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।'

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

'কিন্তু মাসি, আমি তো জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না— সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।'

'মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে! তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।'

'তা, ভুল থাক্-না। ও তো প্যারিস এক্জিবিশনে পাঠানো হবে না— ভুল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।'

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

'মাসি, ডাক্তার বুঝি নীচের ঘরে?'

'হাঁ যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।'

'কিন্তু, আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো ওতে আমার ঘুম হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো করে জেগে থাকতে দাও। জানো মাসি? বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল— কাল সেই দ্বাদশী আসছে— কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন? বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের বলেছে আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে— তা হলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি।— মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভরে উঠেছে আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে

যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলুম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না—না মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল?'

'ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখনো বাকি আছে—আজ আর পারছি নে।'

'মণিকে ডেকে দাও—তাকে ব'লে দেব, কালকের রাতের জন্যে যেন—'

'যাচ্ছি বাবা! শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।'

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'ওরে, আয়—একবার আয়—আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্—সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।'

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'মণি!'

'না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন?'

'একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।'

'কাকে?'

'বউঠাকরুনকে।'

'তিনি তো এখনো ফেরেন নি।'

'কোথায় গেছেন?'

'সীতারামপুরে।'

'আজ গেছেন?'

'না, আজ তিন দিন হল গেছেন।'

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল—সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেক ক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, 'মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি?'

'কোন্ স্বপ্ন?'

'মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল—কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক করে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।'

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিঁকিল না। দুঃখ যখন আসে

তাহাকে স্বীকার করাই ভালো, প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

'মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভরে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।'

'বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয় তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্-না।'

'না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।'

'আর বকিস্ নে যতীন, বকিস্ নে—একটু ঘুমো।'

'তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।'

'ও তো একেলে নাম হল না।'

'না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে—সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।'

'তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।'

'মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর? আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?'

'বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্বল—সেইজন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে! কিছুই করতে পারি নি।'

'মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।'

'যাই বল, বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।'

'মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জবর্দস্তি করি নি—কোনোদিন এ কথা বলি নি 'যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব।' যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করলুম, মিথ্যাকে চাই নি ব'লেই এতদিন এমন করে বসে থাকতে হল—এইবার সত্য হয়তো দয়া করবেন। ও কে ও—মাসি, ও কে?'

'কই, কেউ তো না যতীন!'

'মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—'

'না, বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।'

'আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—'

'কিছু না যতীন—ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

'দেখুন, আপনি ওঁর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি

করে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।'

'না মাসি, না, তুমি যেতে পাবে না।'

'আচ্ছা বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।'

'না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে—শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।'

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না যতীনবাবু! সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—'

'সময় হল! মিথ্যা কথা! সময় পার হয়ে গেছে—এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন—বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথ্যাকেই না।'

'আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।'

'তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।—মাসি, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।'

'আচ্ছা, শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।'

'না মাসি, ঘুমোতে বোলো না—ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে।—তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে আসছে। এখনই আসবে।'

৫

'বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।'

'কে এসেছে? স্বপ্ন?'

'স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছে—তোমার শ্বশুর এসেছেন।'

'তুমি কে?'

'চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।'

'মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে?'

'সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।'

'না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়! ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি!'

'শাল নয় যতীন! বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে—ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।—অমন করে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে—এখন একটু-খানি চুপ কর্।'

* আশ্বিন ১৩২১

পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধু-বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন-কি তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কৌমার্যের লাস্ট্ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্ট্রেন্স্ পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিত-মশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা ব্রত; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই।—আমার তো কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ ক'রে, যত্ন ক'রে, তাঁর দিন কাটতে পারে। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যা-দায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারী হল। মা বললেন, মেয়েটি সুলক্ষণা—অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে পণ্ডিতমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবন্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার-বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, "সনু, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট—সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে—রঙ শাম্‌লা; ভুরুজোড়া খুব ঘন; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বললুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়, বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মাকে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ সূত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য-সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন, কিন্তু সাবিত্রীব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি; কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পুজোতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু, মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-

একটা আকারে খুব-একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যেরকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন, আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক্‌নোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে ব'সে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচছে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম, এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু, আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল; এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললুম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আল্‌মারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বললুম, 'আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে—সেটা আমি ধপাস্‌ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। আমি গিয়ে দেখলুম, তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম, কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বললুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নির্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এ দিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহূর্তে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে

এসে পেঁছিল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ ব'লে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন্‌ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদী ছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটি নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্‌লাসে প্রবল বেগে মামলা ডিস্‌মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান— এবং ছুটি ফুরোবার পূর্বেই মাতৃসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

২

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন— তার পরে আমার প্রতি বারে বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে— আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম. এ. পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল, এবার অর্থসাগর-মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডেপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার

এমন কথা ছিল না, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্‌সন্‌ এবং পেন্‌সন্‌ থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম. এ. পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব 'প্রাংশুলভ্য ফল'। এইজন্যে কন্‌ট্র্যাক্টরবাবু আমার প্রতি 'উদ্‌বাহু' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধুলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পেঁছিল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়; তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে অর্থ আমার মনে ছিল সে অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারি দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলা-ফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুর্‌গ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লুম। বাবা বললেন, শুভস্য শীঘ্রম্‌। আমি চুপ করে রইলুম; মনে মনে ভাবলুম, একটু দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর— সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না— কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভুরুটি এঁকে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে

কাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল্‌কির ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁর চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বললুম "মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বললুম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কী সনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বললুম, "মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার! এরই মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কী পেলি।"

আমি বললুম, "বুদ্ধি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায় ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জবর্দস্তি না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান-আহ্নিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত ক'রে, কাজ উদ্ধার ক'রে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, 'ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।' কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনোদিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন, তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর-কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে, পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন, তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার

সঙ্গে সহমরণে গেল— তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজম্‌টাই যে আইডিয়ালিজম্‌ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি, কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার ক'রে, অবলাজাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু, বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধা-বান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পা'কেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আজ্ঞে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে, কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যাবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক ঊন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল। আজ সেই কারবারে যে মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম, কিন্তু খবর পেয়েছিলুম কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিস্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পোঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু, পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ খেয়েছি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্‌ খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশকিল এই যে,

র‍্যাসেলস্ ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশশতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমি সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি-গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু, রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই-যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ ক'রে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্ত-চিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি অ্যাক্সেন্টের একটু খুঁত কিম্বা কাঁটা-চাম্চের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের-দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মালো; আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষ-মানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে, আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেছি ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি; কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি কোনো সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিশেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুত সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে

তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের-বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে, কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পণ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় ষত্বণত্বজ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তাঁর মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাহ্নকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরুশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চারি দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী।"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বুঝতে পারলুম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি, চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক, আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ— এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম, পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা ; যৌবনে স্ত্রী ; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ ; বার্ধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষ-

প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে অংশে মুলতুবি পড়েছে সে অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতি-বাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না', এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই।—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেড্-মাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল—এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে, সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুশি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিয়ে বসেছেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্যবিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সাধুলোক পাই কোথায়?"

তিনি বললেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেছে—না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি-শালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার!"

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেওয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ণ এবং বয়সও কম নয়—কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন, এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুঁতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃতস্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললুম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—"

"না দেখেই হবে।"

"কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি

যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে কারবারে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রি দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই—সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফ্যাশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?"

সে বললে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি—বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বললুম, "যে পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বললে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

আমি বললুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।"

বললুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-

ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, “আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?”

আমি বললুম, “আমি কাল সকালেই যাব।”

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ।’

এমন সময় কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছুতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, “যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।”

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি, কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয়, আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সময়মত বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম উপর-ওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো-একটা ক্লাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাতনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতিবাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

* পৌষ ১৩২৪

চোরাই ধন

মহাকাব্যের যুগে স্ত্রীকে পেতে হত পৌরুষের জোরে; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ন। আমি লাভ করেছি কাপুরুষতা দিয়ে, সে কথা আমার স্ত্রীর জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে; যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন ক'রে, অধিকাংশ পুরুষ ভুলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম হৌসে মাল খালাস ক'রে নিয়েছে সমাজের ছাড়চিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহার-ওয়ালার সরকারি প্রতাপ উপরওয়ালার দেওয়া তকমার জোরে; উর্দিটা খুলে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান; তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা ভালোরকম করে বুঝেছি সুনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ফুরোতে চায় না তার সমারোহ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্‌সার সরবৎ, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পাশেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইস্‌ক্রীমের যন্ত্রে জমানো, শাঁসে রসে মেশানো, তালশাঁস এক-পেয়ালা, আর পিরিচে একটিমাত্র সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশি কিছু নয়, কিন্তু বোঝা যায় দিনে দিনে নতুন ক'রে সে অনুভব করেছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন ক'রে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর, 'ইতরে জনাঃ' প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার, নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক যে বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুনেত্রার। ওর নিজের বয়স আটত্রিশ, কিন্তু সযত্নে সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।

সুনেত্রা ভালোবাসে শান্তিপুরে সাদা শাড়ি কালো-পাড়-ওয়ালা। খদ্দরপ্রচারক-দের ধিক্কারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে, কিছুতেই স্বীকার করে নি খদ্দরকে। ও বলে, 'দিশি তাঁতির হাত, দিশি তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, তাদেরই পছন্দে সুতো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিয়ে।' আসল কথা, সুনেত্রা বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে নূতনত্ব দেয় নানা আভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় ওর সাজে— আমি খুশি হই, জানি নে কেন খুশি হয়েছি।

প্রত্যেক মানুষেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমেয় রহস্যের অসীম মূল্য জোগায় ভালোবাসায়। অহংকারের মেকি পয়সা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। সুনেত্রা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম মূল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধ'রে। ওর শুভ্র ললাটে কুঙ্কুমবিন্দুর মধ্যে প্রতিদিন লেখা হয় অক্লান্ত বিস্ময়ের বাণী।

ওর নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর-কিছু হতে হয় নি সাধারণ জগতের যে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ ক'রে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনকে।

২

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাঙ্কের অন্যতম অধিনায়ক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। যাকে বলে ঘুমিয়ে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নয়। আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীর-মনের সঙ্গে এই কাজটা মানানসই নয়। ইচ্ছা ছিল, ফরেস্ট্ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বসি, খোলা হাওয়ায় দৌড়ধাপ করি, শিকারে শখ নিই মিটিয়ে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, 'যে কাজ পাচ্ছ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগ্যে।' হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হয়, পুরুষের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেয়েদের কাছে দামী। সুনেত্রার ভগ্নীপতি অধ্যাপক; ইম্পীরিএল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেয়েমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। যদি জংলি 'নিস্‌পেকেট্টর সাহেব' হয়ে সোলার হ্যাট প'রে বাঘ-ভালুকের চামড়ায় মেঝে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের গুরুত্ব কমিয়ে রাখত, সেই সঙ্গে কমাত আমার পদের গৌরব আর-পাঁচজন পদস্থ প্রতিবেশীর তুলনায়। কী জানি, এই লাঘবে মেয়েদের আত্মাভিমান বুঝি কিছু ক্ষুণ্ণ করে।

এ দিকে ডেস্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার যৌবনের ধারা আসছে ভোঁতা হয়ে। অন্য কোনো পুরুষ হলে সে কথাটা নিশ্চিন্ত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধি-বিস্তারকে দুর্বিপাক ব'লে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, সুনেত্রা মুগ্ধ হয়েছিল শুধু আমার গুণে নয়, আমার দেহসৌষ্ঠবে। বিধাতার স্বরচিত যে বরমাল্য অঙ্গে নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনায়। আশ্চর্য এই যে, সুনেত্রার যৌবন আজও রইল অক্ষুণ্ণ, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাঁটার মুখে— শুধু ব্যাঙ্কে জমছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদয়কে আর-একবার প্রত্যক্ষ চোখের সামনে আনল আমার মেয়ে অরুণা। আমাদের জীবনের সেই উষারুণরাগ দেখা দিয়েছে ওদের তারুণ্যের নবপ্রভাতে। দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে আমার সমস্ত মন। শৈলেনের দিকে চেয়ে দেখি, আমার সেদিনকার বয়স ওর দেহে আবির্ভূত। যৌবনের সেই ক্ষিপ্রশক্তি, সেই অজস্র প্রফুল্লতা, আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত দুরাশায় ম্লায়মান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেইদিন আমি যে পথে চলতেম সেই পথ ওরও সামনে, তেমনি করেই অরুণার মায়ের মন বশ করবার নানা উপলক্ষ ও সৃষ্টি করছে, কেবল যথেষ্ট লক্ষগোচর নই আমিই। অপর পক্ষে অরুণা জানে মনে মনে, তার বাবা বোঝে মেয়ের দরদ। এক-একদিন কী জানি কেন দুই চক্ষে অদৃশ্য অশ্রুর করুণা নিয়ে চুপ ক'রে এসে বসে আমার পায়ের কাছে মোড়ায়। ওর মা নিষ্ঠুর হতে পারে, আমি পারি নে।

অরুণার মনের কথা ওর মা যে বোঝে না তা নয়; কিন্তু তার বিশ্বাস, এ সমস্তই 'প্রভাতে মেঘডম্বরম্', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই সুনেত্রার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু

দ্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্নে ভোরের সুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বয়েস হোক আগে, তার পরে, ইত্যাদি। হায় রে, বিবেচনা করবার বয়েস ভালোবাসার বয়েসের উল্টো পিঠে।

কয়েকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রখর মুখরতা অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠস্বরের মতো হল বাষ্পাকুল। ওর মা জানত অরুণা আমার লাইব্রেরি ঘরে পরীক্ষার পড়ায় প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের সজল ছায়ায় জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, পুবে হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

সুনেত্রাকে কিছু বললেম না। তখনি শৈলেনকে লিখে দিলেম চায়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি। পাঠিয়ে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকস্মাৎ আবির্ভাব সুনেত্রার পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি শৈলেনকে বললেম, "গণিতে আমার যেটুকু দখল তাতে হাল আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠানো; কোয়াণ্টম্‌ থিওরিটা যথাসাধ্য বুঝে নিতে চাই, আমার সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অত্যন্ত বেশি অথর্ব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহুল্য, বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগোয় নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অরুণা তার বাবার চাতুরি স্পষ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য কোনো পরিবারে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি।

কোয়াণ্টম্‌ থিওরির ঠিক শুরুতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা—ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে বললেম, "জরুরি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পার্লার টেনিস খেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়াজ এল, "হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।"

আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতশো অমুক।"

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বাতি জেলে।

সুনেত্রা এল ঘরে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। আমি হেসে বললেম, "মিটিয়রলজিস্‌ট্‌ তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগ্‌নাল দিত।"

ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে সুনেত্রা বললে, "কেন তুমি শৈলেনকে অমন করে প্রশ্রয় দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রয় দেবার লোক অদৃশ্যে আছে ওর অন্তরাত্মায়।"

"ওদের দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমানুষিটা কেটে যেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমানুষির কসাইগিরি করতে যাবই বা কেন। দিন যাবে, বয়স বাড়বে, এমন ছেলেমানুষি আর তো ফিরে পাবে না কোনো কালে।"

"তুমি গ্রহনক্ষত্র মান' না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষত্র কোথায় কী ভাবে মিলেছে চোখে পড়ে না, কিন্তু ওরা দুজনে যে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই।"

"তুমি বুঝবে না আমার কথা। যখনি আমরা জন্মাই তখনি আমাদের যথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মোহের ছলনায় আর-কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীত্ব। নানা দুঃখে বিপদে তার শাস্তি।"

"যথার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।"

৩

আর লুকোনো চলল না।

আমার শ্বশুর অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চতুষ্পাঠীর আবহাওয়ায়। পরে কলকাতায় এসে কলেজে নিয়েছেন এম.এ. ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি ব্যুৎপত্তি। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈয়ায়িক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিদ্ধ; আমার শ্বশুরও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনক্ষত্রের উপর, একরকম গোঁড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে সুনেত্রা; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আমি ছিলুম অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সুনেত্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার সুযোগ হয়েছিল বারবার। সুযোগটা যে ব্যর্থ হয় নি সে খবরটা বেতার বিদ্যুদ্‌বার্তায় আমার কাছে ব্যক্ত হয়েছে। আমার শাশুড়ির নাম বিভাবতী। সাবেক কালের আওতার মধ্যে তাঁর জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষত্র তিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইষ্টদেবতাকে। এ নিয়ে স্বামী একদিন ঠাট্টা করাতে বলেছিলেন, "ভয়ে ভয়ে তুমি পেয়েদাগুলোর কাছে সেলাম ঠুকে বেড়াও, আমি মানি স্বয়ং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও যা, না থাকলেও তা; লাঠি-ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেয়াদার দল।"

শাশুড়ি-ঠাকরুন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই ব'লে দেউড়ির দরবারে গিয়ে নাগরা জুতোর কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না।"

আমার শাশুড়ি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ বুঝে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জায়গাটি। তোমার সম্মতি পেলে তার পরে পায়ে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে তোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।"

দিলেম এনে। তিনি বললেন, "হবার নয়। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেয়েটিও তার বাপেরই শিষ্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মেয়ের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জন্যে নক্ষত্রলোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বললেম, এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সঙ্গে লড়াই করব কী দিয়ে।

এ দিকে মেয়ের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেয়ে জিদ ক'রে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে বুঝলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা বুঝলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, "সুনেত্রার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দুঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অঙ্কজাল থেকে সুনেত্রাকে উদ্ধার ক'রে আনলেম। চোখের জল মুছতে মুছতে মা বললেন, "পুণ্যকর্ম করেছ বাছা।"

তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

৪

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। সুনেত্রাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পের ঝাপসা আভা এল অন্ধকার ঘরে। সোফার উপরে সুনেত্রাকে বসালেম আমার পাশে। বললেম, "সুনি, আমাকে তোমার যথার্থ দোসর ব'লে মান তুমি?"

"এ আবার কী প্রশ্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে; আমি বুঝি জানি নে?"

"এতদিন তো একত্রে কাটল আমাদের, কোনো সংশয় কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা কর যদি রাগ করব।"

"সুনি, দুজনে মিলে দুঃখ পেয়েছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা গেছে আট-মাসে। টাইফয়েডে আমি যখন মরণাপন্ন, বাবার হল মৃত্যু। শেষে দেখি উইল জাল ক'রে দাদা নিয়েছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার মায়ের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্রুবতারা। পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকোডুবি হয়ে স্বামীর সঙ্গে মারা গেলেন মেঘনা নদীর গর্ভে। দেখলেম, বিষয়বুদ্ধিহীন অধ্যাপক ঋণ রেখে গেছেন মোটা অঙ্কের; সেই ঋণ স্বীকার ক'রে নিলেম। কেমন ক'রে জানব এই-সমস্ত বিপত্তি ঘটায় নি আমারই দুষ্টগ্রহ? আগে থাকতে যদি জানতে আমাকে তো বিয়ে করতে না।"

সুনেত্রা কোনো উত্তর না ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দুঃখ-দুর্লক্ষণের চেয়ে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় হয়েছে।"

"মনে করো, যদি গ্রহের অনুগ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হয়, সেই ক্ষতি কি বেঁচে থাকতেই আমি পূরণ করতে পারি নি।"

"থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সঙ্গে এক দিনের মিলনও যে চিরবিচ্ছেদের চেয়ে বড়ো ছিল, তিনি তো ভয় করেন নি মৃত্যুগ্রহকে।"

চুপ করে রইল সুনেত্রা। আমি বললেম, "তোমার অরুণা ভালোবেসেছে শৈলেনকে, এইটুকু জানা যথেষ্ট; বাকি সমস্তই থাক্ অজানা, কী বল, সুনি।"

সুনেত্রা কোনো উত্তর করলে না।

"তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিলুম, বাধা পেয়েছি। আমি সংসারে দ্বিতীয়বার সেই নিষ্ঠুর দুঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মন্ত্রণায়। ওদের দুজনের ঠিকুজির অঙ্ক মিলিয়ে সংশয় ঘটতে দেব না কিছুতেই।"

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে যাচ্ছে। সুনেত্রা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললে, "কী বাবা শৈলেন! এখুনি তুমি যাচ্ছ নাকি।"

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, "কিছু দেরি হয়েই গেছে, ঘড়ি ছিল না, বুঝতে পারি নি।"

সুনেত্রা বললে, "না, কিছু দেরি হয় নি। আজ রাত্রে তোমাকে এখানেই খেয়ে যেতে হবে।"

একেই তো বলে প্রশ্রয়।

সেই রাত্রে আমার ঠিকুজি-সংশোধনের সমস্ত বিবরণ সুনেত্রাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"কেন।"

"এখন থেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

"কিসের ভয়। বৈধব্যযোগের?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুনি। তার পর বললে, "না, করব না ভয়। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে যাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে দ্বিগুণ মৃত্যু।"

১১ কার্তিক ১৩৪০

রবিবার

আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁঠি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাক্‌টিস করতে হয় না। এক দিকে পূজা-অর্চনা আর-এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল-পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচার-বাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে

থাকে ইঁটকাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল ক'রে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে, প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ম, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় বলে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জ্যাঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে 'গোলা খা ডালা'—দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন-কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়, কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারি ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্যে পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে বলে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে—তোর মুখ দেখব না।' এত বড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, 'মা, দেবতাকে অনেক কাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি, বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।'

মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, 'ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্ক্-নোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।'

অভীকের সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দুটি উল্টো জাতের শখ ছিল, এক কল-কারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ ক'রে বেগার খেটেছে অনেক দিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্ট্‌স্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট্‌, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল— আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট্‌ অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট্‌', ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়; তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার চেয়ে বেশি-সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বিরুদ্ধদলকে আখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে দুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের 'পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে, অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ করে মেয়েদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলেছে আর্টিস্ট্‌। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে, স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে— গা জ্বলে যায়।

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেল-কালী-মাখা নীলরঙের জামা-ইজের পরে বার্‌ন্‌-কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেড্‌মিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে ও মুসলমান হয়েছে; ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো? হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাত-বাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্ট্‌রূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমা-পরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বেআব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁওয়া জমল তার কালিমা আবৃত ক'রে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, পজিটিভ্‌লি ভাল্‌গর।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্‌-ঝক্ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে ইঙ্গিতে আভাসে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা বেশ একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোখে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়্হিড়্ করে টেনে নিয়ে এসে বললে, 'মাপ চাও।' মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আম্তা আম্তা ক'রে। তার পর থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্যই করে নি। বিভা লোকের কানা-কানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্চকর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, 'অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের, লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইন্‌স্ক্রুটেব্‌ল্।'

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ—এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, 'তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়ো, আমার লজ্জা করে।'

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, 'মরি মরি! তোমারই গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারই রূপে!'

অভীক বললে, 'মুখস্থ বিদ্যার দিগ্‌গজেরা জানেই না আমি কোন্ মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাস করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পাণ্ডিত দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই বুঝবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাকো চোখ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।'

এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হৈ-চৈ করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত।

কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথিতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্শেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালী কলমে একখানা আঁচড়-কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এখানে যে!'

অভীক বললে, 'সংগত কারণ দেখাতে পারি—কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।'

বিভা তার ডেস্কের চৌকিতে গিয়ে বসল; বললে, 'দরকার যদি হয় নাহয় চুরি করলে, পুলিসে খবর দেব না।'

অভীক বললে, 'দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নৈতি-দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।'

'অনেক ক্ষণ তুমি বসে আছ?'

'তা আছি, বসে বসে সাইকোলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে—তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস করো কী করে! এখনো সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।'

'আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে?'

'তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস করো আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে ব'লে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই, তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস করো-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পারো না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।'

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিক বাদে অভীক বলে উঠল, 'তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো? আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন?'

'আঃ, কী বকছ!'

অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্‌খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা এত ভক্তি সে আর-কোনো মানুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল; তিনি কেবলই খিট্‌খিট্‌ করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বড্ড বেশি ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে।' বিভা আশমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল; মা বলেছিলেন, 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত; তার বিয়েতে যেতে চাইলেই মা বলে বসলেন, 'সেখানে ম্যালেরিয়া।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরও গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেবা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে, কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল; বলেছিল, 'যাঁকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুরভাবে বাজে সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে!'

শুনে বিভা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি সুস্মি এসে বললে, 'পিসিমা, বেলা হয়েছে।'

বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, 'তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এখনি যাচ্ছি।'

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেই রকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপন-গড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকর-বাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, 'অন্যায় হবে তোমার এখনই যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, সুস্মির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন? ডোমিনিয়ন স্টাটস, অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই, কখনো তোমাকে কাজের কথা বলি নি। আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

বিভা বললে, 'তাই হোক, বাকি থাকে কেন?'

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কব্‌জিঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের-টুকরোর-ছিট-দেওয়া। বললে, 'তোমাকে বেচতে চাই।'

'অবাক করেছ, বেচবে?'

'হাঁ, বেচব— আশ্চর্য হও কেন?'

বিভা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললে, 'এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনো ওর মধ্যে ধুক্‌ধুক্‌ করছে। জানো সে কত দুঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে?'

অভীক বললে, 'এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখ ঘণ্টা বাজাতে থাকব।'

'আশ্চর্য করেছ তুমি। এই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—'

'এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত।'

'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।'

'ভুল বিশ্বাস করে নি।'

'তবে?'

'তবে আবার কী? সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে?'

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন?'

'কেননা, জানি তুমি দর-কষাকষি করবে না।'

'তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি?'

'তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।'

এমন মানুষের 'পরে রাগ করা শক্ত—জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ছেলেমানুষি। কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই যে উচিত-অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ৎসনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিঙ কাগজটার উপর খানিক ক্ষণ নীল পেন্‌সিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, 'আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না।'

উত্তেজিত কণ্ঠে অভীক বললে, 'ভিক্ষা? তোমার সমান ধনী যদি হতুম তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার ব'লে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, পুরুষের কর্তব্য আমিই বরণ করছি। এই নাও এই ঘড়ি, এক পয়সাও নেব না।'

বিভা বললে, 'মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই ব'লে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।'

'তবে শোনো—তুমি তো জানো, আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড্‌ গাড়ি আছে। সেটার চাল-চলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি ব'লেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।'

'কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে?'

'বিয়ে করতে যাব না।'

'এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে এ সম্ভব নয়।'

'ধরেছ ঠিক। তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—শীলাকে দেখেছ—কুলদা মিস্তিরের মেয়ে?'

'দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে-সেখানে।'

'আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে! ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে এইটেতেই ওর আনন্দ।'

'শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে তাতেও আনন্দ কম নয়।'

'আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুখে শোনালো ভালো। আচ্ছা, মন

খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।'

'সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মানো বুঝি?'

'নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল, তখন রামপ্রসাদ মাকে খাড়া ক'রে বলেছিলেন : তোমাকে মা বলে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না—মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।'

'নিন্দে কিসের?'

'বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলুম ফুটবলের মাঠ থেকে খড়্‌খড়্‌ শব্দ করতে করতে পিছনের পদাতিকদের নাসারন্ধ্রে ধোঁওয়া ছেড়ে দিয়ে। এমন সময় পাকড়াশি-গিন্নি—ওকে জানো তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়—সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চ'টে-যাওয়া গাড়ির হুড আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এরকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।'

'তাই বুঝি তুমি—'

'হাঁ, তাই ঠিক করেছি যত শিগ্‌গির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশি-গিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্যি করে বলো তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি—'

'আমাকে এর মধ্যে টানো কেন? বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর, আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।'

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে ব'সে তার হাত চেপে ধরে বললে, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন্‌দিন ফস ক'রে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনোকালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না! অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জানো—'

'চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার তুমি অট্টহাসি।'

অভীক বললে, 'আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারি শীলার সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকোলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অল্পবয়সে যেমন ক'রে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘুরত তবু ছাড়তুম না। মুখে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে সেটাতে

আমার ইন্‌স্‌পিরেশন। আমি আর্টিস্ট্‌। ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেন্‌জার্‌ সিগ্‌নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়। দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস— না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।'

'তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে?'

'তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্‌। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।'

'সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।'

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'জানি জানি— তুমি যাকে ঐশ্বর্য বলো তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।'

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, 'ওই এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উল্টোই শুনেছি। বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইন্‌স্‌-পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি পারতুম, আমার যদি সে শক্তি থাকত তা হলে—'

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, 'পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখু যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পারো নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে; কোনো বাধা মানতে না। তরী তীরে এসে পৌঁছয়, তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।'

'যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।'

'ও-সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা। স্বীকার করো 'আমাকে না হলে নয়' ব'লে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে?'

'এ কথা ব'লেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন? মনে যাই থাক্‌, আমি কাঙাল-পনা করতে চাই নে।'

'আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই. আমি তোমাকেই চাই।'

'আর সেই সঙ্গে বলবে : আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।'

'ওই তো, ওটা তো জেলাসি! পর্বতো বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁওয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তরগূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্‌ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিসুভিয়স।'

বলে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, 'হুর্‌রে!'

'এ কী ছেলেমানুষি করছ! এইজন্যেই বুঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান করে?'

'হাঁ, এইজন্যেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এমনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল ওটা।'

'কেমন করে জানলে? ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি—তুমি মাঝে-মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।'

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'এটা তো সুসংবাদ।'

বিভা বললে, 'অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।'

'এ তোমার কী রকম কথা হল! শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই? জাতকে-জাত যেখানে যাকেই দেখব শ্রদ্ধা ক'রে ক'রে বেড়াব? মাল-যাচাই নেই, একেবারে wholesale শ্রদ্ধা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাসুল চাপিয়ে দর বাড়ানো।'

'মিথ্যে তর্ক কোরো না।'

'অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে : দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু পুরুষরা রবে নিরুত্তর।'

'অভী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ। বেশ জানো আমি বলতে চাইছিলুম, মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা।'

'স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো, না, অস্বভাবত? আমরা মডার্ন্‌, মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ড্‌গাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড়হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হত স্বভাবকে।'

'অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামী করে তুলেছিলে, তাদের খেলো করো নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে সস্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন্‌ কালটাই খেলো।'

অভীক জবাব দিলে, 'খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে—যাকে বলে debunking। জন্মেছি একালে, বোম্‌ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদ্‌ঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে

আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশ্‌কারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই-যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালো লাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না? তোমরা কথায় কথায় যাকে বলো thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দ'লে ফেলা হয় না?'

'সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে *thrill*, যাকে বলে ecstasy সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস— ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেন্ডহ্যান্‌ড্‌ দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়— অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী?'

'তুমি পারো অভী, নিশ্চয় পারো; পুরো মূল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অদ্ভুত তোমার স্বভাব— ছেঁড়া জিনিসে ময়লা জিনিসে তোমাদের আর্টিস্টের একটা কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে। সুসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্‌গে এ-সব বৃথা তর্ক। আপাতত ক্রাইসলারের পালাটা যতদূর সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।'

এই বলে চৌকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, 'এই নাও তোমার ইন্‌স্‌পিরেশন, কোম্পানি-বাহাদুরের মার্কা-মারা। কিন্তু তাই বলে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।'

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুতপদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, 'আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে। আমার অভাব নেই, এমন সুযোগে—'

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, 'অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়!'

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'যা পারি নে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে?'

'না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।'

'রাগ করব কেন? তোমার দুষ্টুমি কত ক্ষণের? এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পারো না।'

'বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জানো তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাকো। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো-লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের সঙ্গে গলাগলির গদ্‌গদ দৃশ্য মাঝে-মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্বল স্ত্রৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের।

আর্টিস্ট্ খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।'

বিভা হেসে বললে, 'তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট্, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ তার খেলনাটি নাহয় আমার হাত থেকেই নেবে।'

'নৈব নৈব চ। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে?'

'খোলসা করে বললে হয়তো খুশি হবে না। তুমি জানো অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথামেটিক্‌স শিখছি।'

'সব-তাতেই আমাকে বহুদূরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?'

'বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্ট্রীদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্যমামা। নিজে তিনি গণিতে ফর্‌স্ট্‌ক্লাস মেডালিস্ট্। তাঁর বিশ্বাস, যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম হবেন। ওঁর কষা একটুখানি প্রব্লেম আইন্‌স্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খুব খুশি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্ট্‌ফান্‌ড থেকে কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।'

অভীকের মুখ কেমন এক রকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'এমন আর্টিস্ট্‌ও হয়তো আছে যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পেঁছিতে পারত।'

'কোনো সুযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পেঁছিতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।'

'খেলনার দাম?'

'হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী? তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।'

'ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড়্‌নড়্ করতে করতে চলুক। এখন ও-সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাবু শুনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।'

বিভা বললে, 'একান্ত আশা করি, তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।'

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, 'আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা করো আর না'ই করো। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়। আর্টের প্রমাণ রুচির পথে। সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রান্‌ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয় আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগ্নীকেও—'

'ভাগ্নীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সবুর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই

অসামান্য। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে?'

'সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।'

'তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।'

'থাক্ থাক্, ও কথা থাক্—কানে ঠিক সুর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন অর্ধেক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না!'

'পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।'

'কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পারো নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণ-সভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।'

বলেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'মিটিং আছে।'

'কিসের মিটিং?'

'ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপুজো করব।'

'তুমি পুজো করবে?'

'আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্যে আকাশ শূন্য হয়ে আছে।'

বিভা বুঝল বিভারই ভগবানের বিরুদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশ-নালিস্ট্। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখো। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।'

অভীকের নাস্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা-কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়: সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে খবর দিলে অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচ্ড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে অধ্যাপককে ব'লে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, 'আচ্ছা, এইখান নিয়ে আয়। বসতে বল্। একটু বাদেই আসছি।'

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কান্না।

অনেক ক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, 'আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।'

'শরীর ভালো নেই বুঝি?'

'না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।'

অধ্যাপক বললেন, 'আমার রক্তে এপর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ বছর কোপেন্‌হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্‌স্‌ কন্‌ফারেন্স্‌ হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এতবড়ো সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।'

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।'

অধ্যাপক একটুখানি হেসে বললেন, 'আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজি নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কষ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশ্বাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধি-ওয়ালারাও খোঁজে—ঠকাবার জো নেই কাউকে।'

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, 'যেখান থেকে হোক, বন্ধু একজনকে বের করবই—হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়—সেজন্যে ভাববেন না।'

দু-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিষ্পত্তি হল।

অমরবাবু লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া—মাথার সামনে দিককার চুল ফুর্‌ফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সঙ্গে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা—অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু ওঁর খুব অল্পই, কিন্তু যে-কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে 'হাইব্রাউ'। কথাবার্তা অল্প বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তাঁর সাইকো-লজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আট শো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনো তার ব্যত্যয় হয় নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্‌ দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাৎ অকাজের সমস্ত শাস্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই এক মুহূর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ

অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্‌পেগাড়ির মধ্যে ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙ্ঘন করে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস করে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্ল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ করে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এত ক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো-কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিক ক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারখানা কী। বললে, 'অসামান্যের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখো; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি অবলা নারী মৃণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে?'

'না, জানেন না।'

'জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না?'

'ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।'

'সে কথা বুঝলুম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়না আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামান্যই হই; কারও বিলেত যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়োই হোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা—এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার? ও-যে আমারও।'

'আচ্ছা, ওই হারটা নাহয় তুমিই নিলে।'

'তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবসুদ্ধ, সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি। ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর করো যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।'

'গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলেও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব? যাই হোক, কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।'

'অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি?'

'হয়েছে বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধূর জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।'

'আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধূর রাস্তা নেই?'

'ও কথা বোলো না। সজীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।'

'মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।'

'তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাবটাই হয় মারাত্মক। তখন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।'

'ওই যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্‌বন্ধন। প্রসঙ্গটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তবু সম্ভাবনার এত কাছ-ঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং তখন—

'আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব পরহস্তের অভাব নেই।'

'ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনালো না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী ব'লে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শুকিয়ে মরতে রাজি থাকো। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বুদ্ধিমানের মতো অভাব পূরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশকিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদবীটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরতে হয়। সাইকোলজি এখন থাক্, আমার প্রস্তাব এই—অমরবাবুর অমরত্বলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না। আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে? গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন?'

'ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।'

'এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্, অন্য এক সময় হবে। অমরবাবুর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের মানুষরা বড়ো-লোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো, আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল পুণ্যকর্ম করেছি।—দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফন্‌ডে। দিয়েছি কাউকে না ব'লে। যখন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে?'

'এ কী কাজ করলে অভীক! তুমি যাকে বলো তোমার পবিত্র নাস্তিক ধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য! এ যে বিশ্বাসঘাতকতা।'

'মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল করে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে বলে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি-হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে, আর লাউকুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে খড়্গাঘাতে। নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে না জানিয়ে

ওদের একজন সাজল সাধুবাবা, পাঁচজন সাজল চেলা, কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে তার যে ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে, জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরো বছরের পুজো না পেলে মা তাকে আস্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শুনলুম সেইদিনই টাকাটার সৎকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল, কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে কবুল করলুম আমার কন্‌ফেশনাল। পাপ কবুল করে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছি কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্য।'

সুস্মি এসে বললে, 'বচ্‌চু বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তারবাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন দেখে দাও-সে।'

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, 'বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্‌বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে সুস্থ তাদের মনে করবার সময় পাও না?'

'বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতিসুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জন্যেই এত করে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই। তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখো।'

'আর আমার লোভ কে সামলাবে?'

'তোমার নাস্তিক ধর্ম।'

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে—তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল—ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে; কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্‌কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টিমারের-ছাপ-মারা। অভীক লিখেছে—

'জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তবু বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই ব'লে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট্‌ এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরদুঃখের কথা, কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

'অনেক মূঢ় আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল, তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে—তার সঙ্গে হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস অসন্দিগ্ধ সত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দুঃসাধ্যসাধনার পথে চলেছি।

'এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না—কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমানুষ—যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভর্তি করে নিয়ে চললুম সমুদ্রের পারে। আর নিলুম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একখানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা করো, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো—তোমার কাছ থেকে চলে আসার দারুণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।

'তুমি মনে মনে কখনো আমাকে ঈর্ষা করেছ কি না জানি নে। এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেণ্টিমেণ্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গম্ভীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার দুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি বলে অনেক খুঁৎখুঁৎ করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ এ কথার মতো এত-বড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনো হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেইজন্যেই আর-কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাও নি, কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতি ক্ষণে যা তুমি দান করেছ এই নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি—বলেছে, 'অলৌকিক!'

এরই আকর্ষণে কোনো এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

'বী, আমার মধুকরী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালো-বাসার কোনো একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে ব'লে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব—তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনো না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত
অভীক'

* আশ্বিন ১৩৪৬

চতুরঙ্গ

জ্যাঠামশায়

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি.এ. ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে। তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু, একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল—আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরও তেজের সঙ্গে বলিলাম, 'আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না।' তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি তো ভারি অভদ্র লোক হে!'

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদীঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কী যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কী।

শচীশ বলিল, 'যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া লাভ কী?'

আমি বলিলাম, 'তবু দেখুন, মিথ্যাবাদীকে—'

শচীশ বাধা দিয়া বলিল, 'ওরা তো মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে কাজ করিতে পারে না। শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামি কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গর্‌গর্‌

করিতে করিতে আসিয়া বলিল, 'বাবু, ও বেটার কাঁপুনি-টাঁপুনি সমস্ত বদমায়েশি।' আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা; তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা কোনো দামি কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে, সেটাতে আমার অধিকার নাই; আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।'

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, 'এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য?'

শচীশ বলিল, 'হাঁ, আমি নাস্তিক।'

আমার মাথা নিচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধি-ধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতি হিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না, আমি কোনো জন্মে সোনার-বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে। ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্‌ আমাদের কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালি ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা ইহাই তাঁর ধারণা; এইজন্য মিল্‌টন শেক্‌স্‌-পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন মার্জারজাতীয় চতুষ্পদ : a quadruped of feline species । কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, 'শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব। তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।'

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রঙ কটা আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল; সাহেব বলিয়াছিলেন, 'তোমরা বুঝিবে না।' তারা যে নাস্তিকতাচর্চারও অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা

সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যাবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন—

'ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া;

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই;

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, ঈশ্বর নাই;

অথচ, তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে, ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।'

বালকবয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যাল্‌থস্ পড়িয়াছিলেন; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোটো ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের এমনি উল্টা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারে বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমনি বিপরীত—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর-জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরুপুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড়ো বয়সে তাঁর আর ব্যামো ছিল না; কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল, সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবি করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এই ভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্পবয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবাযত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, সকলের হইতে তাঁর আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায়, এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন। থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন—গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উল্টা দিকে। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ওই ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা, জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝরনার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছল্‌ছল্‌ করিত; তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না—সকাল-সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কান্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকান্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তাঁর সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন—

'মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না তুমিও জান না, অতএব ওটা বাজে কথা। তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ—যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা

উচিত না। তার পরে, ওই অংশটা হাতও নয়, কানও নয়; ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি। তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণ সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয় সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।'

এমন-সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, 'বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।'

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু মাছ তখন টোপও গিলিয়াছে, বঁড়শিও তাকে বিঁধিয়াছে; তাই এক পক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন; দাদার সম্বন্ধে রঙবেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না; মুরগি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন; কিন্তু ইঁহারা এত দূরে গিয়াছিলেন যে, মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি।—

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা; সেই ভালো করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের' ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই— তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিশের বিজ্ঞাপন বা চোখরাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী?' তিনি বলিতেন, 'কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ।' তিনি শচীশকে বলিতেন, 'দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।'

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উল্টা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, 'তুমি পেট-মোটা পুরুত-পাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক, তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।'

বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেশকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?'

শচীশ কহিল, 'আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।'

পুরন্দর রাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, 'কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।'

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, 'তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না— আমার ঠাকুরের ভোগ আমি এক-দিন দিব ইহাতে বাধা দিয়ো না।'

'তোমার ঠাকুর?'

'হাঁ, আমার ঠাকুর।'

'তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?'

'ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়— তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।'

'তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?'

'হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি; দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।'

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, 'ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।'

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভীতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না। শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইঁহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী আচারভ্রষ্ট এবং সেই কারণে সেবায়েত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু

করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন—তিনি দেবদেবী মানেন না, খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না, মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুন্‌সেফ জগমোহনকে সেবায়েত পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিঁকিবে না। জগমোহন বলিলেন, 'আমি আপিল করিব না। যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।'

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, 'খাইবে কী?'

তিনি বলিলেন, 'কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।'

এই মকদ্দমা-জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু, পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাকঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপারখানা কী হে!' জগমোহন বলিলেন, 'আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা।' দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্‌যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসনবাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়া-পরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন—তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই, শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে, শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, 'দাদাকে কি আমি খাওয়া পরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই যে শয়তানি চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না।

দেখি তিনি কতবড়ো চালাক।'

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্‌কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, 'গুড্‌বাই শচীশ!'

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল—তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল, তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা-গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিসপত্র তুলিল, জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সে দিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে, তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারম্বার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল। এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত আর সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্‌ট্রেন্‌স্‌ স্কুলের হেড্‌-মাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন আর পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, 'খবর কী?'

একটা বিশেষ খবর ছিল। ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননির 'পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাস্টারি করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর-দুয়ার, তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এ দিকে মেয়েটির সন্তানসম্ভাবনা।

জগমোহন তো একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, 'তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।'

শচীশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, 'লাইব্রেরি-ঘর! কিন্তু, বইগুলো?'

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু-কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, 'মেয়েটিকে এখনই লইয়া এসো।'

শচীশ কহিল, 'তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।'

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, 'এসো, আমার মা এসো। ধুলায় কেন বসিয়া।'

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না; তাঁর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, 'শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল?'

'মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না—আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগলা জগাই বলিত, আজও আমি সেই পাগল আছি।'

বলিয়া জগমোহন নিঃসংকোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন; মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচি মুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষ ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সকল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।

ননিবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী। সাতজন্মে ঝাঁট পড়ে না, সমস্ত উল্টা-পাল্টা। আর আমার কথা যদি বলো, কখন নাই কখন খাই তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।'

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালা অনুভব করে নাই—এমন-কি মা থাকিতেও না। কেননা মা তো তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত—সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু, জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালো-মন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া!

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননিবালাকে কোথাও কিছু সংকোচ করিতে দিলেন না। ননির বড়ো ভয় ছিল জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না—সে যে পতিতা! কিন্তু এমনি ঘটিল, জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না;

সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না এই তাঁর পণ।

জগমোহন জানিতেন, এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননিও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দু-চার দিনের মধ্যেই শুরু হইল। ঝি আগে মনে করিয়াছিল ননি জগমোহনের মেয়ে; সে একদিন আসিয়া ননিকে কী-সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননির মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, 'মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।'

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, 'ছি ছি, এ কী কাণ্ড জগাই! পাপ বিদায় করিয়া দে।'

জগমোহন কহিলেন, 'তোমরা ধার্মিক—তোমরা এমন কথা বলিতে পারো, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?'

কোনো-এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, 'মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।'

জগমোহন কহিলেন, 'মা যে! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই থামকা মাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইব? হরিমোহনের এ কেমন কথা!'

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, 'মা বলিস কাকে রে!'

জগমোহন কহিলেন, 'জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোনো বিপদই নাই।'

হরিমোহনের সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেয়ালের ও পাশেই বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে ইহা সহ্য করা যায় কী করিয়া!

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সে কথা তিনি সর্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সেজন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরক-ভোগ বিধান।' জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মতো অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিনই শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই

লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননিবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননিকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাই বটে! তুই এখানে!'

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিম্বা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, 'ননি!'

এমন সময় জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিলেন, 'বেরো! আমার ঘর থেকে বেরো!'

পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, 'যদি না যাও আমি পুলিস ডাকিব।'

পুরন্দর একবার ননির দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননি মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কী। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, শচীশ জানিত পুরন্দরই ননিকে নষ্ট করিয়াছে; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এইজন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত কলিকাতা শহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননির নিস্তার নাই, একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারৎপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননি একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননিকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল, একে তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে, তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ তো কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই-সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁর এক প্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে, ইহা তাঁর কাছে বড়োই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে, এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননির একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকিকান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণ মূর্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে, সে আর সে দিকে ঘেঁষিল না।

ননি দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম

করিতেছে। তখন ক্রিস্ট্‌মাসের ছুটি, জগমোহন এক মুহূর্ত ননিকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিস ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যুবকটি বলিল, 'আমি ননির ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।'

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন। অন্য যুবকটিকে বললেন, 'পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার! ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই!'

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না, কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল— পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননির ভাই বটে। শচীশই যে ননির পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননি মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ধরণী, দ্বিধা হও।'

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ননিকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটি শহরে চলিয়া যাই; সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব; যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও মেয়েটা আর বাঁচিবে না।'

শচীশ কহিল, 'দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।'

'তবে উপায়?'

'উপায় আছে। আমি ননিকে বিবাহ করিব।'

'বিবাহ করিবে?'

'হাঁ, সিভিল বিবাহের আইন-মতে।'

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উস্কোখুস্কো আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, 'দাদা, একি সর্বনাশের কথা শুনিতেছি!'

জগমোহন কহিলেন, 'সর্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।'

'দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মতো— তার সঙ্গে ওই পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?'

'শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি— আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।'

'দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি— আমার আয়ের অর্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি— আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।'

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'বটে! তুমি তোমার এ'টো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ! আমি তোমার মতো ধার্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো। আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।'

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, 'এ কি শুনি! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি?'

শচীশ বলিল, 'কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।'

হরিমোহন কহিলেন, 'তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই? ওই মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই—'

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, 'স্ত্রীর মতো? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।'

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মতো বলিয়া বেড়াইতেছে যে, শচীশ যদি ননিকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, 'তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না।' হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করেন তা নয়, অথচ তাঁর ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত—একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, 'বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।'

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননিকে বলিলেন, 'মা, আমার মনের মতো করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।'

ননি লজ্জায় মুখ নিচু করিল।

'না মা, লজ্জা করিলে চলিবে না, আমার বড়ো মনের সাধ, আজ তোমার সাজ দেখিব—এ তোমাকে পুরাইতে হইবে।'

এই বলিয়া চুমকি-দেওয়া বেনারসি শাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননির হাতে দিলেন।

ননি গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, 'এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না! আমি নাহয় বয়সেই বড়ো হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়ো।'

এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে কিছু রাত হইবে।'

ননি তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, 'বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।'

'মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকিপয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।'

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননির মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন—ননির দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন বিছানার উপর ননির দেহ পড়িয়া আছে—তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন সেইগুলি পরা, হাতে একখানি চিঠি, শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন :

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

পাপিষ্ঠা ননিবালা

শচীশ

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, 'যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।'

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই।—

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্‌মা-পরা চাপরাশির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, 'দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি—'

জগমোহন বলিলেন, 'বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?'

'কাদের?'

'ওই-যে চামারদের।'

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তার মেসে গিয়া বলিলেন, 'চল্‌।'

শচীশ বলিল, 'আমার কাজ আছে।'

'পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ?'

'আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো—'

'আজ্ঞা হাঁ বৈকি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিতে পারো। পাজি, নচ্ছার, নাস্তিক!'

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন

তিনি ক্ষুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-একজন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, 'এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম— কোনো খেদ রহিল না!'

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষ বারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, 'নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।'

শচীশ সগর্বে বলিল, 'হাঁ।'

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায়, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা, নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে, তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে!

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরও জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন-সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের

কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন, 'সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে, এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফস্‌কাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই— সে যে আবর্জনা।'

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল! শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই!

এমন সময় শোনা গেল, চাটগাঁয়ের কাছে কোন্‌-এক জায়গায় শচীশ, আমাদের শচীশ, লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে; আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দ স্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এ দিকে আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া? শত্রুর দল যে হাসিবে। শত্রুও তো এক-আধজন নয়।

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই— কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল. তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল, শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়াই শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা

ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, 'শচীশ!'

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে?'

শচীশ বলিল, 'শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।'

তখনই লোকসমাজে আমার নাম রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো-একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন 'ও লোকটা এমন'— থাক্, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম— সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো-অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, 'তামাকটা সাজিয়া দাও তো হে শচীশ!'

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোশ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসাটা অসংগত মনে করি না, কিন্তু, কী জানি, সে ঘটিয়া উঠিল না— দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম স্বামীজি জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, 'বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই— মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি, বাপু, তবে এবার বিদ্যাসমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ, এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।'

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে, ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, 'শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে! জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?'

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উল্টাইয়া দিয়া শচীশ কিছু-বা স্নেহের কৌতুকে কিছু-বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, 'বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠা-মশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড, এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।'

আমি বলিলাম, 'যাই বলো, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না—মুক্তির এ চেহারা নয়।'

শচীশ কহিল, 'সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠা-মশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর, এ-যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন— আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।'

আমি বলিলাম, 'তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি—'

শচীশ কহিল, 'তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন—দরকার যে আমারই।'

বুঝিলাম শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে-আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়—সে-আমি 'সর্বভূত', সে-আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরণের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্, আমার তো নাই; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না—আমি যে আমি।

বুঝিলাম তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম, এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব।

আমাদের মতো এতবড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দ স্বামীর নাম চারি দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরমভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী

তারই বাড়িতে থাকিতেন; সমস্ত দলবল-সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল। সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়; তার ইচ্ছা ছিল—এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে এক রকম ভাবে ছিলাম; কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই। কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম—চটক ভাঙিয়া গেল।

একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি—গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি; রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্টিয়ারি করিয়াছি—পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে—এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব—এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি—ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই; তার কাছে এ-সমস্তই ছায়া।

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রধান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছ-ছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া, গুরুভাইদের লইয়া, দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত! কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চস্বরের ডাক—'বামি!' আমরা ভাবের যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ; কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেওয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম রসের লোক

তো ওইখানেই—যেখানে সেই বামির আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই—যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে-তীব্রে স্থূলে-সূক্ষ্মে মাখামাখি—সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে, অল্প কালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না; সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে একদিন যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনফার হঠাৎ-প্লাবনে উপ্‌চিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল, এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়া-পরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহাঁর উপরে গহনা-পত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গণৎকার তাহাকে এক দিন বলিয়া দিয়াছিল, কোন্-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দ স্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উল্টা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরা-পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, 'স্বামীজি আসিয়াছেন—তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন।'

দামিনী বলিল, 'না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।'

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'একি করিতেছ?'

দামিনী কহিল, 'আমি গহনা গুছাইতেছি।'

এইজন্যই সময় নাই? বটে? পরদিন দামিনী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার গহনা?'

স্বামী বলিল, 'সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।'

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, 'দাও আমার গহনা।'

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, কী করিবে?'

দামিনী কহিল, 'আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।'

শিবতোষ কহিল, 'তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।'

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে, তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত-সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর, দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল।

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, 'আমার মাথা ধরিয়াছে।' যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, 'আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম।' এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না; তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে-একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, 'ধন্যি বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।'

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, 'যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।'

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরও বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্তভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন এক দিন

হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, 'যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে—ও বেচারার দোষ নাই।'

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েক দিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না; লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে, শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু, আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দ স্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল তাহা ভাঙিয়া মেঝের উপর টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরও এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্‌টন্ করিতে থাকিত। এক-একবার ভাবিতাম, দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না; ইহার মধ্য হইতে একেবারে এক ছুটে দৌড় দিব—সেই-যে চামারদের ছেলেগুলাকে লইয়া সর্বপ্রকার-রস-বর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, 'পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।'

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

গুরুজি প্রতি বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, 'আমি সঙ্গে যাইব।'

আমি বলিলাম, 'আমিও যাইব।'

রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছু-দিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।'

দামিনী বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

স্বামীজি কহিলেন, 'পারিবে কেন? সে যে বড়ো শক্ত পথ।'

দামিনী বলিল, 'পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।'

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল; সম্বৎসর ইহারই জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, 'একি অলৌকিক কান্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া!'

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের ক্ষোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল, গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন, 'আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।'

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিনজনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন—আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে—

পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁজের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন—

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল; অনেক ক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে—

'গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

'সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই— সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে।

'ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনো-মতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্ ঝপ্ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

'মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর-এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম— সেখানে গুহার-ফাটল-চোঁওয়ানো জল জমিয়া আছে।

'শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল, সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস— জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

'ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি; আমার জাগ্রৎ চৈতন্য এতবড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

'জানি না কতক্ষণ পরে, সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়, অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

'তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো-একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁওয়া আছে, এর রোঁওয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই— তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

'ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে— সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

'অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, তার গায়ে রোঁওয়া

নাই; কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

'অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?'

দামিনী

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্যবাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই; ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে। দামিনীর এলো-খোঁপা-বাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল।

কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না। গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, 'ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরও জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।'

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না দেখিতে পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মতো আমাদিগকে এ দিক ও দিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর, আমি—আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর সুরে বলিলেন, 'দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—'

দামিনী কহিল, 'না।'

'কেন বলো দেখি।'

'পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।'

'নাড়ু কুটিতে! কেন?'

'নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।'

'সেখানে কি তোমার নিতান্তই—'

'হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।'

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দমকা হাওয়ার মতো চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়া ছিল; সে তো অবাক। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে; আর, ওই একটুখানি মেয়ে, ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ।

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন আমরা দুইজনে ওই কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুম্‌ঝুমির মতো বারবার বাজিতে লাগিল যে, দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'দামিনী, এখানে একলা কী করিতেছ? ও ঘরে আসিবে না?'

দামিনী কহিল, 'না, একটু দরকার আছে।'

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন-দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল; সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে; তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই তো গেল চিল। আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবা মাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা, কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন?'

'কোন্‌খানে?'

'গুরুজির কাছে।'

'কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।'

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, 'কিছু না, কিছু না!'

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে—'

'তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম, আমি শান্তিতেই থাকিব।'

শচীশ বলিল, 'উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে, সেখানে সমস্ত শান্ত।'

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ওগো, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।'

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে, বাহির হইতে যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে, যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পোঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি, নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ এটুকু জানে যে—তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে—কেননা, আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া—আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না। তারা যা আমরা তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি—এইজন্য তারা যদি-বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো-বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু—যাক, এ-সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ-সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত—অন্তত, সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁষে না, তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া; দামিনী শচীশকে কেবলই এড়াইয়া চলে, তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উল্টা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কী দেখিল, কী হইল—সেই-সমস্ত সামান্য কথা সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ

আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে—পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবেভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয়তো সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিতাম শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে—সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত, গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে শচীশের চোখ-কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে শুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল, গোয়ালবাড়ি হইতে এক ভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মুলতবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন-কি, বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির 'পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইখানে রাখিয়া আত্মমর্যাদা উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু, আশ্চর্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না; বলিল, 'কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু?'

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, 'একবার—'

দামিনী বলিল, 'উঁহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন-না।'

শচীশের সামনে দামিনীর এইপ্রকার অনুরোধে আমার কান-দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, 'বেজিটাকে লইয়া মুশকিল হইয়াছে—কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড়ো দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।'

বেজিকে দুধ খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রীবিলাস-বাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সামনে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেই দিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিসটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল—সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কী যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে

কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, 'শচীশদাকে—'

দামিনী বলিল, 'তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।'

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিনজনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত— আমি আছি প্রকাশ্যে তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয় অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি!

কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরও অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, 'দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।'

আমি বলিলাম, 'কেন?'

সে বলিল, 'প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।'

আমি বলিলাম, 'তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।'

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস, তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।'

শচীশ কহিল, 'ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।'

আমি কী-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, 'ভাই বিশ্রী, প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায় ওই রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে-সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া।'

আমি বলিলাম, 'তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের

হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল, ভাই, আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরি।'

শচীশ বলিল, 'তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বলো, শুনি।'

আমি বলিলাম, 'প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেইজন্যই হালের দরকার।'

শচীশ বলিল, 'তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও? শেষকালে মরিবে।'

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। সেইদিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

এক দিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেক দিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন এই একটি-মাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, শিবতোষ বাড়িঘর-সম্পত্তি-সমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে, গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এ দিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস্‌ করিয়া উঠিয়া আসিলাম, আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ, কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু, সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনও নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল। বুঝিলাম ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল।

শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, 'শোনো দামিনী, একটা কথা আছে।'

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উসখুস করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, 'আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি তো সে প্রয়োজনে আস নাই।'

দামিনী কহিল, 'না।'

শচীশ কহিল, 'তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ?'

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিল; সে কহিল, 'কেন আছি? আমি কি সাধ করিয়া আছি? তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ?'

শচীশ বলিল, 'আমরা ঠিক করিয়াছি তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।'

'তোমরা ঠিক করিয়াছ?'

'হাঁ।'

'আমি ঠিক করি নাই।'

'কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কী?'

'তোমাদের কোনো ভক্ত-বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত-বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন— মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?'

শচীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, 'আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।'

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণহাওয়ায় দূর-সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো— এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া,

আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরও বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে হয়তো আমি শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে, এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, 'শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন তো।' শ্রীবিলাসবাবুকে কী যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়—কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, 'মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।'

'কোথায় যাইব?'

'তোমার মাসির ওখানে।'

'সে আমি পারিব না।'

'কেন?'

'প্রথম, তিনি আমার আপন মাসি নন; তার পরে, তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন?'

'যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার—'

'দায় কি কেবল খরচের? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।'

'আমি কি চিরদিনই সমস্ত ক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব?'

'সে জবাব কি আমার দিবার?'

'যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে?'

'সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি—আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই, সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন: এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।'

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'মধুসূদন?'

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী 'ভক্তিরত্নাকর' বুঝিত না, এবং আমার 'পরে তার কোনো রকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে এক

রকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে, দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো, দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, 'কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুই-চারিটা পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, 'এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না।'

লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।'

আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশায় অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শুধুমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলাকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক।'

বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, 'আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গুরুজি বলিলেন, 'মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।'

দামিনী কহিল, 'আপনি বুঝিবেন কী করিয়া?'

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'তুমিই-বা বুঝিবে কী করিয়া?'

'আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।'

'তবে আর প্রয়োজন কী?'

'আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?'

'আমি সন্ন্যাসী তা তুমি জান?'

'আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন। আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।'

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া

একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বারবার আসে আর যায়; মনে করে 'বসিয়া পড়ি', অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম, সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেখানেই গিয়াছে। হঠাৎ দেখি, পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু কথা বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলই নিঃশব্দে উলটাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেই দিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, 'প্রভু, কিছু দিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।'

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, 'খুব ভালো কথা, তুমি যাও।'

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপুরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, 'দামিনী! দামিনী!'

দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের একি চেহারা! প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা— চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, 'দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম— আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।'

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ওকি কথা আপনি বলিতেছেন!'

'না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এত বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না— কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।'

দামিনী তখনই নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, 'আমাকে হুকুম করো তুমি।'

শচীশ বলিল, 'আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।'

দামিনী কহিল, 'তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।'

এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল এবং আবার বলিল, 'আমি কোনো অপরাধ করিব না।'

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, দামিনী কখনো এক দিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল, মনে হইল, সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি, গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না; কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে, একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন তাঁর দিনে বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলি ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেক বার দেখিয়াছি, গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনোমতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, 'অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।'

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়া-ছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে, গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ, সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়—কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি, এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারেই বন্ধ। আমার যে-কয়টি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুর-ছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের—অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব, একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।'

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, 'কী হইয়াছে?'

দামিনী কহিল, 'নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।'

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়, আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কালেজে পড়ে; আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এই রকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে, তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল; তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চালতা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানটার ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিনে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময়ে শচীশের কী মনে হইল, সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, 'দামিনী!'

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়হাত করিয়া কহিল, 'প্রভু, আমার একটা কথা শোনো।'

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, 'আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন। তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?'

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, 'তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান! তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই! এই নির্লজ্জ

নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?'

আমি থাকিতে পারিলাম না; বলিয়া উঠিলাম, 'আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি।'

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, 'আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ওই-যে মেয়েটা মরিল—রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে? প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।'

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিনজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমন স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, 'বলো, আমি তোমার কী করিতে পারি।'

দামিনী বলিল, 'তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন-কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।'

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'তাই হইবে।'

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, 'তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!'

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই সমস্তই মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি-ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না-মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল, আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে, কেবল গুটি-কতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে সিসুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটি ফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে ভরা—বাসর-ঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শ্যাংলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে সিসুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনে ফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি—এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচন্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কেই-বা। কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে—যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরও এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। সেই নীল-কুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু, আমার দামিনী!

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্করাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি—দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না, আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই—সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে

মায়া হইল না, সে সত্য রহিল। সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া, স্নান করিয়া, আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম; তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম 'সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ'—এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়—সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এতবড়ো অমানুষ আমি নই, সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই। দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম। আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত-পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল, জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে; আমিই ছিলাম এক্‌জিক্যুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট-স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন— স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্‌।

শচীশকে বলিলাম, 'চলো, এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।'

শচীশ বলিল, 'এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।'

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, 'একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম; দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম; দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজের দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী করিতে হইবে বলো।'

শচীশ বলিল, 'তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।'

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, 'সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই-যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।'

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্‌বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল হুল ফুটাইয়া দিল; জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল; মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, 'শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে, সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।'

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক-দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্‌ জাতের, দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, 'বেশ তো, শহরে এখনই নাই গেলাম। নদীর ধারে ওই-যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।'

শচীশ বলিল, 'আর তোমরা?'

আমি বলিলাম, 'আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।'

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই, আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।'

যাই বল, আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এই জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি; এখন, আর যাই হোক, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ-যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন

দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত, তাহা লইয়া হার্বার্ট্ স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া, গুরুর সেবা করিয়া, দিন-রাত অস্থির ছিল—সে এক রকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, 'দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার, যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।'

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো—সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।'

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবার—'

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, 'ওগো, এ তোমার ভূগোল-বিবরণের সত্য নয়—আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন, গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।'

এই এক শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উল্টা কথাই শোনা গেল! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলা-কাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন—সেই আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই সেই আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, 'আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' কথাটার অর্থ কী। আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।'

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, 'যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।'

শচীশ অম্লানমুখে বলিল, 'আমি কবি।' বাস্, চুকিয়া গেল। চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপর সে বিষম রাগ করিত—যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই কি এমন করিয়া তার

শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দ স্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না। তবু, শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে-যে কত রকম ফিকির-ফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদী পার হইয়া, ও পারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ-আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ও পারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিক ধূ ধূ করিতেছে; জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখাচখির দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, 'এখানে কেন?'

দামিনী বলিল, 'খাবার আনিয়াছি।'

শচীশ বলিল, 'খাইব না।'

দামিনী বলিল, 'অনেক বেলা হইয়া গেছে।'

শচীশ কেবল বলিল, 'না।'

দামিনী বলিল, 'আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে—'

শচীশ বলিয়া উঠিল, 'আহা, কেন আমাকে তুমি—'

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু, সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া, চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি এক পাশে বসিলাম। একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, 'শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাবো কেন!'

দামিনী বলিল, 'আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো। আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না, আমি তার কিছু করিতে পারি?'

আমি বলিলাম, 'দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু-একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেই জন্যেই বড়ো দুঃখে কিম্বা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যে রকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও, ওর ক্ষতি হইবে না।'

দামিনী বলিল, 'আমি যে স্ত্রীজাত— ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।'

আমি বলিলাম, 'তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।'

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'পায় না বৈকি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে, সে একটা অনাসৃষ্টি।'

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই।— ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর্।

৬

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া, তার ফল হইল— দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে; সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুর্‌দুর্ করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, 'সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে, ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন, এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া!'

দামিনী ভাবিল, 'দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।'

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, 'বিশ্রী! দামিনী!'

তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না— কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ঘুম হইতে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি, শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, 'আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।'

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম। শচীশ বলিল, 'যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।'

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্‌-জ্বল্‌-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী! শচীশ বলিয়া চলিল, 'তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বন্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।'

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, 'দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।'

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শচীশ বলিল, 'এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এক কোণটিতে চুপটি করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব— চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।'

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার'— এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিক-ঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা

অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায়, তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন।

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল্ আর আকাশের জলের ঝর্ঝর্ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম্ করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলোর ঝপাঝপ্ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়্মুড়্ দুড়্দুড়্ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বারবার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলট-পালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলো ফর্ ফর্ করিয়া কে কোন্ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, 'কেও?'

উত্তর শুনিল, 'আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।'

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গর্গর্ করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেক ক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল, দেবতার পেয়াদাগুলো তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়্পড়্ শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চীৎকার-শব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, 'এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ!'

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দামিনী বলিল, 'আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।'

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।'

দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পরে বলিল, 'তাই আমি যাইব।'

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, 'শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।'

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারি একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুরমার হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।'

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, 'আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।'

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, 'দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জানো? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে।'

বলিয়া দামিনী বুকে দম্‌-দম্‌ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া তখনই দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক

পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, 'একি! তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি?'

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, 'আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।'

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে ঢীঢি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু-বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ওইটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূরসম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ-মা মারা গেছে, কিন্তু ভাইরা কেহ কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম; সে ঘাড় নাড়িল— বলিল, 'তারা বড়ো গরিব।'

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয় 'এখানে জায়গা নাই'। সে আঘাত যে সহিবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তা হইলে কোথায় যাইবে?'

দামিনী বলিল, 'লীলানন্দ স্বামীর কাছে।'

লীলানন্দ স্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, 'স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন?'

দামিনী বলিল, 'খুশি হইয়া লইবেন।'

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দ স্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক। কিন্তু—

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, 'দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।'

দামিনী বলিল, 'বলো শুনি।'

আমি বলিলাম, 'যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে—'

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, 'ওকি কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু! তুমি কি পাগল হইয়াছ?'

আমি বলিলাম, 'মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।'

'বাজে কথা? কাকে তুমি বলো বাজে কথা?'

'এই যেমন, লোকে কী বলিবে, ভবিষ্যতে কী ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি!'

দামিনী বলিল, 'আর আসল কথা?'

আমি বলিলাম, 'কাকে বলো তুমি আসল কথা?'

'এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে?'

'এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।'

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনো রকম তারে-খবর পায় নাই, সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না— অন্তত, তার কোনো রকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন— এমন-কি আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না-করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।'

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, 'তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।'

আরও খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, 'তুমি তো আমাকে জানো।'

আমি বলিলাম, 'তুমিও তো আমাকে জানো।'

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি— একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল, এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল— অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল ক'টার মধ্যে বারবার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি— সঙ্গে সঙ্গে খোল্‌-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে— 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি', এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ

করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ওই বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল! বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে। এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁওয়াইয়া দিলেন, আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, 'আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।'

আমি দামিনীকে বলিলাম, 'দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।'

দামিনী কহিল, 'বিধাতার ওই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।'

আমি কহিলাম, 'ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য-সাধন নয়, এ যে অসাধ্যসাধন।'

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন—দিনগুলাও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন, আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, 'তুমি যে এই পাগলামি করিতে বসিলে—তোমার ঘরের লোক—'

আমি বলিলাম, 'তারা আমার সুহৃদ। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে!'

'তার পর ?'

'তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব—সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।'

দামিনী কহিল, 'আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্‌।'

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে। আমি বলিলাম, 'কেন ?'

'তিনি সম্প্রদান করিবেন।'

সে পাগ্‌লা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারও চিঠি খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, 'দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে; পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ, ত্রুটি মার্জনা—এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভীতু মানুষ। সে হয়তো এতক্ষণে নদীর ও পারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারও নাই।'

দামিনী হাসিয়া কহিল, 'সেখানে আর কখনো যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।'

আমি বলিলাম, 'আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?'

এবারে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব; শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত, জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমান-পাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে, পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে, বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরও ধুম হইল কাগজে। পরবারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নর-রক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, 'বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করো-সে।'

আমি বলিলাম, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।'

শচীশ বলিল, 'না, আমার কাজ অন্যত্র।'

দামিনী বলিল, 'আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।'

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ওই শচীশ।

শচীশ তো বলিল, আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করো, কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না—ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা—কিন্তু, কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল, সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুইজনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা; প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে এক্‌জামিন-পাসের পেটেন্ট্ ঔষধ বাহির করিলাম—পাঠ্যপুস্তকের

মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না— চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি-দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো-কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয় সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না—কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার, স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়ে বামুন বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব-কটাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, 'তোমরা কেবলই উল্টা বুঝিয়া দয়া করো। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে?'

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরও একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য!'

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একো রকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারও প্রেস্‌ক্রুপ্‌শনের সঙ্গে কারও মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াই-খানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, 'যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও—সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।'

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

* অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১

তোতা-কাহিনী

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে। রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার। পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, 'উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী?'

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার— ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। রাজ-পণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে। পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের; ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া

বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারক-নবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য! শব্দ কম নয়।'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ওই যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।' ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল—বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকাল বেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন-কি, এক একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে। কোতোয়াল বলিল, 'একি বেয়াদবি!'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা। রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা। কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনা-দানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

পাখিটা মরিল। কোন্ কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না—কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায়, কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

* মাঘ ১৩২৪

কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে!'

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, 'আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে?'

তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, 'ভাবনা কী? লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্‌না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল। কেননা, ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারও জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো। তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার। দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ

বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, 'এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সব চেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।'

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না—সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে—বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে ক'রে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক্, অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক—শান্তি থাকে। কত যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে, এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা, ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারও মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা; সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি। কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল।'

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে। কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, 'এমন হল কেন?'

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বললে, 'এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন?'

শুনে সকলেই বললে, 'তা তো বটেই।' অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, 'খাজনা দাও।' আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, 'খাজনা দাও।' এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে, 'খাজনা দেব কিসে?'

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারও হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের

কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো : প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।'—শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কিসে'।

শ্মশান থেকে, মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উত্তর আসে—'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে!'

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, 'ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে?'

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, 'কী সর্বনাশ! এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি! তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে—সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?'

প্রশ্নকারী বলে, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়?'

মাসিপিসি বলে, 'বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।'

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।'

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, 'চুপ! এখনো ঘানি অচল হয় নি।'

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না। দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, 'কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি?'

কর্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।'

তারা বলে, 'ভয় করে যে কর্তা!'

কর্তা বলেন, 'সেইখানেই তো ভূত।'

* শ্রাবণ ১৩২৬

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল। তখন সাত বছরের ছেলেটি—গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ—একলা গলির উপরকার জানলার ধারে। কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিমগাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে। কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে। খোকা জিজ্ঞাসা করলে, 'মা কোথায়?'

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, 'স্বর্গে।'

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে। দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিক্‌টিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন্ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়ালো। চার দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে।

উলঙ্গ গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে। তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কোথায় স্বর্গের রাস্তা?'

আকাশে আর কোনো সাড়া নেই, কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

* আশ্বিন ১৩২৬

সওগাত

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার, আর ভাণ্ড ভ'রে ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়ো ছেলে বিদেশে রাজ-সরকারে কাজ করে; মেজো ছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুটুম্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে দেখছে—ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাস দাসী, থালাগুলি রঙ-বেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষ নৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, 'মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না!'

মা হেসে বললেন, 'সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখ্।'

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, 'সওগাত পাব না?'

'যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।'

'আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে?'

মা তাকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বললেন, 'এই তো আমার হাতের জিনিস।'

* পৌষ ১৩২৬

সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বদ্যি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, 'খাও।' সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

সে গুমরে উঠে বললে, 'তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।'

স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, 'সই, বোসো। কথা আছে।'

স্যাঙাৎনি বললে, 'প্রকাশ করে বলো।'

সুয়োরানী বললে, 'আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল। তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চড়ে। আগে লোক, পিছে লশ্‌কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ। এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপা গাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, আহা, ঘরখানি কার?

সে বললে, দুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধের সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

আমি বললেম, এ ঘরে আমি থাকব না।

রাজা বললে, আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।

আমি বললেম, আমার বড়ো সাধ গিয়েছে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির

বাগানের একটি ধারে।

রাজা বললে, আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

'তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো-সাত-জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল। পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি— ও কোন্ ঘরের বউ গা! যেন নির্মাল্যের ফুল! হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লাল-পেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে। ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে?

ছত্রধারিণী হেসে বললে, চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

আমি বললেম, আমার বড়ো সাধ— রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।

রাজা বললে, আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লাল-পেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

'তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল। পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি— তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে ক্ষেতের শাক। ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে?

ছত্রধারিণী বললে, জানো না? ওই তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্যে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, ক্ষেতের শাক।

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

আমি বললেম, আমার বড়ো সাধ— রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, ক্ষেতের শাক, আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।

রাজা বললে, আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

'তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, তোমার কী হয়েছে, কী চাই? সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি স্যাঙাৎনি! আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে— ওই দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।'

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, 'কেন বলো তো?'

সুয়োরানী বললে, 'ওর ওই বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।'

* আশ্বিন ১৩২৭

বিদূষক

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনা-মানিকে হাতি বোঝাই হল। দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজো দিয়ে চলে আসছেন—গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক; সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক। এক জায়গায় দেখলেন পথের ধারে আম-বাগানে ছেলেরা খেলা করছে। রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বললেন, 'দেখে আসি ওরা কী খেলছে।'

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?'

তারা বললে, 'কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জিত, কার হার?'

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, 'কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।'

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে উঠল।

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনও ছেলেরা খেলছে। রাজা হুকুম করলেন, 'এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো আর লাগাও বেত।'

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, 'ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ করো।'

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনো দিন যেন ভুলতে না পারে।'

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

সন্ধেবেলায় সেনাপতি রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। প্রণাম করে বললে, 'মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারও মুখে শব্দ শুনতে পাবেন না।'

মন্ত্রী বললে, 'মহারাজের মান রক্ষা হল।'

পুরোহিত বললে, 'বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।'

বিদূষক বললে, 'মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।'

রাজা বললেন, 'কেন!'

বিদূষক বললে, 'আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।'

* বৈশাখ ১৩২৯

পুনরাবৃত্তি

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটো ছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে। রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কী খেলছ?'

তারা বললে, 'আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।'

রাজা সেখানে বসে গেলেন। ছেলেটি বললে, 'এই আমাদের দণ্ডকবন, এখানে কুটীর বাঁধছি।'

সে একরাশ ভাঙা ডাল-পালা খড়-ঘাস জুটিয়ে এনেছে, ভারি ব্যস্ত। আর, মেয়েটি শাক-পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে; রাম খাবেন, তারই আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, 'আর তো সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়?'

ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে।

রাজা বললেন, 'আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।'

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, 'তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।'

রাজা বললেন, 'আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।'

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতাযুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখি ডেকেছিল, সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল, আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে। রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলে মেয়ে দুটি কার?'

মন্ত্রী বললে, 'মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।'

রাজা বললেন, 'যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ওই মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।'

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

দেশে সব চেয়ে যিনি বড়ো পণ্ডিত, রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা। কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট রুচিরার। কেননা, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয় সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ। মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘটবে—কারণ, কৌশিক পড়ে বটে, কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন?'

সে বলে, 'আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।'

অধ্যাপক বলেন, 'সে-সব অনুরাগ ছাড়ো।'

সে বলে, 'তা হলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।'

এমনি করে কিছুকাল যায়। রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?'

অধ্যাপক বললেন, 'রুচিরা।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কৌশিক?'

অধ্যাপক বললেন, 'সে যে কিছুই শিখেছে এমন বোধ হয় না।'

রাজা বললেন, 'আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।'

অধ্যাপক একটু হাসলেন; বললেন, 'এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।'

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।'

মন্ত্রী বললে, 'মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।'

রাজা বললেন, 'স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?'

মন্ত্রী বললে, 'তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

রাজা বললেন, 'সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য?'

মন্ত্রী বললে, 'হাঁ, সেই কথাই বটে।'

রাজা বললেন, 'আমার সামনে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।'

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বললে, 'এই পণে আমার কন্যার মত আছে।'

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে ব'সে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃক্‌পাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতি-পালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই, আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে। ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'এখন বিবাহের দিন স্থির করো।'

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড়হাতে রাজাকে বললে, 'ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।'

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?'

কৌশিক বললে, 'জয় আমারই থাক্‌, পুরস্কার অন্যের হোক।'

অধ্যাপক বললেন, 'মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।'

সেই কথাই স্থির হল।

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখনও যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।'

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন-কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়। অধ্যাপক রাগ করে বললেন, 'কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদ-বেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝতে পারলেম না।'

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, 'ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেছে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কন্যা কী বলে?'

মন্ত্রী বললে, 'মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার চোখের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে?'

মন্ত্রী চুপ করে রইল।

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, 'তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো। রাজা বললেন, ‘বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?’

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা বললেন, ‘আজ সেই রামের বনবাস-খেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।’

রুচিরা মুখের এক পাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল। রাজা বললেন, ‘বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনছি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।’

রুচিরা কোনো কথা না বলে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে। রাজা বললেন, ‘কিন্তু, বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।’

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাজা বললেন, ‘এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।’

* জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত ক'রে তোলে— তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না— কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন ক'রে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ানো নয়। পুব দিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল বেলাকার রোদ্দুর প'ড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়! মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শাল-বনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন-মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প।

ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়্‌সুড়ি লাগত আর ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা-সোনা রঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না ব'লে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম্‌ছম্ করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়। অনেক সময় দেখেছি ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁক্‌ড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী-যে-একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন ক'রে প্রকাশ করবে? তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে 'তোমার নাম কী', হয়তো বলে 'তোমার মা কোথায় গেল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।' •

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আম্‌লকি পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ করে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, 'ওই

ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।'

কাকি বলে, 'বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্! ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন!'

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভান্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে— আর, উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে 'আমি থাকব'। সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন এক রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকা, এ গাছটা কী?'

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা-মাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত ক'রে দেবে।

আমি বললুম, 'মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।'

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা! বললে, 'না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।'

আমি বললুম, 'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।'

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাকি,

তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।'

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, 'ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।'

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে! আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম— এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব। বললেম, 'নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।'

কিন্তু কাটবার কথা বললেই আঁৎকে ওঠে আর ওর কাকি বলে, 'আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে!'

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিম্‌লেয়— তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

•

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক-পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা আর জানোয়ারের-গল্প-ওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে এই কথা ব'সে ব'সে চিন্তা করেন।

কোনো-এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এত দূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, 'কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।'

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, 'ওগো, শুনছ? একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন?'

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, 'সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।'

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চির-কালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল— তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ; তারই প্রাণের দোসর।

* অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা করবই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে।' সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব-একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে খয়ে-যাওয়া মলিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রুপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঙ্কে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিনীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে। গানিব্যাগ্-ওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌দুলাল।

গোবিন্দর পৈতৃক ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সম্বরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারে অন্নবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে— 'পয়সা করো'।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড়

কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস—ফলসার রস—জবার রস—শিউলি-বোঁটার রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস-রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে—জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, এক তাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার! সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট্ শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল—ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেন্সিল, কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্দুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, "বা, এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।" একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধ'রে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড ব'লে স্থির করলেন; বললেন, "সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই—বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার!" মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা ক'রে মনে মনে যে রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রয়, আশা করতে পারতেন না; শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং

সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না ক'রে তার উপরে যদি একটা আব্রু থাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়— কিন্তু, সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কেননা, যে চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সে'ই সব চেয়ে অরক্ষিত; তাকে আঘাত করা, বিদ্রূপ করা, সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধ'রে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনাতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ ক'রে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্প-রচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম ক'রে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হ'ত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি— বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি, মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না— বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অট্টহাস্য জমালে। তারা যেরকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি— এমন-কি, তার টেক্‌নিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মাসির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই।

ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্ট মূর্তি তাজা বেরিয়েছে—এর মধ্যে দাগা-বুলানোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের ক'রে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মাসিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ ক'রে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে 'ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্‌সুয়োরেন্স আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন আর ঘরের মধ্যে ঐ মস্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন ক'রে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে!"

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো, ছবিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণ-গুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এঁরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।"

গোবিন্দ বললেন, "পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী।"

সত্যবতী বললেন, "আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই

গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।"

গোবিন্দ বললেন, "আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব—নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।"

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে। সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল্, বাবা।"

চুনি বললে, "কোথায় যাবে, মা।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যাই।"

রঙগলালের দরজায় এক-হাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন; বললেন, "বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও এঁকে পয়সার সাধনা থেকে।"

* কার্তিক ১৩৩৬

সুকুমার

সন্ধেবেলায় বসে আছি দক্ষিণ দিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষ গাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে। পুপেদিকে বললেম, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত; তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলুম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্‌চিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতখানি চোখ ক'রে এসে উপস্থিত।

আমি বললেম, হয়েছে কী?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ! কে এমন কাজ করলে?

এ প্রশ্নর উত্তরটা তখনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না ব'লে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধেবেলাতেই

রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুণ্ডুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্‌কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী ক'রে! কোন্‌ দিক দিয়ে নিয়ে গেল?

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো?

না।

বুন্দেলখণ্ড নয়?

না।

কিরকমের দেশ?

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে? জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা-কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে?

না।

ঘোড়ায়?

না।

হাতিতে?

ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেললে, খরগোশে। ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে— জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কাজ।

খুশি হলে শুনে। আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্যে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি খরগোশ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমলে কি মানুষ হাল্কা হয়ে যায়?

হয় বৈকি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি?

হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী? খরগোশ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ! ছী ছি ছি! শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই—ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙ্গমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি?

হাঁ, হয়েছিল বৈকি।

কিরকম?

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়? শুনে খরগোশ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙগমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।—আচ্ছা, তার পরে?

কার পরে?

খরগোশ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব! তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে?

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুত্তুরের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে?

ঐ-যে তোমাদের সুকুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন সুরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস। তোমার কাছে সে পড়া ব'লে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না। বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্তুর।

কেমন করে জানলে?

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে।

তুমি বেশ একটু ভুরু কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া!

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না—ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বল রাজপুত্তুর! ওকে আমি জটায়ুপাখি বলেও মনে করি নে। ভারি তো!

একটু শান্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে। তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন? ওর এক্‌জামিনের পড়া আছে।

২

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই পরশু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্দুরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির ছাদে। আমি বললুম, ব্যাপার কী?

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্তুর।

তলোয়ার কোথায়?

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধ-পোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল।

কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে! কিন্তু, ঘোড়া চাই তো?

বললে, আস্তাবলে আছে।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হ্যাট্ হ্যাট্ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও?

চাই বৈকি।

ছাতাটা ফস্ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

এইবার আমি উড়ছি দাদা! চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার!

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বললুম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হল। রাজপুত্তুর ছাতার পিঠ চাপ্ড়িয়ে বললে, ছত্রপতি!

নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজ্ঞে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ আমি বললুম? আজ্ঞে, তা নয়; ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে! আমি কি এত কালা!

রাজপুত্তুর বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে। রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল, রাজপুত্তুর, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চটা।

শুনে রাজপুত্রের মনটা ছট্ফট্ করে উঠল। ছাতাটাকে থাব্ড়া মেরে বললে, এখ্খনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারো না কি?

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাত্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও ন্যাকামি ক'রে ছাতা সাজে; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে।

৩

মাস্টারমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি

যখন গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাকে পড়ন্ত বেলাকার রোদ্দুর আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে সুকুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম তখনও আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌঁছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্তুর!

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল। জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই?

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়?

ঐ-যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি—হল্‌দে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো?

হাঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা?

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্তুর। খানিকটা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে, তুমিই বলো-না, দাদু, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক?

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে? শুক বলছে, যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এখানে রাত্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কাম্‌রাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দ ক'রে—আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে! শুক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিনে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না—কিছুই না—কিছুই না।

সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী ক'রে দাদু?

সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।

শুক কী বলছে?

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুহু করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে।

সুকুমার হয়ত মুঠো ক'রে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব।

৪

সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশ-মত পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাদ্যবিধির রেনেসাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি?

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন? কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ নাকি?

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই—স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমানুষির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম। আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ বই প'ড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জানো?

দৃঢ় বিশ্বাস।

জানো কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো-আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হ'ত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপসে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম—সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ ক'রে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মস্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কখ্‌খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্‌ করে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা?

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে, অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না—তোমার বাবা বেড়াল জন্তুটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হ'ত না, পেতেও হ'ত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম—এতে কী সুবিধেটা হল? তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে, সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি—হয় এটা নয় ওটা, কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে—এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

•

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না?

এগিয়েছিল। সুকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে-কথা-বলার মতো ব'লে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শাল গাছ হয়ে দেখতে।

সুকুমারকে উপহসিত করবার সুযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শাল গাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম—দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে! ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বৈকি। গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী ক'রে?

আমার কথা শুনে সুকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শাল গাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শাল গাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, শাল গাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে

এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘে-ভরা আকাশের মতো। সেই রকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জরিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সির্‌সির্‌ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্‌টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব; কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম করে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্তুগুলোর জীবযাত্রা চলছে কিরকম করে তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ—এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ ব'লে উঠতুম 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে', তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হ'ত। কিন্তু, সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্য দিকে। আমি হতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথ গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে দল-বাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা সুদূরতা—মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ওপার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্‌দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে—'বেলা যায়'।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টি-

ছাড়া বোধ হল। সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে?

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সুকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এঁকেছ?

হাঁ, এঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে নাকি তুমি আঁকতে!

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে, ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনও বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব?

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ আরও কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়—হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পান্সিনৌকোখানি। এই উপলক্ষে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুর গাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা? আমি বললুম, মাথার কষ্ট গা-জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী পরামর্শ করলে, বুঝলেম আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইলুম। মনে হল—কী হবে শুনে! সায়াহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিম গাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিণী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো, স্তব্ধ। প্রতি-দিনই তো আসে, কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে-মনে বললুম, ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরুভাইকে; তার সকল জ্বালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।—দুই পহর

পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্তব্ধ রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি সুকুমারের কী মনে হল। সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। পুজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাটবল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্দুরে।

শুনে আমি চুপ করে রইলুম; কিছু বললুম না।

৫

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদার কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদার সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনও আছে?

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব ব'লেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন!

তোমাকে বলব' মনে করেছিলুম. বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙুল চলে, পেট চলে না।

সুকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি—এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। সুকুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মানুষ; সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দুজনের 'পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হল দুজনে মিলে। সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, 'আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।'

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল, কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার

ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখছে—

'মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌঁছব— সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শূন্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব— মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্ব-সৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।'

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সুকুমারদার এখনকার খবর কী?

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না ব'লেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

* বৈশাখ ১৩৪৪

রাজরানী

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম! কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খ'সে পড়ে মানিক। কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া—সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা। রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্র-মিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্র-মিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই?

রাজা বললেন, আমার এক জোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন—চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসীর সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক, আর হাতে নিলেন কমন্ডলু আর বেল কাঠের দণ্ড। 'বোম্‌ বোম্‌ মহাদেব' ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল—বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদী নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন-বাঁটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ-বা আনল ভৃঙ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ-বা আনল মাকড়সা-জাল শাড়ি। কেউ-বা আনল হাওয়া-হালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্নেসীকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, রাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না?

রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নাম-ডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজ-রাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে। ব'লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী ক'রে কাঞ্চী জয় ক'রে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদী ক'রে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রঘ্নী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাতজোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ-বা চামর দোলাবে, কেউ-বা ছত্র ধ'রে থাকবে, আর কেউ-বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্! চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝর্‌নার জলে স্নান ক'রে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিন প্রহর। প্রখর রোদ, শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগ-পড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে?

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্যি হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে?

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়ে ঘর। আমি

ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে দুজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়ে ঘরের দরোজায় ব'সে। সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন?

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব!

রাজা বললেন, আমি তো আর-কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায় দান করো আর যদি কন্যা থাকেন রাজী।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী— কাঠকুড়ানী মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছী!

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

বিনি পয়সার ভোজ

আপিসের বেশে অক্ষয়বাবু

হাসিতে হাসিতে

আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনা-মাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বাচওড়া কথা কন। মশায়, আজ বছর-খানেক ধ'রে রোজ বলে 'আজ খাওয়াব' 'কাল খাওয়াব'—খাওয়াবার নাম নেই। যতখানি আশা দিয়েছে তার সিকি-পরিমাণ যদি আহার দিত তা হলে এত দিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হতে পারত। যা হোক, আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে আছি, এখনও তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না তো?

নেপথ্যে চাহিয়া

ওরে, কী তোর নাম, ভুতো না মোধো, না হরে?

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাপু, তাই সই। তা ভালো, চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আসবে বলো দেখি।

কী বললি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন? বলিস কী রে! আজ তবে তো রীতিমত খানা। খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন-চপের হাড়-গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চক্‌চকে করে রেখে দেব। একটা মুরগির কারি অবিশ্যি থাকবে, কিন্তু কতক্ষণই বা থাকবে! আর দু রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা হলে চেঁচেপুঁছে চীনে বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে ক'রে ডজন-দুত্তিন অয়স্টার প্যাটি আনে তা হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধ হয় অয়স্টার প্যাটি আসবে।

ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বলো দেখি।

অনেক ক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ এক ছিলিম তামাক দাও-না। অনেক ক্ষণ ধ'রে বলছি, কিন্তু তোমার কোনো গা দেখছি নে।

তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন? এমন তো কখনও শুনি নি। এ তো কোম্পানির কাগজ নয়। কী করা যায়! আমি একটু-আধটু আফিম খাই, তামাক না হলে তো আর বাঁচি নে। ওহে মোধো, না না, চন্দ্রকান্ত, কোনো-মতে মালীদের কাছ থেকে হোক, যেখান থেকে হোক, এক-ছিলিম জোগাড় করে দিতে পারো না?

বাজার থেকে কিনে আনতে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু, তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট করে কিনে নিয়ে এসো।

এক পয়সার তামাক হবে না? কেন হবে না? বাপু, আমাকে কি মুচিখোলার নবাব বলে হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েছে? ষোলো টাকা ভরির অম্বুরি তামাক না হলেও

আমার কণ্টেসন্টে চলে যায়—এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো-কলকেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে গেছেন নাকি? বাঙাল ব্যাঙ্কে সেফ ডিপজিট করে আসেন নি কেন? ওরে বাস্ রে! এ তো ভালো জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখছি। তা নাও, এই ছটি পয়সা ট্রামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নিতে হবে।

এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা হলে এঁর ভদ্রাসন-বাড়ি কিরকম হবে না জানি। কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে। এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল—আর তো পারি নে—এই মাটিতেই বসা যাক।

কোঁচা দিয়া ধুলো ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়েল ডোজ!
পরের তহবিল
চোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে, কে কার রাখে খোঁজ!

কই রে? তামাক এল? ওকি রে! শুধু কলকে? হুঁকো কই? এখানে ছ-পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না? কলকেটার দাম দু-আনা? হ্যা-দেখো বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই। শরীরটা যত মোটা, বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। তোমার বাবু যে হুঁকোটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়রন্‌চেস্টে তুলে রেখে দেন, এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মতো রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে। বোধ হয় বেশিদিন বাইরে থাকতেও হবে না। কোম্পানি-বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখবেন। যা হোক, তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচি নে।

কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে

ওরে বাবা! এ কোথাকার তামাক! এ যে উইল করে টানতে হয়। এর দু টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট্ করে ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভির্মি লাগে। কাজ নেই বাপু, থাক্। বাবু আগে আসুন। কিন্তু বাবুর আসবার জন্যে তো কোনো রকম তাড়া দেখছি নে। সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে শেষ করছে। এ দিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধরে যাবে। তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে

বসবেন গেলাস কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পারো? বাগান থেকে চট্‌ করে একটি ডাব পেড়ে আনতে পারো? বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এলুম।

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা হোক-না বাপু, একটি ডাবও মিলবে না?

পয়সা চাই? পয়সা তো আর নেই। তবে থাক্‌, বাবু আসুন, তার পরে দেখা যাবে।— সঙ্গে মাইনের টাকা আছে, কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখনও কোম্পানির মুল্লুকে যে এতবড়ো একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না।

যাই হোক, এখন উদয় এলে যে বাঁচি। ওই বুঝি আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি। আঃ, বাঁচা গেল। ওহে উদয়, ওহে উদয়!— কই, না তো! তুমি কে হে?

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন। খিদেয় যে মারা গেলুম।

হোটেলের বাবু? কেরানিবাবু? কই, তাঁর সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পারো? অয়্‌স্টার প্যাটি?

পাঠান নি? বিল পাঠিয়েছেন? কৃতার্থ করেছেন আর-কি। যে বাবুটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে, না রে না। আমি না। এও তো ভালো বিপদে পড়লুম। আরে, মাইরি না! কী গেরো! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কী বাপু! আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছি— তুমি হোটেল থেকে আসছ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্ছে। বোধ হয় তোমার ওই চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন— ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও চাই নে।

এ তো ভালো মুশকিল দেখছি। ওগো, না গো না। আমি উদয়বাবু নই, আমি অক্ষয়বাবু। কী গেরো! আমার নাম আমি জানি নে, তুমি জানো! অত গোলে কাজ কী বাপু— তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো, উদয়বাবু এখনি আসবেন।

বিধাতা, সকালবেলায় এইজন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে, বিল এসে উপস্থিত!—

সখি, কী মোর করম ভেল!
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল!

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে এক জন পেলে সুধা আর-এক জন পেলে বিষ, হোটেল-মন্থনেও কি এক জন পাবে মজা, আর-এক জন পাবে তার বিল! বিলটাও তো কম দিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু তিনি কি মনে করেছেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে? তোমার বাবু তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে!

কী বললে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয়বাবু কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে? তোমার তো বিবেচনা-শক্তি বেশ দেখছি।

সত্যি নাকি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাবু? কপালে কি সাইন-বোর্ড্ টাঙিয়ে রেখেছি? আমার অক্ষয়বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না?

নাম বদলেছি? আচ্ছা বাপু, শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে, বলো দেখি।

উদয়বাবুকে কখনও চাক্ষুষ দেখ নি? আচ্ছা, একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন ব'লে।

আরে মোলো! আবার কে আসে! মশায়ের কোত্থেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির? ভাড়াটা কত হিসেবে?

মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়।

ঠাট্টা করছি নে মশায়, মনের সে রকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে-তিন ঘণ্টা কাল আছি। সেজন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি।

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি—আপনার ঈষৎ ভুল হয়েছে—আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এ রকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাড়িভাড়া-আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন? মাপ করবেন, ওইটি পারব না। সাড়ে-তিন ঘণ্টা ধ'রে পেটের জ্বালায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্ছেন ব'লেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি ওইখানেই বসুন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান—আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

ব'কে ব'কে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগুলো বেবাক হজম হয়ে গেল। ওই-যে পায়ের শব্দ। ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগর-সেঁচা সাত রাজার ধন মানিক, একবার উদয় হও হে! আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ওইখানে বসে আরম্ভ করে দাও। দোহার্কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন।

হরিবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলুম। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পরমবন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তাঁদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই, আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোনো-কালে কোনো পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কী? আচ্ছা মশায়, হরিবাবু-নামক কোনো একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি?

কী? আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা

এনে ফিরিয়ে দিচ্ছি নে? দেখো, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল, কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেষ্ট হবে— আমি কারও কাছ থেকে কোনো গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন— গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছি। আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন।

উচ্চৈঃস্বরে

ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইস্‌টুপিড— ওরে, পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে— ওরে নরাধম! কুলাঙ্গার!

আরে না মশায়— আপনাদের সম্ভাষণ করছি নে। আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বসুন।

আর বসতে পারছেন না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তা হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাই নে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল।

কিন্তু এখন যে কথাগুলো বলছেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বলছেন। খুব পরমবন্ধুকেও মানুষ ভালোবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জাবোধ করছি। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনো রকম অসদ্ভাব নেই, কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।'

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দু বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, খিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কিরকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার! ফের! দেখো বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না। শরীরটা দেখেই বুঝতে পারছ না! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসি।

আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছুতেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো, আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলুম।

ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে। খালি পেটে খিদের উপর মারটা সয় না দেখছি।

আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোসো। তোমাদের কার কত পাওনা আছে বলো। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে এক-পেট-খিদে-সুদ্ধ দৌড় মারতে হত। আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বৈ পাওনা নয়, কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপু— এই নাও তোমার টাকা।

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনও অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা হলে স্মরণ রেখো।

তোমার তিন মাসের বাড়িভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি, বাকি পরে নিয়ো। তুমি তো ভাই, তোমার গালমন্দ আমাকে ষোলো-আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এখন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা হলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত; আর যখন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিই নি তখন ফিরিয়ে আনা আরও কত কঠিন তা একটুখানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো বুঝতে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর-একটু না দেখে যেতে পারছি নে।

উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমি-সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি! চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত!

এই-যে এসেছ! চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন।

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হোক, বড্ড খিদে পেয়েছে, এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট্ করে কিছু খাবার কিনে আনো, তা হলে প্রাণ-রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে! এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম ক'রে, এতগুলি বিল ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কাণ্ড নয়। এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে।

কী হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে! আর-কিছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেছে? না? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও।

আহার

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা ব'লে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু এমন সুখ পাই নি। চন্দ্র, তুমিই সুধাকর বটে, কিন্তু আজকে কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল। ডাবও একটা এনেছ দেখছি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে নাকি?

হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না? তবে তো বড়ো বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড়ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম। কী করব! বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে? চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ, এখন আর কিছু করতে হবে না—এই ভদ্রলোকের

ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না? সেজন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে। যা হোক, আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক। বাপু, যে রকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা-কিছু ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে— আগে থাকতে বলে রাখলুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে? তোমাদের কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর খিদে থাকবে না। আরও কী চাও?

ও! বকশিশ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ওই খুঁতটুকু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো আনা আমি গাড়িভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো যদি কিছু থাকে তা হলে ভাঙিয়ে—

খুচরো নেই?

পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া

তবে এই নাও বাপু! তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে 'গজভুক্ত-কপিত্থবৎ'।

কিন্তু, এই-যে টাকাগুলি দিলুম, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায়! একটা দামি জিনিস যদি কিছু পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামি জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ওই চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যে রকম দেখলুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া

বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটিও দিব্যি। তা হলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন!

পুলিস? পুলিস আসছে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কী দুষ্কর্ম করেছি? কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে।

তাই তো, সত্যিই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল? হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে। সবাই পালিয়েছে।

দেখো বাপু, গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াত নই।

উঃ! কর কী! লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না।

পেয়াদা বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও।

পকেটে হাত দিয়া

হায় হায়, একটি পয়সা নেই! দারোগা-সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত এতবড়ো চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? পেয়াদা-সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্‌ করে এতবড়ো অপবাদটা দিলে?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষকালে যদি চেন-মেন ছিঁড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী! এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা! সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, এখনি নিয়ে যাও। কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টানো কেন? আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা, নিতান্তই যদি না ছাড়তে পারো তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালো-বাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি— এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।—

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ।

* পৌষ ১৩০০

নূতন অবতার

প্রথম অঙ্ক। নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্বগত

তুমি রুদ্দুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ। আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে। ওই পুকুরে দু-বেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব, তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে।

সমাগত প্রতিবেশিবর্গের প্রতি

তা, তোমরা তো সব শুনেছ দেখছি। সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপরি-উপরি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখলুম— মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে আমার শিয়রের কাছে এসে বললেন, ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল তাই তুই রুদ্দুর বক্‌শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি। রুদ্দুর বক্‌শি কে তা জানিস? সত্যযুগে যে ছিল ভগীরথ সেই আজ বক্‌শির

ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগলি পুলের উপর দিয়ে যেদিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের ওই পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান করেছি।— তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ রে! কী কাণ্ডই করেছি! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কিনা গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা! এমন পাপও করে! এখন বুঝতে পারছি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই বা আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এলে। এ সমস্তই দেবতার কাণ্ড। তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মতো বেরোতে লাগল— আমি নিতান্ত মূঢ়মতি পাপিষ্ঠ ব'লে প্রকৃত তত্ত্ব তখনও বুঝতে পারলুম না— মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকিলে লুটে খেলে!

অশ্রুবিসর্জন। এবং ভক্তিবিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি-
সহকারে কলিযুগের ভগীরথ-দর্শনে গমন

দ্বিতীয় অঙ্ক। রুদ্রনারায়ণ বক্‌শি

স্বগত

তাই বটে!—ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল যে, আমি বড়ো কম লোক নই। এতদিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে। আর এও দেখেছি, ব্রাহ্মণের ওই পুষ্করিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল —থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত, ও পুকুরটা কোনোমতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারি অসুবিধে হচ্ছে। একেবারে সাফ মনেই ছিল না যে, আমি ভগীরথ আর মা গঙ্গা এখনও আমাকে ভুলতে পারেন নি। উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমাগুলো তার কাছে লাগে কোথায়!

ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে

তা কি আর আমি জানতেম না! কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি— কী জানি পাছে বিশ্বাস না করো। কলিকালে দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি তো কারও ভক্তি নেই। তা, ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।— কে গো তুমি? পায়ের ধুলো? তা, এই নাও।

পদপ্রসারণ

তুমি কী চাও গা? পাদোদক? এসো, এসো। নিয়ে এসো তোমার বাটি—এই নাও—খেয়ে ফেলো। ভোরবেলা থেকে পাদোদক দিতে দিতে আমার সর্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।— বাছা, তোমরা সব এসো, কিছু ভয় নেই। এতদিন আমাকে চিনতে পারো নি সে তো আর তোমাদের দোষ নয়। আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না; যেমন চলছে এমনিই চলবে— তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্দুর বক্‌শি বলেই জানবে।

ঈষৎ হাস্য

কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে দিলেন তখন আর লুকোতে পারলুম না। কথাটা সর্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখো-না হিন্দুপ্রকাশে কী লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট্ করে সেই কাগজখানা নিয়ে আয় তো। এই দেখো—কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী—লোকটার রচনা-শক্তি দিব্য আছে। আর সেই পরশুদিনকার বঙ্গতোষিণীখানা আন্ দেখি, তাতেও বড়ো বড়ো দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কী? খুঁজে পাচ্ছিস নে? হারিয়েছিস বুঝি? হারায় যদি তো তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখব না, তা জানিস! সে দিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে দিলুম আলমারির ভিতর তুলে রেখে দিস! পাজি বেটা! নচ্ছার বেটা! হারামজাদা বেটা! কোথায় আমার কাগজ হারালি বের করে দে! দে বের করে! যেখান থেকে পাস নিয়ে আয়, নইলে তোকে পুঁতে ফেলব বেটা!—ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশবাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে শুনিয়ে দাও তো, আমার আবার বাংলা পড়াটা ভালো অভ্যেস নেই।

কে গা? মতি গয়লানী বুঝি? তা এসো এসো—আমি পায়ের ধুলো দিচ্ছি—দুধের দাম নিতে এসেছ? এখনও শোন নি বুঝি? নন্দ মুখুজ্জেকে মা গঙ্গা কী স্বপন দিয়েছেন সে-সব খবর রাখ না? বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস—সে জলের মাহাত্ম্য জানিস? কেমন? সবার কাছে কথাটা শুনলি তো? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আয় গে যা।

এই এখনি যাচ্ছি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানি নে? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল? তা, কী করব বলো! লোকজন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধুলোর প্রত্যাশায় এসেছে, এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে? আচ্ছা, উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস—যারা আমাকে দেখতে আসবে সব বসিয়ে রাখিস। আমি এলুম ব'লে। খবরদার, দেখিস যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়। বলিস, ভগীরথ ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে। বুঝলি? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম ব'লে।

রেধো, তুই যে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! তোর কি মাথা নোয় না নাকি? তোর তো ভারি অহংকার দেখছি! বেটা, তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই। পাজি বেটা, তোকে জুতো মেরে বিদায় করে দেব তা জানিস? সবাই আমাকে ভক্তি করছে, আর তুই বেটা এতবড়ো খৃস্টান হয়েছিস যে আমাকে দেখে প্রণাম করিস নে! তোর পরকালের ভয় নেই! বেরো আমার বাড়ি থেকে।

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না! যে ভগীরথ মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ তো? ভুল করছ—ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে জেনো। বুঝেছ? মনে থাকবে তো? ভগীরথ—ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাস্টারের কাছে পড়ে নিয়ো। এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে দিই।

কই? ভাত কই? আমি আর সবুর করতে পারছি নে— দেশ-দেশান্তর থেকে সব লোক আসছে। কী গো গিন্নি, এত রাগ কিসের? হয়েছে কী? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জল তোলা, সমস্ত বন্ধ হয়েছে? কী করব বলো। আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে তো কাউকে বঞ্চিত করতে পারি নে। তা হলে আমি এত তপিস্যে করে এত কষ্ট করে গঙ্গা আনলুম কেন? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে— বটে! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জানতেন।— কী! এতবড়ো আস্পর্ধা— তুই বিশ্বাস করিস নে! জানিস, তোকে বিয়ে করে তোর চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেছি। বাপের বাড়ি যাবে? যাও-না! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আসতে দেব না। সেটা মনে রেখো। ভাত আর আছে তো? নেই? আমি যে তোমাকে বেশি করে রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম। আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে যে দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসেছে। যা রেঁধেছ এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলোবে না। রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এসো— তোমরা সব চিঁড়ে আনতে দাও— পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো। কী করব বলো। দূর থেকে নাম শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে, তাদের ফেরাতে পারব না। কী বললে! আমার হাতে পড়ে তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল? কী বলব, তুমি মুর্খু মেয়েমানুষ, ওই কথাটা একবার দেশের ভালো ভালো পণ্ডিতদের কাছে বলো দেখি। তারা তখনি মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জ্বলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন এ কথা কোনো শাস্ত্রের সঙ্গে ওই মিলছে না। তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চললুম।

বাহিরে আসিয়া

দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধুলো নিয়ে পুজো করে বেলা করে দিলেন। আমি বলি, থাক্‌ থাক্‌, আর কাজ নেই— তারা কি ছাড়ে! এসো, তোমরা একে একে এসো— যার যার ধুলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও।— কী হে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা তো যেতে পারছি নে। দর্শন করতে সব লোকজন আসছে। একতরফা ডিক্রি হবে? কী করব বলো। আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে একতরফা হয়। বিপ্‌নে, তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলি নে? এমনি করেই অধঃপাতে যাবে। আয়, এইখানে গড় কর্‌, এই নে, ধুলো নে, যা!

তৃতীয় অঙ্ক

ওহে মুখুজ্জে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রশি-দুয়েক তফাতে এলেই ভালো করতেন। তুমি তো, দাদা, স্বপ্ন দেখেই সারলে— আমাকে যে দিন-রাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগতে হচ্ছে। এক তো, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ভাবে আর পদ্মের পাতায় পচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে— মাছগুলো মরে মরে ভেসে উঠছে— যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সেদিন মনে হয় যেন নরককুণ্ডুর দক্ষিণের

জানলা-দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে—সাত জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার জো হয়। ছেলেগুলো যে ক'টা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে; কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তারের ফি দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হতে হল—তারা সব যমদূত, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখতে এলে পুরো ভিজিট আদায় করে ছাড়ে। সেও সহ্য হয়—কিন্তু খিড়কির ধারে ওই-যে দেশ-বিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে, ওইটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে। কাছাকাছি যে-সমস্ত বসতি ছিল সে-সমস্তই উঠে গেছে। রাত্তিরে যখন হরিবোল-হরিবোল শব্দ ওঠে এবং শেয়ালগুলো ডাকতে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী তো বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে চাকর-দাসী টিঁকতে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে দুপুরে দাঁত-কপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রেঁধে দেয় এমন লোক পাই নে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুনলে বুকের মধ্যে দুড়্‌দুড়্‌ করতে থাকে—বাড়িতে জনমানব নেই—গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারকব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে। আবার হয়েছে কী—ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়—সেদিন পশ্চিম থেকে দুজন এসেছিল, তাদের কথাই বুঝতে পারি নে। বেটারা ভক্তি করলে বটে, কিন্তু আমার থালাবাটি-গুলো চুরিও করে গেছে। এখান থেকে উঠে গেলে হয়তো ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয়কর্ম দেখতে সময় পাচ্ছি নে—আমার পত্তনি তালুকটার খাজনা বাকি পড়েছে; শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্ছে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। কী করি বলো তো দাদা! রুদ্‌দুর বক্‌শি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোনো ল্যাঠাই ছিল না—ভগীরথ হয়ে কোনো দিক সামলে উঠতে পারছি নে—আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে।—আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে—তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল আনবার জন্যে উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম—উকিল বললে, তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্যযুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়—স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে সমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে গেছে।—মতি গয়লানীর সঙ্গে এক রকম ঠিক হয়েছিল, আমি পাদোদক দেব আর সে দুধ দেবে—আজ দুদিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে; ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধুলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধুলো ঝেড়ে যাবে; ভয়ে কিছু বলতে পারছি নে। পুকুরটা তো গেছেই, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর-দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ—কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চলবে? রাস্তায় বেরোলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে যে, রুদ্‌দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।—এই তো বিপদে পড়া গেছে। দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখতে হচ্ছে। দোহাই তোমার, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড়ো বড়ো ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে

থাকতে পারবেন। আমার ওই পুকুরের জল যে রকম হয়ে এসেছে আর দুদিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়-সুদ্ধ মরে ভেসে উঠবে। আমার মতো ভগীরথ ঢের মিলবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশি দিন টিঁকবে কোনো ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে; কিন্তু আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারি নে। তাই স্থির করেছি, পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব. কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসত করতে হবে।

* পৌষ ১৩০১

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

প্রথম দৃশ্য

ক্ষীরো। ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম, গরিবের পড়ে মাথার ঘর্ম।
তুমি রানী, আছে টাকা শত শত, খেলাছলে করো দান ধ্যান ব্রত—
তোমার তো শুধু হুকুম মাত্র, খাটুনি আমারই দিবসরাত্র।
তবুও তোমারই সুযশ পুণ্য, আমার কপালে সকলই শূন্য।

নেপথ্যে। ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো!

ক্ষীরো। কেন ডাকাডাকি, নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি?

রানী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। হল কী! তুই যে আছিস রেগেই।

ক্ষীরো। কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।
কতই বা সয় রক্তমাংসে, কত কাজ করে একটা মানুষে!
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট—

কল্যাণী। কেন, এত তোর কিসের কষ্ট!

ক্ষীরো। যেথা যত আছে রামী ও বামী সকলেরই যেন গোলাম আমি।
হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর, সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।
ঘরেতে কারো তো চড়ে না অন্ন, তোমারই ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন।
হাড় বের হল বাসন মেজে, সৃষ্টির পান-তামাক সেজে।
একা একা এত খেটে যে মরি, মায়া দয়া নেই?

কল্যাণী। সে দোষ তোরই।
চাকর দাসী কি টিঁকিতে পারে তোমার প্রখর মুখের ধারে?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের, লোক গেলে শেষে আর্তনাদের
ধুম পড়ে যাবে—এর কি পথ্যি আছে কোনোরূপ!

ক্ষীরো। সে কথা সত্যি
সয় না আমার—তাড়াই সাধে! অন্যায় দেখে পরান কাঁদে।
কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে, টাকাকড়ি সব দু হাতে লোটে।
আমি না তাদের তাড়াই যদি তোমারে তাড়াত আমারে বধি।

কল্যাণী। ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু, সবাই ডাকাত—তুমিই সাধু!

ক্ষীরো। আমি সাধু! মা গো, এমন মিথ্যে মুখেও আনি নে, ভাবি নে চিত্তে।
নিই-থুই-খাই দু হাত ভরি, দু বেলা তোমায় আশিস করি।
কিন্তু তবু সে দু হাত-'পরে দু মুঠোর বেশি কতই ধরে?
ঘরে যত আনো মানুষ-জনকে তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে।
হাত যে সৃজন করেছে বিধি নেবার জন্যে জানো তো দিদি!
পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে কিছু আপনার রাখো তো ঢেকে,
তার পরে বেশি রহিলে বাকি চাকর-বাকর আনিয়ো ডাকি।

কল্যাণী। একা বটে তুমি! তোমার সাথি ভাইপো ভাইঝি নাতনি নাতি—
হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের, দুটো করে হাত নেই কি তাঁদের?
তোর কথা শুনে কথা না সরে, হাসি পায় ফের রাগও ধরে।
ক্ষীরো। বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত স্বভাব আমার শুধরিয়ে যেত।
কল্যাণী। ম'লেও যাবে না স্বভাবখানি নিশ্চয় জেনো।
ক্ষীরো। সে কথা মানি।
তাই তো ভরসা মরণ মোরে নেবে না সহসা সাহস ক'রে।
ওই-যে তোমার দরজা জুড়ে বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে—
কারো বা স্বামীর জোটে না খাদ্য, কারো বা বেটার মামীর শ্রাদ্ধ।
মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে, নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়া দানে।
নিতে চায় নিক, কত যে নিচ্ছে— চোখে ধুলো দেবে সেটা কি ইচ্ছে?
কল্যাণী। কেন তুই মিছে মরিস ব'কে? ধুলো দেয়, ধুলো লাগে না চোখে।
বুঝি আমি সব, এটাও জানি— তারা যে গরিব, আমি যে রানী।
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব— আমি দিই সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে, আমার সুখ সে আমার প্রাণে।
ক্ষীরো। নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু, দিয়ে-থুয়ে সুখ হইত তবু।
সামনে প্রণাম পদারবিন্দে, আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে!
কল্যাণী। সামনে যা পাই তাই যথেষ্ট, আড়ালে কী ঘটে জানেন কেষ্ট।
সে যাই হোক গে, শুধাই তোরে— কাল বৈকালে, বল্ তো মোরে,
অতিথিসেবায় অনেকগুলি কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি—
কেন বা ছিল না রস্‌করা?
ক্ষীরো। কেন করো মিছে মস্‌করা
দিদিঠাকরুন! আপন হাতে গুনে দিয়েছিনু সবার পাতে
দুটো দুটো ক'রে।
কল্যাণী। আপন চোখে দেখেছি পায় নি সকল লোকে,
খালি পাত—
ক্ষীরো। ওমা! তাই তো বলি— কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি
যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে! ভোলা ময়রার শয়তানি এ!
কল্যাণী। এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ, আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য!
ক্ষীরো। গয়লা তো নন যুধিষ্ঠির। যত বিষ তব কুদৃষ্টির
পড়েছে আমারই পোড়া অদৃষ্টে, যত ঝাঁটা সব আমারই পৃষ্ঠে.
হায় হায়—
কল্যাণী। ঢের হয়েছে. আর না— রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না।
ক্ষীরো। সত্যি কান্না কাঁদেন যাঁরা ওই আসছেন ঝেঁটিয়ে পাড়া।

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

প্রতিবেশিনীগণ। জয় জয় রানী, হও চিরজয়ী! কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী!

ক্ষীরো। ওগো রানীদিদি, শোন্ ওই শোন্— পাতে যদি কিছু হত অকুলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ উঠিত কি তবে জয়-জয় তান?
যদি দু-চারটে চন্দ্রপুলি দৈবগতিকে দিতে না ভুলি
তা হলে কি আর রক্ষে থাকত— হজম করতে বাপকে ডাকত।

কল্যাণী। আজ তো খাবার হয় নি কষ্ট?

প্রথমা। কত পাতে পড়ে হয়েছে নষ্ট—
লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ত্রুটি!

কল্যাণী। হাঁ গো, কে তোমার সঙ্গে উটি?
আগে তো দেখি নি।

দ্বিতীয়া। আমার মধু, তারি উটি হয় নতুন বধূ—
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে মা জননী!

ক্ষীরো। সেটা বুঝেছি ধরণে।

বধূর প্রতি

দ্বিতীয়া। প্রণাম করিবে, এসো ইদিকে, এই-যে তোমার রানীদিদিকে।

কল্যাণী। এসো কাছে এসো, লজ্জা কাদের?

আংটি পরাইয়া

আহা, মুখখানি দিব্যি ছাঁদের,
চেয়ে দেখ্ ক্ষীরি!

ক্ষীরো। মুখটি তো বেশ, তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ।

দ্বিতীয়া। শুধু রূপ নিয়ে কী হবে অঙ্গে! সোনা-দানা কিছু আনে নি সঙ্গে।

কল্যাণী। এসো ঘরে এসো।

ক্ষীরো। যাও গো ঘরে— সোনা পাবে শুধু বাণীর দরে।

[কল্যাণী ও বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান

প্রথমা। দেখলি মাগির কাণ্ড একি!

ক্ষীরো। কারে বাদ দিয়ে কারে বা দেখি।

তৃতীয়া। তা বলে এতটা সহ্য হয় না।

ক্ষীরো। অন্যের বউ পরলে গয়না
অন্যের তাতে জ্বলে যে অঙ্গ।

তৃতীয়া। মাসি, জানো তুমি কতই রঙ্গ—
এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে, হাসতে হাসতে নাড়ী যায় ফেটে।

প্রথমা। কিন্তু, যা বলো, আমাদের মাতা নাই তাঁর মতো এত বড়ো দাতা।

ক্ষীরো। অর্থাৎ কিনা, এত বড়ো হাবা জন্ম দেয় নি আর কারও বাবা।

তৃতীয়া। সে কথা মিথ্যে নয় নিতান্ত। দেখ্‌-না সেদিন কুশী ও ক্ষান্ত
কী ঠকান্‌টাই ঠকালে মা গো! আহা, মাসি তুমি সাধে কি রাগো!
আমাদেরই গায়ে হয় অসহ্য।

চতুর্থী। বুড়ো মহারাজা যে ঐশ্বর্য
রেখে গেছে সে কি এমনি ভাবে পাঁচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে!

প্রথমা। দেখলি তো ভাই, কানা আন্দি কত টাকা পেলে?

তৃতীয়া। বুড়ি ঠানদি
জুড়ে দিলে তার কান্না-অস্ত্র, নিয়ে গেল কত শীতের বস্ত্র।

চতুর্থী। বুড়ি মাগি, তার শীত কি এতই! কাঁথা হলে চলে, নিয়ে গেল লুই।
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে— এ যে বাড়াবাড়ি।

প্রথমা। সে কথা যাগ্‌গে

চতুর্থী। না না, তাই বলি, হও-নাকো দাতা, তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা!
যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল
কানা খোঁড়া নুলো যে আসে মরতে বাচ-বিচার কি হবে না করতে!

তৃতীয়া। দেখ্‌-না ভাই সে গোপালের মাকে দু টাকা দিলেই খেয়ে প'রে থাকে–
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ, এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।

চতুর্থী। আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা মেয়েমানুষের এতগুলো টাকা।

তৃতীয়া। কত লোকে কত করে যে রটনা—

প্রথমা। সেগুলো তো সব মিথ্যে ঘটনা।

চতুর্থী। সত্যি মিথ্যে দেব্‌তা জানে, রটেছে তো কথা পাঁচের কানে—
সেটা যে ভালো না।

প্রথমা। যা বলিস, ভাই, এমন মানুষ ভূভারতে নাই।
ছোটো-বড়ো-বোধ নাইকো মনে, মিষ্টি কথাটি সবার সনে।

ক্ষীরো। টাকা যদি পাই বাক্‌স ভ'রে আমার গলাও গলাবে তোরে।
'বাপু' বললেই মিলবে স্বর্গ, 'বাছা' বললেই বলবি 'ধর্‌ গো'।
মনে ঠিক জেনো, আসল মিষ্টি কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।

চতুর্থী। তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি— সবার সঙ্গে এত মেশামেশি।
বড়ো লোক তুমি ভাগ্যিমন্ত, সেইমত চাই চাল-চলন তো?

তৃতীয়া। দেখলি! সেদিন শশীর বাঁ গালে আপনার হাতে ওষুধ লাগালে!

চতুর্থী। বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর, তারে কেন এত যত্ন আদর!

তৃতীয়া। কত লোক আছে, কেদারের মাকে কেন বলো দেখি দিনরাত ডাকে।
গয়লাপাড়ার কেষ্টদাসী তারই সাথে কত গল্প হাসি—
যেন সে কতই বন্ধু পুরোনো।

চতুর্থী। ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো।

ক্ষীরো। এ সংসারের ওই তো প্রথা, দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকো কথা।
ভাত তুলে দেন মোদের মুখে, নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়, নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয়।

চতুর্থী। ওই বউ নিয়ে ফিরে এল নেকি।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ

প্রথমা। কী পেলি লো বিধু, দেখি দেখি দেখি।
দ্বিতীয়া। শুধু একজোড়া রতনচক্র।
তৃতীয়া। বিধি আজ তোরে বড়োই বক্র।
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে, ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে।
চতুর্থী। মেয়ের বিয়েতে পেয়ারি বুড়ি পেয়েছিল হার, তা ছাড়া চুড়ি।
দ্বিতীয়া। আমি যে গরিব নই যথেষ্ট, গরিবিআনায় সে মাগি শ্রেষ্ঠ—
অদৃষ্টে যার নেইকো গয়না গরিব হয়ে সে গরিব হয় না!
চতুর্থী। বড়ো মানুষের বিচার তো নেই। কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই,
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।
প্রথমা। টাকাটা শিকেটা কুমড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভালো, কে দেয় তাই বা?
দ্বিতীয়া। অবিচারে দান দিলেন নাই বা।
মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নীচে ভরি কত সোনা পেলেম মিছে।
ক্ষীরো। মালক্ষ্মী যদি হতেন সদয় দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়।
দ্বিতীয়া। আহা, তাই হোক, লক্ষ্মীর বরে তোর ঘরে যেন টাকা নাহি ধরে।
প্রথমা। ওলো, থাম্ তোরা, রাখ্ বকুনি— রানীর পায়ের শব্দ শুনি।

উচ্চৈঃস্বরে

চতুর্থী। আহা, জননীর অসীম দয়া, ভগবতী যেন কমলালয়া।
দ্বিতীয়া। হেন নারী আর হয় নি সৃষ্টি, সবা-'পরে তাঁর সমান দৃষ্টি।
তৃতীয়া। আহা মরি, তাঁরই হস্তে আসি সার্থক হল অর্থরাশি।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। রাত হল, তবু কিসের কমিটি?
ক্ষীরো। সবাই তোমার যশের জমিটি
নিড়োতেছিলেন চষতেছিলেন, মই দিয়ে ক'ষে ঘষতেছিলেন—
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে বুনেছি ফসল আশ মিটিয়ে।
কল্যাণী। রাত হল, আজ যাও সবে ঘরে। এই ক'টি কথা রেখো মনে ক'রে—
আশার অন্ত নাইকো বটে, আর-সকলেরই অন্ত ঘটে।
সবার মনের মতন ভিক্ষে দিতে যদি হত কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত—আমি তো তুচ্ছ। নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিখি— ভালো কথা বলা শক্ত বেশি কি?
[প্রস্থান

চতুর্থী। কী বলছিলেম ছিল সেই খোঁজে।
ক্ষীরো। না গো না, তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সামনে তোমরা যেটুকু বাড়ালে সেটুকু কমিয়ে আনবে আড়ালে।

উপকার যেন মধুর পাত্র, হজম করতে জ্বলে যে গাত্র—
তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি নিন্দে-বান্দা কান্না-কাটনি।
যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে জ্বালান তারেই গোপন হুলে।
দেবতারে নিয়ে বানাবে দৈত্য কলিকাল তবে হবে তো সত্যি।

চতুর্থী। মিথ্যে না ভাই! সামলে চলিস। যাই মুখে আসে তাই যে বলিস!
পালন যে করে সে হল মা-বাপ, তাহারই নিন্দে সে যে মহাপাপ!
এমন লক্ষ্মী এমন সতী কোথা আছে হেন পুণ্যবতী?
যেমন ধনের কপাল মস্ত তেমনি দানের দরাজ হস্ত,
যেমন রূপসী তেমনি সাধ্বী— খুঁত ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি!
দিস নেকো দোষ তাঁহার নামে।

তৃতীয়া। তুমি থামলে যে অনেক থামে।

দ্বিতীয়া। আহা, কোথা হতে এলেন গুরু! হিতকথা আর কোরো না শুরু।
হঠাৎ ধর্মকথার পাঠটা তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা।

ক্ষীরো। ধর্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্, গলা ছেড়ে আর বাজিয়ো না ঢাক।
পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে— বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজো গোবিন্দে।

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান

ওরে বিনি. ওরে কিনি, ওরে কাশী!

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ

কাশী। কেন দিদি?

কিনি। কেন খুড়ি?

বিনি। কেন মাসি?

ক্ষীরো। ওরে. খাবি আয়।

বিনি। কিছু নেই খিদে।

ক্ষীরো। খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে।

কিনি। রসকরা খেয়ে পেট বড়ো ভার।

ক্ষীরো। বেশি কিছু নয়, শুধু গোটা চার
ভোলা ময়রার চন্দ্রপুলি দেখ্ দেখি ওই ঢাক্না খুলি—
তাই মুখে দিয়ে, দু'বাটি-খানিক দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মীমানিক!

কাশী। কত খাব, দিদি, সমস্ত দিন?

ক্ষীরো। খাবার তো নয় খিদের অধীন।
পেটের জ্বালায় কত লোকে ছোটে, খাবার কি তার মুখে এসে জোটে?
দুঃখী গরিব কাঙাল ফতুর চাষাভুষো মুটে অনাথ অতুর
কারও তো খিদের অভাব হয় না— চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস যেটার যা দর— খাবার চাইতে খিদের আদর!
হাঁ রে বিনি, তোর চিরুনি রুপোর দেখছি নে কেন খোঁপার উপর?

বিনি। সেটা ও-পাড়ার খেতুর মেয়ে কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে।

ক্ষীরো। ওই রে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া। তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া!

বিনি। আহা, কিছু তার নেই যে মাসি!
ক্ষীরো। তোমারই কি এত টাকার রাশি?
গরিব লোকের দয়ামায়া রোগ সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ।
না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে— হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়ীতে।
রানী যত দেয় ফুরোয় না, তাই দান ক'রে তার কোনো ক্ষতি নাই।
তুই যেটা দিলি রইল না তোর, এতেও মনটা হয় না কাতর?
ওরে বোকা মেয়ে, আমি আরো তোরে আনিয়ে নিলেম এই মনে ক'রে
কী করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে।
কে জানত, তুই পেট না ভরতে উল্‌টো বিদ্যে শিখবি মরতে!
দুধ যে রইল বাটির তলায়, ওইটুকু বুঝি গলে না গলায়?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ কোরো দান ধ্যান আর উপবাস।
যতদিন আমি রয়েছি বর্তে দেব না করতে আত্মহত্যে।
খাওয়াদাওয়া হল, এখন তবে রাত হল ঢের, শোও গে সবে।
[কিনি বিনি কাশীর প্রস্থান

কল্যাণীর প্রবেশ

ওগো দিদি, আমি বাঁচি নে তো আর—
কল্যাণী। সেটা বিশ্বাস হয় না আমার।
তবু কী হয়েছে শুনি ব্যাপারটা।
ক্ষীরো। মাইরি দিদি, এ নয়কো ঠাট্টা।
দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার বাঁচে কি না-বাঁচে খুড়িটি আমার—
শক্ত অসুখ হয়েছে এবার, টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার।
কল্যাণী। এখনো বছর হয় নি গত, খুড়ির শ্রাদ্ধে নিলি যে কত!
ক্ষীরো। হাঁ হাঁ, বটে বটে, মরেছে বেটি— খুড়ি গেছে, তবু আছে তো জেঠি।
আহা রানীদিদি, ধন্য তোরে এত রেখেছিস স্মরণ করে!
এমন বুদ্ধি আর কি আছে! এড়ায় না কিছু তোমার কাছে।
ফাঁকি দিয়ে খুড়ি বাঁচবে আবার, সাধ্য কি আছে সে তার বাবার!
কিন্তু, কখনো আমার সে জেঠি মরে নি পূর্বে, মনে রেখো সেটি।
কল্যাণী। মরেও নি বটে, জন্মে নি কভু।
ক্ষীরো। এমন বুদ্ধি, দিদি, তোর—তবু
সে বুদ্ধিখানি কেবলই খেলায় অনুগত এই আমারই বেলায়?
কল্যাণী। চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা! না বললে নয় মিথ্যে কথাটা?
ধরা পড়ো, তবু হও না জব্দ?
ক্ষীরো। 'দাও দাও' ও তো একটা শব্দ,
ওটা কি নিত্যি শোনায় মিষ্টি? মাঝে মাঝে তাই নতুন সৃষ্টি
করতেই হয় খুড়ি-জেঠিমার। জানো তো সকলই, তবে কেন আর
লজ্জা দেওয়া?
কল্যাণী। অমনি চেয়ে কি পাস নি কখনো, তাই বল্‌ দেখি।

ক্ষীরো। মরা পাখিরেও শিকার ক'রে তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে।
সহজেই পাই, তবু দিয়ে ফাঁকি স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি।
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে প্রয়োজন-কালে ঠিক সে থাকে।
সত্যি বলছি, মিথ্যে কথায় তোমারও কাছেতে ফল পাওয়া যায়।

কল্যাণী। এবার পাবে না।

ক্ষীরো। আচ্ছা, বেশ তো, সেজন্যে আমি নইকো ব্যস্ত।
আজ না হয় তো কাল তো হবে— ততখন মোর সবুর সবে।
গা ছুঁয়ে কিন্তু বলছি তোমার— খুড়িটার কথা তুলব না আর।

[কল্যাণীর হাসিয়া প্রস্থান

হরি বলো মন! পরের কাছে আদায় করার সুখও আছে,
দুঃখও ঢের।— হে মা লক্ষ্মীটি, তোমার বাহন পেঁচাপক্ষীটি
এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া, এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া,
ভুলে কোনোদিন আমার পানে তোমারে যদি সে বহিয়া আনে—
মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর, জলপান দিই আশিটা ইঁদুর,
খেয়েদেয়ে শেষে পেটের ভারে পড়ে থাকে বেটা আমারই দ্বারে—
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে ওড়বার পথ বন্ধ হবে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

কে আবার রাতে এসেছ জ্বালাতে দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে?
আর তো পারি নে।

লক্ষ্মী। পালাব তবে কি যেতে হবে দূরে।

ক্ষীরো। রোসো রোসো, দেখি।
কী পরেছ ওটা মাথার ওপর? দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর!
হাতে কী রয়েছে সোনার বাক্সে দেখতে পারি কি? আচ্ছা, থাক্ সে।
এত হীরে সোনা কারও তো হয় না— ওগুলো তো নয় গিলটি গয়না?
এগুলি তো সব সাঁচ্চা পাথর? গায়ে কী মেখেছ, কিসের আতর?
ভুর ভুর করে পদ্মগন্ধ— মনে কত কথা হতেছে সন্দ।
বোসো বাছা, কেন এলে এত রাতে?
আমারে তো কেউ আস নি ঠকাতে?
যদি এসে থাকো, ক্ষীরিকে তা হলে চিনতে পারো নি সেটা রাখি ব'লে।
নাম কী তোমার বলো দেখি খাঁটি— মাথা খাও, বোলো সত্য কথাটি।

লক্ষ্মী। একটা তো নয়, অনেক যে নাম।

ক্ষীরো। হাঁ হাঁ, থাকে বটে স্বনাম বেনাম
ব্যাবসা যাদের ছলনা করা। কখনো কোথাও পড় নি ধরা?

লক্ষ্মী। ধরা পড়ি বটে দুই-দশ দিন, বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন।

ক্ষীরো। হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে— অমন করলে হবে না সুবিধে।
নামটি তোমার বলো অকপটে।

লক্ষ্মী। লক্ষ্মী।

ক্ষীরো। তেমনি চেহারাও বটে।

লক্ষ্মী তো আছে অনেকগুলি, তুমি কোথাকার বলো তো খুলি।

লক্ষ্মী। সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক নাই ত্রিভুবনে।

ক্ষীরো। ঠিক ঠিক ঠিক।—

তাই বলো মা গো, তুমিই কি তিনি?

আলাপ তো নেই, চিনতে পারি নি।

চিনতেম যদি চরণজোড়া কপাল হত কি এমন পোড়া!

এসো, বোসো, ঘর করোসে আলো। পেঁচাদাদা মোর আছে তো ভালো?

এসেছ যখন তখন, মাতঃ, তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না তো।

জোগাড় করছি চরণ-সেবার, সহজ হস্তে পড় নি এবার—

সেয়ানা লোকেরে করো না মায়া কেন যে জানি তা বিষ্ণুজায়া!

না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাকলে, বোকারই বিপদ তুমি না রাখলে।

লক্ষ্মী। প্রতারণা ক'রে পেটটি ভরাও, ধর্মেরে তুমি কিছু না ডরাও?

ক্ষীরো। বুদ্ধি দেখলে এগোও না গো, তোর দয়া নেই কাজেই মা গো—

বুদ্ধিমানেরা পেটের দায় লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায়।

লক্ষ্মী। সরলবুদ্ধি আমার প্রিয়, বাঁকা বুদ্ধিরে ধিক্ জানিয়ো।

ক্ষীরো। ভালো তলোয়ার যেমন বাঁকা তেমনি বক্রবুদ্ধি পাকা।

ও জিনিস বেশি সরল হলে নির্‌বুদ্ধি তো তারেই বলে।

ভালো মা গো, তুমি দয়া করো যদি বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি।

লক্ষ্মী। কল্যাণী তোর অমন প্রভু— তারেও, দস্যু, ঠকাও তবু!

ক্ষীরো। অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর, যার লাগি চুরি সেই বলে চোর!

ঠকাতে হয় যে কপাল-দোষে, তোরে ভালোবাসি ব'লেই তো সে।

আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ো— আমারে ঠকিয়ে যেয়ো না তুমিও।

লক্ষ্মী। স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষ।

ক্ষীরো। তাহার কারণ আমি যে দুঃখী।

তুমি যদি করো রসের বৃষ্টি স্বভাবটা হবে আপনি মিষ্টি।

লক্ষ্মী। তোরে যদি আমি করি আশ্রয় যশ পাব কিনা সন্দেহ হয়।

ক্ষীরো। যশ না পাও তো কিসের কড়ি? তবে তো আমার গলায় দড়ি!

দশের মুখেতে দিলেই অন্ন দশমুখে উঠে 'ধন্য ধন্য'।

লক্ষ্মী। প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?

ক্ষীরো। একবার তুমি করো পরীক্ষে।

পেট ভ'রে গেলে যা থাকে বাকি সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কী?

দানের গরবে যিনি গরবিনি তিনি হোন আমি আমি হই তিনি।

দেখবে তখন তাঁহার চালটা, আমারই বা কত উল্‌টো-পাল্‌টা।

দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি— রানী করো, পাব রানীর প্রকৃতি।

তাঁরও যদি হয় মোর অবস্থা সুযশ হবে না এমন সস্তা।

তাঁর দয়াটুকু পাবে না অন্যে, ব্যয় হবে সেটা নিজেরই জন্যে।

কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ   অনেকখানিই হবেক ধ্বংস।
দিতে গেলে কড়ি কভু না সরবে,   হাতের তেলোয় কামড়ে ধরবে।
ভিক্ষে করতে, ধরতে দু পায়   নিত্যি নতুন উঠবে উপায়।

লক্ষ্মী। তথাস্তু, রানী করে দিনু তোকে।   দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।
কিন্তু, সদাই থেকো সাবধান,   আমার না যেন হয় অপমান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রানীবেশে ক্ষীরো ও তাহার পারিষদবর্গ

ক্ষীরো। বিনি!

বিনি। কেন মাসি?

ক্ষীরো। মাসি কী রে মেয়ে!   দেখি নি তো আমি বোকা তোর চেয়ে!
কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষি   তারাই মাসিরে বলে শুধু 'মাসি'।
রানীর বোনঝি হয়েছ ভাগ্যে,   জান না আদব? মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। রানীর বোনঝি রানীরে কী ডাকে   শিখিয়ে দে ওই বোকা মেয়েটাকে।

মালতী। ছি ছি, শুধু মাসি বলে কি রানীকে! রানীমাসি বলে, রেখে দিয়ো শিখে।

ক্ষীরো। মনে থাকবে তো? কোথা গেল কাশী?

কাশী। কেন রানীদিদি?

ক্ষীরো। চার-চার দাসী
নেই যে সঙ্গে?

কাশী। এত লোক মিছে   কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে!

ক্ষীরো। মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে   শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে।

মালতী। তোমরা তো নও জেলেনি তাঁতিনি,   তোমরা হও যে রানীর নাতিনি।
যে নবাববাড়ি এনু আমি ত্যেজি   সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি,
তাহারই একটা ছোটো বাচ্ছার   পিছনেতে ছিল দাসী চার-চার--
তা ছাড়া সেপাই।

ক্ষীরো। শুনলি তো কাশী?

কাশী। শুনেছি।

ক্ষীরো। তা হলে ডাক্ তোর দাসী।
কিনি পোড়ামুখি!

কিনি। কেন রানীখুড়ি?

ক্ষীরো। হাই তুললেম, দিলি নে যে তুড়ি?
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। শেখাও কায়দা।

মালতী। এত বলি, তবু হয় না ফায়দা।
বেগম-সাহেব যখন হাঁচেন তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন।
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে।
ক্ষীরো। সোনার বাটায় পান দে তারিণী! কোথা গেল মোর চামরধারিণী?
তারিণী। চলে গেছে ছুঁড়ি। সে বলে, 'মাইনে চেয়ে চেয়ে তবু কিছুতে পাই নে।'
ক্ষীরো। ছোটোলোক বেটি হারামজাদি রানীর ঘরে সে হয়েছে বাঁদি,
তবু মনে তার নেই সন্তোষ— মাইনে পায় না ব'লে দেয় দোষ!
পিঁপড়ের পাখা কেবল মরতে। মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। মাগিরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা— না না, যাবে আরও দুজন জেয়াদা।
কী বল মালতী?
মালতী। দস্তুর তাই।
ক্ষীরো। হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই।
তারিণী। ও পাড়ার মতি রানীমাতাজির চরণ দেখতে হয়েছে হাজির।
ক্ষীরো। মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। নবাবের ঘরে কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে?
মালতী। কুর্নিশ ক'রে ঢোকে মাথা নুয়ে, পিছু হটে যায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
ক্ষীরো। নিয়ে এসো সাথে, যাও তো মালতী, কুর্নিশ ক'রে আসে যেন মতি।

মতিকে লইয়া

মালতীর পুনঃপ্রবেশ

মালতী। মাথা নিচু করো। মাটি ছোঁও হাতে, লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে।
তিন পা এগোও, নিচু করো মাথা।
মতি। আর তো পারি নে, ঘাড়ে হল ব্যথা।
মালতী। তিনবার নাকে লাগাও হাতটা।
মতি। টন্ টন্ করে পিঠের বাতটা।
মালতী। তিন পা এগোও, তিনবার ফের্ ধুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।
মতি। ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ, এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খত।
জয় রানীমার! একাদশী আজি—
ক্ষীরো। রানীর জ্যোতিষী শুনিয়েছে পাঁজি।
কবে একাদশী কবে কোন্ বার লোক আছে মোর তিথি গোনবার।
মতি। টাকাটা সিকেটা যদি কিছু পাই 'জয় জয়' বলে বাড়ি চলে যাই।
ক্ষীরো। যদি না'ই পাও তবু যেতে হবে, কুর্নিশ করে চলে যাও তবে।
মতি। ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি, তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি!

ক্ষীরো। ঘরের জিনিস ঘরেরই ঘড়ায় চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। এবার মাগিরে কুর্নিশ করে নিয়ে যাও ফিরে।

মতি। চললেম তবে—

মালতী। রোসো, ফিরো নাকো, তিনবার মাটি তুলে নাকে মাখো।
তিন পা কেবল হটে যাও পিছু— পোড়ো না উল্টে, মাথা করো নিচু।

মতি। হায়, কোথা এনু! ভরল না পেট, বারে বারে শুধু মাথা হল হেঁট।
আহা, কল্যাণী রানীর ঘরে কর্ণ জুড়োয় মধুর স্বরে—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই, হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই।

ক্ষীরো। সে ছাই পাবার ভরসা কোরো না।

মালতী। সাবধানে হঠো, উল্টে পোড়ো না।

[মতির প্রস্থান

ক্ষীরো। বিনি!

বিনি। রানীমাসি!

ক্ষীরো। একগাছি চুড়ি হাত থেকে তোর গেছে নাকি চুরি?

বিনি। চুরি তো যায় নি।

ক্ষীরো। গিয়েছে হারিয়ে?

বিনি। হারায় নি।

ক্ষীরো। কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে?

বিনি। না গো রানীমাসি!

ক্ষীরো। এটা তো মানিস— পাখা নেই তার! একটা জিনিস
হয় চুরি যায়, নয় তো হারায়, নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়,
তা না হলে থাকে—এ ছাড়া তাহার কী যে হতে পারে জানি নে তো আর।

বিনি। দান করেছি সে।

ক্ষীরো। দিয়েছিস দানে? ঠকিয়েছে কেউ, তারই হল মানে।
কে নিয়েছে বল্।

বিনি। মল্লিকা দাসী। এমন গরিব নেই রানীমাসি,
ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে— মাস পাঁচ-ছয় মাইনে না পেয়ে
খরচপত্র পাঠাতে পারে না, দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কেঁদে কেঁদে মরে, তাই চুড়িগাছি লুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।
অনেক তো চুড়ি আছে মোর হাতে, একখানা গেলে কী হবে তাহাতে?

ক্ষীরো। বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যানা। একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একেবারে ভারি নিশ্চয়। কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,
যেটা দিয়ে ফেল সেটা তো রয় না— এর চেয়ে কথা সহজ হয় না।
অল্পস্বল্প যাদের আছে দানে যশ পায় লোকের কাছে।
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে, যত দেও তত পেট বেড়ে চলে,
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ— ভাবে, 'আরও ঢের দিতে যে পারত'।

অতএব, বাছা, হবি সাবধান— বেশি আছে ব'লে করিস নে দান।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। বোকা মেয়েটি এ, এরে দুটো কথা দাও সমঝিয়ে।

মালতী। রানীর বোনঝি রানীর অংশ, তফাতে থাকবে উচ্চ বংশ—
দান করা-টরা যত হয় বেশি গরিবের সাথে তত ঘেঁষাঘেঁষি।
পুরোনো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক— গরিবের মতো নেই ছোটোলোক।

ক্ষীরো। মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। মল্লিকাটারে আর তো রাখা না!

মালতী। তাড়াব তাহারে।
ছেলেমেয়েদের দয়ার চর্চা বেড়ে গেলে, সাথে বাড়বে খরচা।

ক্ষীরো। তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা বালাটা-সুদ্ধ যেন তাড়িয়ো না।—
বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি, দেখে আয় মোর ছয়-ছয় দাসী।

তারিণীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

মালতী। মধুদত্তর পৌত্রের বিয়ে, ধুম ক'রে তাই চলে পথ দিয়ে!

ক্ষীরো। রানীর বাড়ির সামনের পথে বাজিয়ে যাচ্ছে কী নিয়ম-মতে!
বাঁশির বাজনা রানী কি সইবে! মাথা ধ'রে যদি থাকত দৈবে!
যদি ঘুমোতেন, কাঁচা ঘুমে জেগে অসুখ করত যদি রেগেমেগে!
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। নবাবের ঘরে এমন কাণ্ড ঘটলে কী করে?

মালতী। যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে— দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে
কেবলই বাজায় দুটো-দুটো বাঁশি, তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি।

ক্ষীরো। ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার, নিয়ে যাক দশ জুতোবর্দার—
ফি লোকের পিঠে দশ ঘা চাবুক সপাসপ বেগে সজোরে নাবুক।

মালতী। তবু যদি কারও চেতনা না হয়, বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয়।

প্রথমা। ফাঁসি হল মাফ, বড়ো গেল বেঁচে, 'জয় জয়' ব'লে বাড়ি যাবে নেচে।

দ্বিতীয়া। প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ, চাবুক ক' ঘা তো অনুগ্রহ।

তৃতীয়া। বলিস কী ভাই, ফাঁড়া গেল কেটে— আহা এত দয়া রানীমার পেটে!

ক্ষীরো। থাম্ তোরা, শুনে নিজ গুণগান লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান।
বিনি!

বিনি। রানীমাসি!

ক্ষীরো। স্থির হয়ে রবি! ছট্‌ফট্ করা বড়ো বেয়াদবি।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। মেয়েরা এখনো শেখে নি আমিরি দস্তুর কোনো।

বিনির প্রতি

মালতী। রানীর ঘরের ছেলেমেয়েদের ছট্‌ফট্‌ করা ভারি নিন্দের।
ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলো।
রাজারানীদের পুত্রকন্যে অধীর হয় না কিছুরই জন্যে।
হাত-পা সামলে খাড়া হয়ে থাকো, রানীর সামনে নোড়োচোড়ো নাকো।
ক্ষীরো। ফের গোলমাল করছে কাহারা? দরজায় মোর নাই কি পাহারা?
তারিণী। প্রজারা এসেছে নালিশ করতে।
ক্ষীরো। আর কি জায়গা ছিল না মরতে?
মালতী। প্রজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী, ছোটোলোকদের এত কি ভাগ্যি!
প্রথমা। তাই যদি হবে তবে অগণ্য নোকর চাকর কিসের জন্য?
দ্বিতীয়া। নিজের রাজ্যে রাখতে দৃষ্টি রাজারানীদের হয় নি সৃষ্টি।
তারিণী। প্রজারা বলছে, কর্মচারী পীড়ন তাদের করছে ভারি।
নাই দয়া মায়া, নাইকো ধর্ম, বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম।
বলে তারা, 'হায়, কী করেছি পাপ— এত ছোটো মোরা, এত বড়ো চাপ!'
ক্ষীরো। সর্ষেও ছোটো তবু সে ভোগায়, চাপ না পেলে কি তৈল জোগায়?
টাকা জিনিসটা নয় পাকা ফল, টুপ করে খ'সে ভরে না আঁচল
ছিঁড়ে, নাড়া দিয়ে, ঠেঙার বাড়িতে তবে ও জিনিস হয় যে পাড়িতে।
তারিণী। সেজন্যে না মা, তোমার খাজনা বঞ্চনা করা তাদের কাজ না।
তারা বলে, যত আমলা তোমার মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁয়ার।
লুটপাট করে মারছে প্রজা, মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।
ক্ষীরো। রানী বটি, তবু নইকো বোকা, পারবে না দিতে মিথ্যে ধোঁকা—
করবেই তারা দস্যুবৃত্তি, মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।
প্রজাদের ঘরে ডাকাতি করে, তা বলে করবে রানীরও ঘরে!
তারিণী। তারা বলে, রানী কল্যাণী যে নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।
নালিশ শোনেন নিজের কানেই, প্রজাদের 'পরে জুলুমটা নেই।
ক্ষীরো। ছোটো মুখে বলে বড়ো কথাগুলো— আমার সঙ্গে অন্যের তুলা?
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। কী কর্তব্য?
মালতী। জরিমানা দিক যত অসভ্য
এক-শো এক-শো।
ক্ষীরো। গরিব ওরা যে, তাই একেবারে এক-শো'র মাঝে
নব্বই টাকা করে দিনু মাপ।
প্রথমা। আহা, গরিবের তুমিই মা-বাপ।
দ্বিতীয়া। কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে।
তৃতীয়া। নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ট্যাঁকে।
হাজার টাকার ন-শো নব্বই চোখের পলকে পেল সর্বই।

চতুর্থী। এক দমে, ভাই, এত দিয়ে ফেলা অন্য কে পারে— এ তো নয় খেলা!
ক্ষীরো। বলিস নে আর মুখের আগে, নিজগুণ শুনে শরম লাগে।
বিনি!
বিনি। রানীমাসি!
ক্ষীরো। হঠাৎ কী হল, ফোঁস ফোঁস করে কাঁদিস কেন লো?
দিনরাত আমি বকে বকে খুন, শিখলি নে কিছু কায়দা-কানুন?
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে।
মালতী। রানীর বোনঝি জগতে মান্য, বোঝ না এ কথা অতি সামান্য—
সাধারণ যত ইতর লোকেই সুখে হাসে, কাঁদে দুঃখশোকেই।
তোমাদেরও যদি তেমনি হবে, বড়োলোক হয়ে হল কী তবে!

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। মাইনে না পেলে মিথ্যে চাকরি, বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাকড়ি।
ধার করে খেয়ে পরের গোলামি, এমন কখনো শুনি নি তো আমি!
মাইনে চুকিয়ে দাও— তা না হলে ছুটি দাও, আমি ঘরে যাই চলে।
ক্ষীরো। মাইনে চুকোনো নয়কো মন্দ, তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ।
বড়ো ঝঞ্ঝট মাইনে বাঁটতে, হিসেব-কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।
ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর, খুলতে হয় না খাতাপত্তর।
ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ, নিমেষ ফেলতে কর্ম-নিকেশ।
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। সাথে যাও ওর— ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ো কাপড়-চোপড়,
ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত হিন্দুস্থানি দস্তুর-মত।
মালতী। বুঝেছি রানীজি!
ক্ষীরো। আচ্ছা, তা হলে কুর্নিশ করে যাক বেটি চলে।
[কুর্নিশ করাইয়া দাসীকে বিদায়
দাসী। দুয়ারে রানীমা, দাঁড়িয়ে আছে কে, বড়ো লোকের ঝি মনে হয় দেখে।
ক্ষীরো। এসেছে কি হাতি কিম্বা রথে?
দাসী। মনে হল যেন হেঁটে এল পথে।
ক্ষীরো। কোথা তবে তার বড়োলোকত্ব?
দাসী। রানীর মতন মুখটি সত্য।
ক্ষীরো। মুখে বড়োলোক লেখা নাহি থাকে, গাড়িঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। রানী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে রানীজির সাথে দেখা করিবারে।
ক্ষীরো। হেঁটে এসেছেন?

মালতী। শুনেছি তাই তো।
ক্ষীরো। তা হলে হেথায় উপায় নাই তো।
সমান আসন কে তাহারে দেয়? নিচু আসনটা সেও অন্যায়।
এ এক বিষম হল সমিস্যে, মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে!
প্রথমা। মাঝখানে রেখে রানীজির গদি তাহার আসন দূরে রাখি যদি?
দ্বিতীয়া। ঘুরায়ে যদি এ আসনখানি পিছন ফিরিয়া বসেন রানী?
তৃতীয়া। যদি বলা যায় 'ফিরে যাও আজ— ভালো নেই আজ রানীর মেজাজ'?
ক্ষীরো। মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। কী করি উপায়?
মালতী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখাশোনা, তবে সব গোল মেটে।
ক্ষীরো। এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে!
সেই ভালো। আগে দাঁড়া সার বাঁধি আমার এক-শো-পঁচিশটে বাঁদি।
ও হল না ঠিক— পাঁচ পাঁচ ক'রে দাঁড়া ভাগে ভাগে— তোরা আয় সরে—
না না, এই দিকে— না না, কাজ নেই, সারি সারি তোরা দাঁড়া সামনেই—
না না, তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে, কোনাকুনি তোরা দাঁড়া দেখি বেঁকে।
আচ্ছা, তা হলে ধ'রে হাতে হাতে খাড়া থাক্‌ তোরা একটু তফাতে।
শশী, তুই সাজ ছত্রধারিণী, চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী!
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। এইবার তারে ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে!
[মালতীর প্রস্থান
কিনি, বিনি, কাশী, স্থির হয়ে থাকো— খবর্দার কেউ নোড়োচোড়ো নাকো।
মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ

কল্যাণী। আছ তো কুশলে?
ক্ষীরো। আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি, পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি—
এইভাবে চলে জগৎসুদ্ধ নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ।
কল্যাণী। ভালো আছ বিনি?
বিনি। ভালোই আছি মা— ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা?
ক্ষীরো। বিনি, করিস নে মিছে গোলযোগ— ঘুচল না তোর কথা-কওয়া রোগ!
কল্যাণী। রানী, যদি কিছু না করো মনে, কথা আছে কিছু, কব গোপনে।
ক্ষীরো। আর কোথা যাব, গোপন এই তো, তুমি আমি ছাড়া কেহই নেই তো।
এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু, রানীর সঙ্গে ফেরে পিছু-পিছু।
হেথা হতে যদি করে দিই দূর হবে না তো সেটা ঠিক দস্তুর।
কী বল মালতী?

মালতী। আজ্ঞে, তাই তো। দস্তুরমত চলাই চাই তো।
ক্ষীরো। সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে। খুঁজে দেখ দেখি।
দাসী। এই-যে এখানে।
ক্ষীরো। ওটা নয়, সেই মুক্তো-বসানো আর-একটা আছে, সেইটেই আনো।

অন্য বাটা আনয়ন

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়— বাঁচি নে তো আর তোদের জ্বালায়।
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা— না না, নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াটা।
কল্যাণী। কথাটা আমার নিই তবে ব'লে। পাঠান বাদশা অন্যায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে—
ক্ষীরো। বল কী! তা হলে গেছে ফুলবেড়ে
গিরিধরপুর গোপালনগর কানাইগঞ্জ—
কল্যাণী। সব গেছে মোর।
ক্ষীরো। হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি?
কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।
ক্ষীরো। অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর! গয়না যা ছিল হীরে-মুক্তোর,
সেই বড়ো বড়ো নীলার কণ্ঠী, কানবালা-জোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই-যে চুনীর পাঁচনলি হার, হীরে-দেওয়া সিঁথি লক্ষ টাকার—
সেগুলো নিয়েছে বুঝি লুটে-পুটে?
কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জুটে।
ক্ষীরো। আহা, তাই বলে, ধনজনমান পদ্মপত্রে জলের সমান!
দামি তৈজস ছিল যা পুরোনো চিহ্নও তার নেই বুঝি কোনো?
সে কালের সব জিনিস-পত্র— আসাসোটাগুলো, চামর-ছত্র,
চাঁদোয়া-কানাত, গেছে বুঝি সব? শাস্ত্রে যে বলে ধনবৈভব
তড়িৎসমান, মিথ্যে সে নয়। এখন তা হলে কোথা থাকা হয়?
বাড়িটা তো আছে।
কল্যাণী। ফৌজের দল প্রাসাদ আমার করেছে দখল।
ক্ষীরো। ওমা, ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী— কাল ছিল রানী, আজ ভিখারিনি!
শাস্ত্রে তাই তো বলে, সব মায়া— ধনজন তাল-বৃক্ষের ছায়া।
কী বল মালতী!
মালতী। তাই তো বটেই, বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই।
কল্যাণী। কিছুদিন যদি হেথায় তোমার আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আবার আমার রাজ্যখানি— অন্য উপায় নাহিকো জানি।
ক্ষীরো। আহা, তুমি রবে আমার হেথায়— এ তো বেশ কথা, সুখেরই কথা এ।
প্রথমা। আহা, কত দয়া!
দ্বিতীয়া। মায়ার শরীর!
তৃতীয়া। আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর।
চতুর্থী। হেথা ফেরে নাকো অধম পতিত, আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ।

ক্ষীরো। কিন্তু, একটা কথা আছে বোন— বড়ো বটে মোর প্রাসাদভবন,
তেমনি যে ঢের লোকজন বেশি কোনোমতে তারা আছে ঠেসাঠেসি।
এখানে তোমার জায়গা হবে না— সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।
তবে কিছুদিন যদি ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও থাকি তাঁবু গেড়ে—
প্রথমা। ওমা, সে কী কথা!
দ্বিতীয়া। তা হলে রানীমা, রবে না তোমার কষ্টের সীমা!
তৃতীয়া। যে-সে তাঁবু নয়, তবু সে তাঁবুই— ঘর থাকতে কি ভিজবে বাবুই?
পঞ্চমী। দয়া করে কত নাববে নাবোতে, রানী হয়ে কিনা থাকবে তাঁবুতে!
ষষ্ঠী। তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে অধীনগণের বাজবে বক্ষে।
কল্যাণী। কাজ নেই, রানী, সে অসুবিধায়— আজকের তরে লইনু বিদায়।
ক্ষীরো। যাবে নিতান্ত! কী করব ভাই! ছুঁচ ফেলবার জায়গাটি নাই।
জিনিস-পত্র লোক-লস্‌করে ঠাসা আছে ঘর— কারে ফস্‌ ক'রে
বসতে বলি সে তার জো'টি নেই। ভালো কথা! শোনো, বলি গোপনেই—
গয়নাপত্র কৌশলে রাতে দু-দশটা যাহা পেরেছ সরাতে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই।
কল্যাণী। কিছুই আনি নি, শুধু হেরো এই
হাতে দুটি চুড়ি, পায়েতে নূপুর।
ক্ষীরো। আজ এসো তবে, বেজেছে দুপুর—
শরীর ভালো না, তাইতে সকালে মাথা ধরে যায় অধিক বকালে।—
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। জানে না কানাই— স্নানের সময় বাজবে সানাই?
মালতী। বেটারে উচিত করব শাসন!

[কল্যাণীর প্রস্থান

ক্ষীরো। তুলে রাখো মোর রত্ন-আসন—
আজকের মতো হল দরবার। মালতী!
মালতী। আজ্ঞে!
ক্ষীরো। নাম করবার
সুখ তো দেখলি?
মালতী। হেসে নাহি বাঁচি— ব্যাঙ থেকে কে'চে হলেন ব্যাঙাচি।
ক্ষীরো। আমি দেখো, বাছা, নাম-করা-করি, যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,
জড়ো করে দল ইতর লোকের জাঁক-জমকের লোক-চমকের
যত রকমের ভণ্ডামি আছে ঘেঁষি নে কখনো ভুলে তার কাছে।
প্রথমা। রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।
দ্বিতীয়া। অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান, কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান!
তৃতীয়া। রানীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাবে হেন লোক হেন ধুলো কোথা পাবে!
ক্ষীরো। থাম্‌ থাম্‌, তোরা রেখে দে বকুনি— লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি!
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে!

ক্ষীরো। ওদের গয়না ছিল যা এমন কাহারও হয় না।
দুখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে, দেখে আমি আর বাঁচি নে হেসে।
তবু মাথা যেন নুইতে চায় না, ভিখ নেবে তবু কতই বায়না!
পথে বের হল পথের ভিখিরি, ভুলতে পারে না তবু রানীগিরি।
নত হয় লোক বিপদে ঠেকলে, পিত্তি জ্বলে যে দেমাক দেখলে।—
আবার কিসের শুনি কোলাহল?

মালতী। দুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল—
আকাল পড়েছে, চালের বস্তা— মনের মতন হয় নি সস্তা—
তাইতে চেঁচিয়ে খাচ্ছে কানটা, বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা।

ক্ষীরো। রানী কল্যাণী আছেন দাতা, মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা?
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে, ধরে নিয়ে যাক সকল-ক'টাকে
দাতা কল্যাণী রানীর ঘরে— সেথায় আসুক ভিক্ষে ক'রে।
সেখানে যা পাবে এখানে তাহার আরো পাঁচগুণ মিলবে আহার।

প্রথমা। হা হা হা, কী মজা হবেই না জানি!

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রানী!

তৃতীয়া। আমাদের রানী এতও হাসান!

চতুর্থী। দু চোখ চক্ষু-জলেতে ভাসান!

দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঠাকরুন এক এসেছেন দ্বারে, হুকুম পেলেই তাড়াই তাঁহারে।

ক্ষীরো। না না, ডেকে দে-না। আজ কী জন্য মন আছে মোর বড়ো প্রসন্ন।

ঠাকুরানীর প্রবেশ

ঠাকুরানী। বিপদে পড়েছি তাই এনু চ'লে।

ক্ষীরো। সে তো জানা কথা। বিপদে না প'লে
শুধু যে আমার চাঁদমুখখানি দেখতে আস নি, সেটা বেশ জানি।

ঠাকুরানী। চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—

ক্ষীরো। মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার?

ঠাকুরানী। দয়া ক'রে যদি কিছু করো দান এ যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ।

ক্ষীরো। তোমার যা-কিছু নিয়েছে অন্যে দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে!
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে তার তরে দয়া আমায় কে করে?

ঠাকুরানী। ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে দানসুখে তার সুখ আরো বাড়ে।
গ্রহণ যে করে তারি হেঁটমুখ, দুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ।
তুমি সক্ষম, আমি নিরুপায়— অনায়াসে পারো ঠেলিবারে পায়;
ইচ্ছা না হয় না'ই কোরো দান, অপমানিতেরে কেন অপমান?
চলিলাম তবে, থলো দয়া ক'রে বাসনা পুরিবে গেলে কার ঘরে।

ক্ষীরো। রানী কল্যাণী নাম শোন নাই! দাতা ব'লে তাঁর বড়ো যে বড়াই!
এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসো ভরে—
পথ না জানো তো মোর লোকজন পৌঁছিয়ে দেবে রানীর ভবন।

ঠাকুরানী। তবে তথাস্তু যাই তাঁরি কাছে। তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে।—
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে।
এই কথা ক'টি করিয়ো স্মরণ— ধনে মানুষের বাড়ে নাকো মন।
আছে বহু ধনী, আছে বহু মানী— সবাই হয় না রানী কল্যাণী।

ক্ষীরো। যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে দস্তুরমত কুর্নিশ ক'রে।
মালতী! মালতী! কোথায় তারিণী! কোথা গেল মোর চামরধারিণী—
আমার এক-শো-পঁচিশটে দাসী! তোরা কোথা গেলি—
বিনি! কিনি! কাশী!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পাগল হলি কি! হয়েছে কী তোর? এখনো যে রাত হয় নিকো ভোর—
বল্ দেখি কী যে কাণ্ড কল্লি! ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী!

ক্ষীরো। ওমা, তাই তো গা! কী জানি কেমন সারা রাত ধ'রে দেখেছি স্বপন।
বড়ো কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি— স্বপনটা ভেঙে বাঁচলেম দিদি!
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব— তুমি রানী, আমি চিরদাসী তব।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪

বিসর্জন

[বিসর্জন নাটকের কয়েকটি দৃশ্য, কোনো কোনো দৃশ্যের অংশ-বিশেষ সংকলিত। দৃশ্যসন্নিবেশের পরম্পরায়, বিশেষতঃ শেষ দুইটি দৃশ্যে, দ্বিতীয় সংস্করণ (১ আষাঢ় ১৩০৬) অনুসৃত হইয়াছে। কোন্ অংশ মূল নাটকে কোন্ অঙ্কের কোন্ দৃশ্য ছিল অনাবশ্যক-বোধে তাহার কোনো উল্লেখ করা হয় নাই।]

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক রাজমন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান। পরে সেনাপতি°
নয়নরায়	সেনাপতি। পরে পদচ্যুত°
ধ্রুব	রাজপালিত বালক
মন্ত্রী	
গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিনী

° [illegible]

এরূপ দেখা যায়—

গোবিন্দ। সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধম কিঙ্করে!
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতামন্দিরে।

...

গোবিন্দ। তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

বিসর্জন

১

মন্দির ॥ গুণবতী

গুণবতী। মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু— পাপিষ্ঠা যে, লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব! আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব— এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে! হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম— তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী?

রঘুপতি। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো? পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য
ধরো। এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী। এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত— মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক-শো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি। পূজার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ?

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়সিংহ। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।— হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে— কোলে ক'রে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন— আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন!
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়সিংহ। ছি ছি,
ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা— তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার!— মহরাজ, বলো তুমি—

গোবিন্দ। বৎসে, আমি বাক্যহীন— এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?

অপর্ণা। এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত? ওরে বাছনি আমার!
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে,
কম্পিত কাতর বক্ষে— মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না?

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর!

জয়সিংহের প্রতি

অপর্ণা। তুমি তো নিষ্ঠুর নহ— আঁখিপ্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এসো তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এসো। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।—
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

জনান্তিক হইতে

গোবিন্দ। যেথা আছে প্রেম।
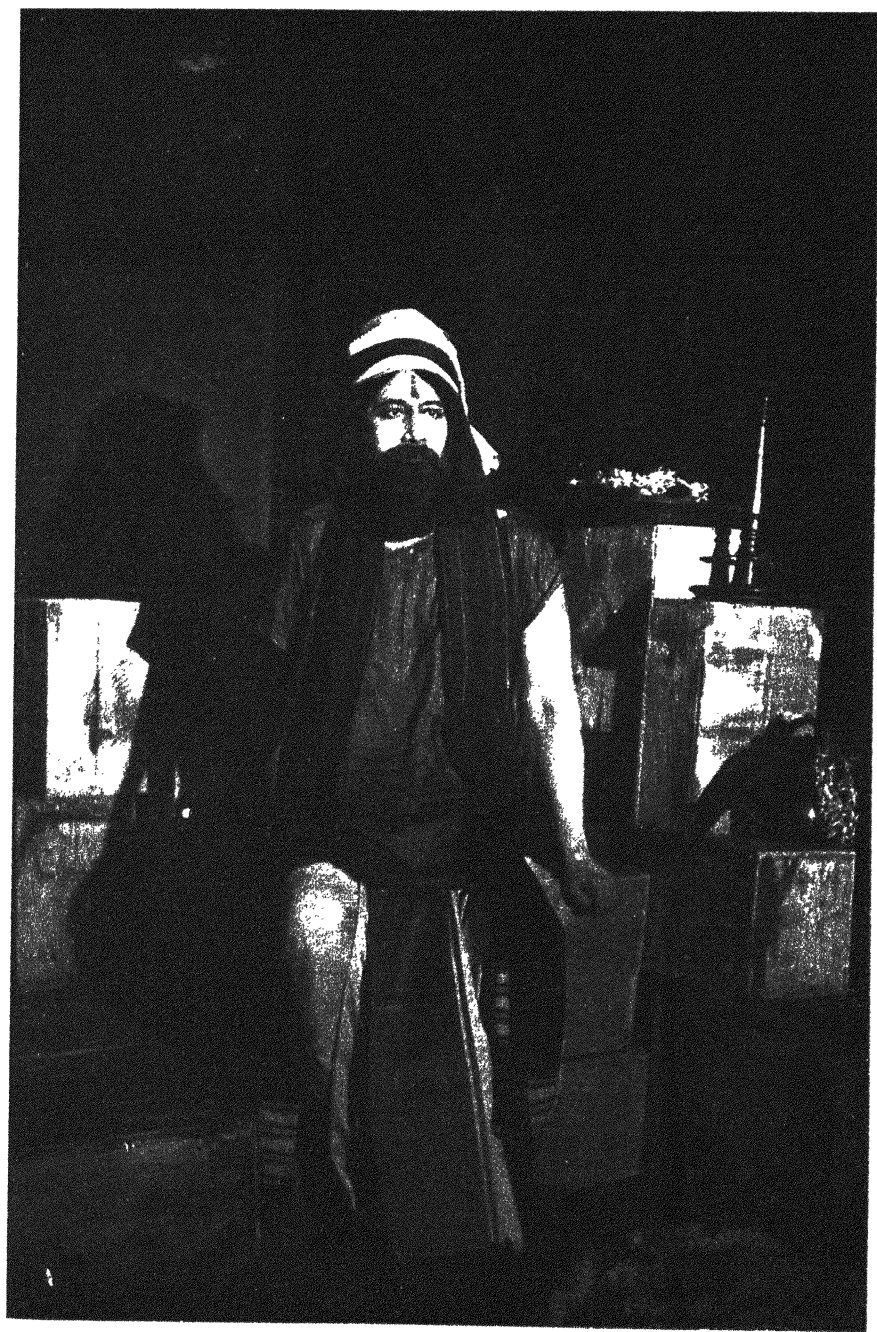
জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৩

২

রাজসভা

রাজা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ। সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ!

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়নরায়। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্ররায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধ'রে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি?

গোবিন্দ। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই!

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যে জন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে

যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দ। স্থির এই।

উঠিয়া

রঘুপতি। তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল। হাঁ হাঁ! থামো! থামো!

গোবিন্দ। বোসো চাঁদপাল! ঠাকুর, বলিয়া যাও।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব, আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ! কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদপাল। শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না?

গোবিন্দ। আর নহে মন্ত্রী,
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে?

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হতে পারে?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন ক'রে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে।

রাজার চিন্তা

নয়নরায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার!

সনিশ্বাসে

গোবিন্দ। থাক্ তর্ক।
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। একি হল!
নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু!

৩

মন্দির ॥ জয়সিংহ

জয়সিংহ। মা গো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই—সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন।
তোর কাছে থেকে, তবু, একা মনে হয়!

নেপথ্যে গান

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ। মা গো, এ কী মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্বাক্ নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হয়ে
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ। কেবলই একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জানো কি একেলা কারে
বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে, বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

জয়সিংহ। সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে। মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে—যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি কাঙাল যে জন
তাহারও কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন—
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি— কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষাতরে—দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।
এত দয়া পাই নে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়সিংহ। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।—
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।

কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। কঠিন? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

৪

অন্তঃপুর ॥ গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার? কে সে
দুরদৃষ্ট?

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি? এ কথা বলিলি
কী সাহসে? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয়?

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে—
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম?
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল?
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে!

রঘুপতি। মহারানী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু,
এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প

ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী। কী হবে ঠাকুর!

রঘুপতি। জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি—যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতা-পিতামহ মিলে
ঊর্ধ্ব-পানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী ক'রে মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘুপতি। হা হা! আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রানী! দেবব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্ শতবার! ধিক্ লক্ষবার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্! ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহতবৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর!

পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত

গুণবতী। কী করো! কী করো
দেব! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে।

রঘুপতি। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

গুণবতী। দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।

রঘুপতি। যে আদেশ
রাজ-অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই,
যতদিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার!

[প্রস্থান

৫

মন্দির ॥ রঘুপতি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়। কী জন্যে ডেকেছ গুরুদেব?

রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা! হা হা! বল কী ঠাকুর!
রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। পাব কোথা!

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল!—
বুঝেছ কি? শোনো তবে—গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—
জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
বুঝেছ নক্ষত্ররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্ররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্‌ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্ররায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।

রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো! যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যসিদ্ধি

যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্ররায়। হে মা কাত্যায়নী!

[প্রস্থান

জয়সিংহ। একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ, একি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী!— গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘুপতি। আর
কী উপায় আছে বলো।

জয়সিংহ। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? একি পাপ!

রঘুপতি। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জানো!

জয়সিংহ। শিখেছি তোমারি কাছে।

রঘুপতি। তবে এসো বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির-আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।

মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ম লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ। থামো, থামো, থামো!—
মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে!
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে—
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হতে, ঝরে আশীর্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে—
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া?—
ছলনা করেছ মোরে প্রভু! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে!— বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্তপিয়াসিনী! নিবি মা আমার রক্ত,
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে!
দিব ছুরি বুকে? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো? ওরে, মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব? ছলনা বুঝেছি আমি তব।
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও!
দিয়েছিলে এই-যে বেদনা, তারি 'পরে
জননীর স্নেহহস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজরক্ত!

ছিছি! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী!

রঘুপতি। বন্ধ হোক বলিদান
তবে।

জয়সিংহ। হোক বন্ধ।—না না গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী?

রঘুপতি। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস, তবে—তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক। পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে—তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের ’পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো,
সে কথা হইবে পরে— কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

৬

মন্দির ॥ অপর্ণা

গান

অপর্ণা। ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মুরতি— কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্‌ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে
মন্দিরের তলে— দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্‌ সুখ দেয়,
কোন্‌ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্‌ চিন্তা
করে তোমা-তরে— প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্‌ সান্ত্বনার সুধা চিররাত্রিদিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত!— ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। কে রে তুই এ মন্দিরে!
অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।
জয়সিংহ কোথা?

রঘুপতি। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে ওরে উপদেবী!

অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয়? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

৭

মন্দিরসম্মুখে পথ ॥ জয়সিংহ

জয়সিংহ। দূর হোক চিন্তাজাল! দ্বিধা দূর হোক!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন; চারি দিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!—সেই সত্য, সেই সত্য!
পাপপুণ্য নাই, সেই সত্য! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক!—

কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে? কুকী রমণীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি।—এ ধরায় কত সুখ
আছে— নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ

উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারি দিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী-সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারি দিক হতে—উঠে গীতগান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

গান

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই
আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে।

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকি ও অপর্ণা, দূরে দাঁড়াইয়া কেন!
শুনিতেছ অবাক হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুকহাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়,
ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার।
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি—শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা-ব্যাঘ্রিনীর খরনখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ!
সত্য হলে এমন কি হত? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও—বিষণ্ণ বিস্ময়ে, মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখী,
চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে

সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড-সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। তোমারে চিনি নে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চলে যাও— আমি চলে যাই।

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মোর। কে বলিল, এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখ-সুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে, গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি!
কী কাজ গুরুতে!…
প্রভু! পিতা! গুরুদেব!
কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ!
এই সে মন্দির— ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল, কঠিন, দৃঢ়,
নিষ্ঠুর সত্যের মতো।— কী আদেশ দেব!
ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো—

ছুরি দেখাইয়া

তোমার আদেশস্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ আছে
প্রভু!

রঘুপতি। দূর করে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে।—মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক।—দূর করে দাও ওরে!

জয়সিংহ। দূর করে দিব? দরিদ্র, আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল,
সুকোমল, বেদনাকাতর—দূর করে
দিতে হবে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!—
চলে যা অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহপ্রেম
সব মিছে!— মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু।—চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।

জয়সিংহ। দুইজনে
চলে যাই! এ তো স্বপ্ন নয়। একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ।
তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না সুখের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।

রঘুপতি। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের। দূর করে
দাও ওই বালিকারে।

জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। কেন যাব!

জয়সিংহ। এই নারী-অভিমান তোর?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।—
চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে

জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয়, প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধু, দু দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ?

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে-যায়
শুকায়-মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম।

[প্রস্থান

রঘুপতি। জয়সিংহ, কিছুতে পাই নে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।

৮

অন্তঃপুরকক্ষ ॥ গুণবতী

গুণবতী। তবু তো হল না! আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছুদিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহংকার ছিল
মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলি নে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু
অবহেলা—এমন তো কতদিন গেল।
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে—
হীরকের দীপ্তিসম! ধিক্ থাক্ শোভা!
এ রোষ বজ্রের মতো হ'ত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার

নিদ্রা, চূর্ণ হ'ত রাজ-অহংকার, পূর্ণ
হ'ত রানীর মহিমা! আমি রানী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব—এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু,
রানী নহি— তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হ'ত না!

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস তুই?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

[প্রস্থান

গুণবতী। রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক!
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি— রাজপুত্র এসে
তোরই কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী!—
মা গো মহামায়া, এ কী তোর অবিচার!
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর— খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান— দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও? ফিরে
যাও কেন? এত ভয় কারে তব? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়— আমি কি ভীষণ এত?

নক্ষত্ররায়। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।

গুণবতী। কেন, কী হয়েছে?

নক্ষত্ররায়। আমি
রাজা নাহি হব।

গুণবতী। নাই হলে? তাই ব'লে
এত আস্ফালন কেন?

নক্ষত্ররায়। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি।

গুণবতী। তাই মরো! শীঘ্র মরো! পূর্ণ হোক
মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে?

নক্ষত্ররায়। তবে কী বলিবে বলো।

গুণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী। ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব! মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়! আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী। মুকুট লইয়া খেলা! বড়ো কাল-খেলা!
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে!
এ তো ভালো খেলা নয়।

গুণবতী। অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে, পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। বুঝিয়াছি।

গুণবতী। তবে যাও। যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।

নক্ষত্ররায়। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী
সর্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক—বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

৯

মন্দিরসোপান ॥ জয়সিংহ

জয়সিংহ। দেবী, আছ, আছ তুমি। দেবী, থাকো তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস, আছি!'—নাই, নাই, নাই, দেবী নাই!
নাই? দয়া করে থাকো! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?—এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য
দয়াশূন্য মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস? তাড়ালেম
মন্দিরবাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে?—
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস নে তুই—তোরে আমি, আর
ফিরাব না। আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে। আপন ভায়েরে

প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে— সে কি তার কোনো কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে,
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা;
তার কাছে কীটবৎ, তবু তো আমার
ভাই; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত,
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই—
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয়বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার?... অপর্ণা, বালিকা, দেবী, নাই!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব। থাক্ ও-সকল কথা।
দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত— কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ— বহুরাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক্
দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্।
যা শুনিলে, মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে

ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারি দিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধ-সম।

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারি নে কিছু—
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা।
—এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে!—গুরুর আদেশ!

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর! বার বার
ফিরায়ো না! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে!

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

কিয়দ্দূর গিয়া, ফিরিয়া

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন!
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে?
অপর্ণা, সে-সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে?—
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ!

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এসো,
জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই।

জয়সিংহ। রক্ষা করো। অপর্ণা, করুণা করো!
দয়া ক'রে, মোরে ফেলে চলে যাও। এক

কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক
প্রাণেশ্বর—তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না।
[দ্রুত প্রস্থান

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে! আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ!

১০

মন্দির ॥ নক্ষত্ররায় রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারি দিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্ররায়। ঠাকুর, কোরো না দেরি আর—
ভয় হয়, কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারি দিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্ররায়। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘুপতি। আপন ভয়ের।

নক্ষত্ররায়। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর!

রঘুপতি। আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক নিরানন্দ। এসো পান করি
কারণসলিল।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো পদধ্বনি।

রঘুপতি। কই! নাহি শুনি।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো, ওই দেখো
আলো।

রঘুপতি। সংবাদ পেয়েছে রাজা! আর তবে
এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী!

খড়্গ-উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ
রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল

গোবিন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

১১

বিচারসভা ॥ গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়
সভাসদ্‌গণ ও প্রহরীগণ

গোবিন্দ। আর-কিছু বলিবার আছে?
রঘুপতি। কিছু নাই।
গোবিন্দ। অপরাধ করিছ স্বীকার?
রঘুপতি। অপরাধ?
অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপূজা
করিতে পারি নি শেষ—মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।
গোবিন্দ। শুন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্ট বর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন—
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারি জন
রাজ্যের বাহিরে।
রঘুপতি। দেবী ছাড়া এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে,
নতজানু, আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা-কাছে—দুই দিন দাও অবসর,
শ্রাবণের শেষ দুই দিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে—চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দ। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি। মহারাজ! রাজ-অধিরাজ!
মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন, অভাজন!

[প্রস্থান

গোবিন্দ। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্র। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জনা করিতে ভিক্ষা।

পদতলে পতন

গোবিন্দ। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বন্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে এক জনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার— আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু!
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দ। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাহি মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্রনদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্ট বর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত
রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন। ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর;
যত দিন দূরে রবি রাখিবেন তোরে
দেবগণ।

[নক্ষত্রের প্রস্থান

সভাসদ্‌গণের প্রতি

সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা রব আমি।

[সকলের প্রস্থান

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। মহারাজ,
সমূহ বিপদ!

গোবিন্দ। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড় নি কি
অতিদীন দরিদ্রের সমান করিয়া?—
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি।

নয়নরায়। মোগলের সৈন্য-সাথে আসে চাঁদপাল
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দ। এ নহে, নয়নরায়,
তোমার উচিত। শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই বলে তার নামে হেন অপবাদ!

নয়নরায়। অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

গোবিন্দ। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ?

নয়নরায়। যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে চ'লে
গেনু দেশান্তরে; শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে,
সঙ্গে চাঁদপাল।

গোবিন্দ। এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহ সৈন্যভার।

১২

মন্দিরপ্রাঙ্গণ ॥ জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি। গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে—
বারেক নিভিলে তারা চির-অন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন! সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন।—
বৎস, কেন নিরুত্তর? গুরুর আদেশ
নাহি আর— তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?
নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে? এই দুঃখ—
এত করে স্মরণ করাতে হল! কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে।— বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো— তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই ব'লে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে? শিশুকাল হতে, দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

১৩

প্রাসাদকক্ষ॥ গোবিন্দমাণিক্য

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও—

চরের প্রবেশ

চর। নির্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা:
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী-পানে।

গোবিন্দ। চুকে গেল।
আর ভয় নাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বিপক্ষশিবির হতে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দ। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।··· এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর
নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে

সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুর-তরে
ত্রিপুররমণী ?··· দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি! 'মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য'!
মহারাজ! দেখো সেনাপতি— এই দেখো
রাজদণ্ডে-নির্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্বাসনদণ্ড! এমনি বিধির খেলা!

নয়নরায়। নির্বাসন! একি স্পর্ধা! এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই।

গোবিন্দ। এ তো নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন?

নয়নরায়। রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দ। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার— এ কি তার লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি
দস্যু, আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,
এ তার রচনা নহে।— রচনা যাহারি
হোক, অক্ষর তো তারি বটে। নিজহস্তে
লিখেছে তো সেই। যে সর্পেরই বিষ হোক,
নিজের অক্ষরমুখে মাখায়ে দিয়েছে,
হেনেছে আমার বুকে— বিধি, এ তোমার
শাস্তি, তার নহে। নির্বাসন! তাই হোক।
তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন।

১৪

প্রাসাদ ॥ গোবিন্দমাণিক্য

গোবিন্দ। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে

রাজধানী-বহির্‌দ্বারে বিজয়তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহু-সম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসি নি, ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু, কারো কি করি নি
উপকার! কোনো অবিচার করি নাই
দূর! কোনো অত্যাচার করি নি শাসন!—
ধিক্‌ ধিক্‌ নির্বাসিত রাজা! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস অশ্রু!—
মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ!
এইবার শুনেছ তো দেবীর নিষেধ!
এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মতো, যাই নির্বাসনে।

গোবিন্দ। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এসো
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে— আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী। ভিক্ষা
রাখো নাথ!

গোবিন্দ। বলো দেবী!

গুণবতী। হোয়ো না পাষাণ।
রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয়।
তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলে নাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া!
করিল আমারে রাজাহীন রানী!

গোবিন্দ। প্রিয়ে,
আমাকে বিশ্বাস করো একবার শুধু,

না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে! অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালোবাস সেই
ভালোবাসা দিয়ে বোঝো— আর রক্তপাত
নহে।— মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে।—
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে।

[গুণবতীর প্রস্থান

গেলে চলি! কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার!—
ওরে কে আছিস?— কেহ নাই? চলিলাম!
বিদায় হে সিংহাসন! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।

[প্রস্থান

গুণবতীর পুনঃপ্রবেশ

গুণবতী। বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে। আন্ বলি।
আন্ জবাফুল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবি নে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিঙ্করকিঙ্করী?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ! ত্বরা ক'রে
কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার!
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে!

১৫

মন্দির॥ বাহিরে ঝড়॥ রঘুপতি

পূজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!

আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে, হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে।—ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ, দূর হ মায়াবিনী!
জয়সিংহে চাস তুই! আরে সর্বনাশী!
মহাপাতকিনী!

[অপর্ণার **প্রস্থান**

এ কি অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!—
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে।—ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়সিংহ। আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।—
রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী

মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা! আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর রক্ততৃষাতুরা!

[বক্ষে ছুরি বিন্ধন]

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে! জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা, মা, আপনার কাছে— আমি নাহি
চাহি।

[অপর্ণার মূর্ছা]

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

উঠিয়া

দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো!

মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণচরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী!

নাড়া দিয়া

শুনিতে কি
পাস? আছে কর্ণ? জানিস কী করেছিস?
কার রক্ত করেছিস পান? কোন্ পুণ্য
জীবনের? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতি-ভরা
মহাহৃদয়ের? থাক্ তুই চিরকাল
এইমত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয়, কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব—শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে।

কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয়দলনী পাষাণীরে! লঘু হোক
জগতের বক্ষ।

দূরে গোমতীর জলে প্রতিমানিক্ষেপ

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। জয় জয় মহাদেবী!—
দেবী কই!

রঘুপতি। দেবী নাই।

গুণবতী। ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মার পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু

প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু, আজি এই
এক রাত্রি-তরে।—কোথা দেবী?

রঘুপতি। কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘুপতি। দেবী বলো
তারে! এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী,
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে? দেবী বলো তারে!
পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

গুণবতী। গুরুদেব, বধিয়ো না
মোরে। সত্য করে বলো আরবার—দেবী
নাই?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই?
তবে কে রয়েছে?

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা, ফিরে যা!
বল্‌ শীঘ্র কোন্‌ পথে গেছে মহারাজ।

মূর্ছাপগমে উঠিয়া

অপর্ণা। পিতা!

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার!
পিতা! এ তো নহে ভর্ৎসনার নাম! পিতা!
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক্‌ আরবার!

অপর্ণা। পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া
গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দ। দেবী কই?
রঘুপতি। দেবী নাই।
গোবিন্দ। একি রক্তধারা!
রঘুপতি। এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপমন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজরক্ত দিয়ে
হিংসারক্তশিখা।
গোবিন্দ। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

গুণবতী। মহারাজ!
গোবিন্দ। প্রিয়তমে!
গুণবতী। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

[প্রণাম]

গোবিন্দ। গেছে পাপ! দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। পিতা, চলে এসো!
রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল—জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী! অমৃতময়ী!
অপর্ণা। পিতা, চলে এসো!

গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধন। প্রণমি চরণে তাত!
ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়,
অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ?
দুর্যোধন। লভিয়াছি জয়।
ধৃতরাষ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী?
দুর্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।
ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
রে দুর্মতি?
দুর্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ—
জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি! দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান—সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু পাণ্ডবের গাণ্ডীবটঙ্কারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার—নিত্যনব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্তচিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরবকর্ণ প্রতিধ্বনিরবে—
পাণ্ডবের যশোবিম্বপ্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু, পিতঃ,
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডবগৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি—আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।
ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ!

পান্ডবের কৌরবের এক পিতামহ,
সে কি ভুলে গেলি ?

দুর্যোধন। ভুলিতে পারি নে সে যে,
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হ'ত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ—শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃসূর্যলোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে—আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী!

দুর্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পান্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল—আজি কুরুসূর্য একা,
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায়সুহৃদ্‌রূপে নির্ভরবন্ধন—
কিন্তু রাজা একেশ্বর; সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে
বলভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী; রাজদন্ড যত খন্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহতস্থির,

তবে বহুজন-'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার?
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই—
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডবগৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপট দ্যূতে তারে কোস্ জয়?
লজ্জাহীন অহংকারী!

দুর্যোধন। যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিক সমান,
তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তার—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধন। নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে। 'দুর্যোধন পাপী'
'দুর্যোধন ক্রূরমনা' 'দুর্যোধন হীন'
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন—
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ,
'দুর্যোধন রাজা। দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম।'

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে বৎস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।

রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

দুর্যোধন। অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়;
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ! প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডবভ্রাতারে;
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য; আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব!—এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্যগুণগান,
আমাদের নিত্য নিন্দা—এইমতে, পিতঃ,
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চিরনির্বাসিত।
এইমতে, পিতঃ, মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল—উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত; পাণ্ডবেরা স্ফীত,
অখণ্ড, অবাধগতি। অদ্য হতে, পিতঃ,
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্মপিতামহে—যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু-উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,

মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব, নাহি কাজ
সিংহাসনকণ্টকশয়নে— মহারাজ,
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস, অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—
তবু, পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই ব'লে?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন— তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি— বন্ধুগণ হাহাকাররবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র-সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে— শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়—
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল; ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন;
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।— ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে

ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধপিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

চরের প্রবেশ

চর। মহারাজ, অগ্নিহোত্র দেব-উপাসনা
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া; পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব; সন্ধ্যা হল, তবু
ভৈরবমন্দির-মাঝে নাহি বাজে, প্রভু,
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে;
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার-পানে
দীনবেশে সজলনয়নে।

দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন!
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা—নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন. নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্যোধন। পিতঃ, আমি চলিলাম তবে।

[প্রস্থান

ধৃতরাষ্ট্র। করো পলায়ন। হায়. কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ।

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ!

ধৃতরাষ্ট্র। কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা?

গান্ধারী। ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র। কারে হে মহিষী?

গান্ধারী। পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শান ধর্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে সে জন? আছে কোন্‌খানে?
শুধু কহো নাম তার।

গান্ধারী। পুত্র দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাহারে করিব ত্যাগ!

গান্ধারী। এই নিবেদন
তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী,
রাজমাতা!

গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব? কুরুকুলপিতৃপিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ! ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে—
কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে— আমি পিতা—

গান্ধারী। মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে— লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

ধৃতরাষ্ট্র। কী রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী। ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম?

গান্ধারী। দুঃখ নব নব।

পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া?

ধৃতরাষ্ট্র। হায় প্রিয়ে,

ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর, 'কী করিলি ওরে?
এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে;
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি? অপমানক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে—শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।
সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,
করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত; যদি ডেকে আনো তারে
বরণ করিয়া তবে লহো একেবারে।'
এইমত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণসূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে; দ্যূতছলনায়
বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ! কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের!

গান্ধারী। ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,

মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু—
ধর্মেই ধর্মের শেষ। মূঢ়নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,

জান তো সকলই। পাণ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে;
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি—পুত্রে তব ত্যজ এইবার;
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না; ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
পৌরবপ্রাসাদ হতে—দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে, ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারানী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী!

গান্ধারী। অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য—অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী। তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বাম হস্ত; ধর্মরক্ষা-কাজ
তোমা-'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে,
যদি কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কী তাহার করিবে বিধান?

ধৃতরাষ্ট্র। নির্বাসন।

গান্ধারী। তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ—ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার! দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,

কূটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে—মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল,
যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্ষার গরল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-'পরে
কলুষপরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ—পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান? অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্ম লাভ করে
সেও সহে কিন্তু, প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে—হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খলখল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্রপিশাচেরা—ধর্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে,
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি—কোষ-মাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত। মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি—দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো

দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপদহনে-জর্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী!

গান্ধারী। শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পারো না দিতে সে কারে দিয়ো না;
যে তোমার পুত্র নহে তারও পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা—পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে—
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে;
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি—আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ততরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব! উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে—অংশ লই তার দুর্গতির,

অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্মতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর—এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

[প্রস্থান

গান্ধারী। হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে, সভয়ে অকাল কহে সবে!
লুটাও লুটাও শির—প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পথতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্তশতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনতশিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক্ নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি! নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম!

নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি,
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি!

দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতীর প্রবেশ
দাসীগণের প্রতি

ভানুমতী। ইন্দুমুখি, পরভৃতে, লহো তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলংকার।

গান্ধারী। বৎসে, ধীরে, ধীরে!
পৌরবভবনে কোন্ মহোৎসব আজি?
কোথা যাও নববস্ত্র-অলংকারে সাজি
বধূ মোর?

ভানুমতী। শত্রুপরাভবশুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী। শত্রু যার আত্মীয়স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু। নব অলংকার
কোথা হতে হে কল্যাণী?

ভানুমতী। জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলংকার—
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শতসূচিমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে
কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী। হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার—
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার!
একি ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কা-সম দহিছে না আজ
এ মণিমঞ্জীর তোরে? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডবঝংকার।

ভানুমতী। মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে

ক্ষত্রিয়মহিমাসূর্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল। দুর্দিন-দুর্যোগ যদি আসে
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী,
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী। বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি—রত্ন-অলংকার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে। বৎসে, ভাঙিয়ো না বন্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে। আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজনদুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাতঃ! হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ—বেণী করি উন্মোচন
শান্তমনে করো, বৎসে, দেবতা-অর্চন।
এ পাপ সৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহংকারে
প্রতি ক্ষণে লজ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে।
খুলে ফেলো অলংকার, নবরক্তাম্বর;
থামাও উৎসববাদ্য, রাজ-আড়ম্বর;
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে—
কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে।

[ভানুমতীর প্রস্থান

দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি, জননী,
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী। সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হতে বল,

সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি দীনছদ্মরূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব সদা চুপে-চুপে,
দুঃখ হতে তোমা-তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক সংযোগ
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজ বিধি; যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে!
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।

দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন-পূর্বক

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী! একবার
তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা—
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।
যাও বৎসে, পতি-সাথে অমলিনমুখ
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভো সার্থকতা।
রাজগৃহে আয়োজন দিবসযামিনী
সহস্র সুখের—বনে তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা, সকল আশ্রয়—
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা

উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শত দলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।

* ফাল্গুন ১৩০৬

কর্ণকুন্তীসংবাদ

কর্ণ। পুণ্যজাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত,
সেই আমি—কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ!

কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে,
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্যডোরে
তোমা-সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী। ধৈর্য ধর্‌,
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে।—কহি তোরে, বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ। তুমি কুন্তী! অর্জুনজননী!

কুন্তী। অর্জুনজননী বটে, তাই মনে গণি
দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজও মনে পড়ে
অস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।

যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে—কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিসচুম্বন?
অর্জুনজননী সে যে! যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন 'রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী? অর্জুনজননী সে যে।
পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে। হেনকালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল; সেই ক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে, ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে! রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী—এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে?

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে—লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী—
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি,
মোরে কোথা দিবে স্থান?

কুন্তী। সর্ব-উচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র-আগে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণ। কোন্ অধিকারমদে
প্রবেশ করিব সেথা? সাম্রাজ্যসম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহো মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী। পুত্র মোর ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন— সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে;
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

কর্ণ। শুনি স্বপ্নসম,
হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যূষে! পুরাতন সত্য-সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী,
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়—
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
'জননী, গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক

স্বপনেরে ছিন্ন করি! সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে!
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুনজননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর! মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া— চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে 'ভাই' ব'লে ধায়!

কুন্তী। তবে চলে আয়, বৎস, তবে চলে আয়।

কর্ণ। যাব, মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে— নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ— মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কুন্তী। ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।

কর্ণ। হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী, কহো আরবার
আমি পুত্র তব।

কুন্তী। পুত্র মোর!

কর্ণ। কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে?
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে—

তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে!—মাতঃ, নিরুত্তর ?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। থাক্, থাক্ তবে।
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কুন্তী। হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম
শতখণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে,
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন—তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা—যবে মুখে তোর
একটি ফুটে নি বাণী তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি; বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল,
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল।

কর্ণ। মাতঃ, দেহো পদধূলি, দেহো পদধূলি—
লহো অশ্রু মোর।

কুন্তী। তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান;
দূর করি দিয়া, বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ। মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা—
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।

পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী। রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো, হে বৎস, উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র—তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই, মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি—
কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে, ধিক্ মোরে।

কুন্তী। বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব! সেইদিন কে জানিত, হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে!
এ কী অভিশাপ!

কর্ণ। মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়

শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন— আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্গুন ১৩০৬

মাধবদত্ত ॥ মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না তখন ছিলই না—কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না।

কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ ॥ ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে, কিন্তু আয়ুর্বেদে যে রকম লিখছে তাতে তো—

মাধবদত্ত ॥ বলেন কী!

কবিরাজ ॥ শাস্ত্রে বলছেন : পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্ভবান্—

মাধবদত্ত ॥ থাক্ থাক্, আপনি আর ওই শ্লোকগুলো আওড়াবেন না—ওতে আরও আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কী করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ ॥ (নস্য লইয়া) খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধবদত্ত ॥ সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ ॥ আমি তো পূর্বেই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধবদত্ত ॥ ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ ॥ তা কী করবেন বলেন? এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ওই বালকের পক্ষে বিষবৎ—কারণ কিনা শাস্ত্রে বলছে : অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধবদত্ত ॥ থাক্ থাক্, আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে—অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ ॥ কিছু না, কারণ, পবনে তপনে চৈব—

মাধবদত্ত ॥ আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্-না—কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু, আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দুঃখ ও বেচারা চুপ করে সহ্য করে—কিন্তু, আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ ॥ সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি—তাই তো মহর্ষি চ্যবন বলেছেন : ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশুফলপ্রদং। আজ তবে উঠি দত্তমশায়!

[প্রস্থান

ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধবদত্ত ॥ ওই রে, ঠাকুরদা এসেছে! সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা ॥ কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধবদত্ত ॥ তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।

ঠাকুরদা ॥ তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই, তোমার খেপবার বয়সও গেছে—তোমার ভাবনা কী?

মাধবদত্ত॥ ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা॥ সে কিরকম!

মাধবদত্ত॥ আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্যে খেপে উঠেছিল।

ঠাকুরদা॥ সে তো অনেক দিন থেকে শুনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না।

মাধবদত্ত॥ জানো তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি—কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু, এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুরদা॥ তাই, এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ ততই মনে করছ সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।

মাধবদত্ত॥ আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল—না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু, এখন যা টাকা করছি সবই ওই ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

ঠাকুরদা॥ বেশ বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধবদত্ত॥ আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সে দিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা॥ আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধবদত্ত॥ কবিরাজ বলছে, তার ওইটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যে রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনো রকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা—তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা॥ মিছে বলো নি—একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধ'রে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম একটু সেরে আসি, তার পরে ওই ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে নেব।

[প্রস্থান

অমলগুপ্তের প্রবেশ

অমল॥ পিসেমশায়!

মাধবদত্ত॥ কী অমল?

অমল॥ আমি কি ওই উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধবদত্ত॥ না বাবা!

অমল॥ ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, ওই দেখো-না যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠ-বিড়ালি কুট্‌ুস্ কুট্‌ুস্ করে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধবদত্ত॥ না বাবা!

অমল॥ আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত।

কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধবদত্ত॥ কবিরাজ যে বলেছে, বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।
অমল॥ কবিরাজ কেমন করে জানলে?
মাধবদত্ত॥ বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে!
অমল॥ পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?
মাধবদত্ত॥ বেশ! তাও বুঝি জানো না!
অমল॥ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়ি নি— তাই জানি নে।
মাধবদত্ত॥ দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো— তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।
অমল॥ বেরোয় না?
মাধবদত্ত॥ না, কখন্ বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে, আর-কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই।
অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে— বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে— সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।
অমল॥ না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না— পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।
মাধবদত্ত॥ সে কী কথা অমল! যদি পণ্ডিত হতে পারতুম তা হলে আমি তো বেঁচে যেতুম।
অমল॥ আমি, যা আছে সব দেখব— কেবলই দেখে বেড়াব।
মাধবদত্ত॥ শোনো একবার! দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?
অমল॥ আমাদের জানলার কাছে বসে সেই-যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারি ইচ্ছে করে ওই পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।
মাধবদত্ত॥ কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই, কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ— নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এত বড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল!
অমল॥ পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে? আমার ঠিক বোধ হয়, পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ওই ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না?
মাধবদত্ত॥ তারা তো তোমার মতো খেপা নয়, তারা শুনতে চায়ও না।
অমল॥ আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।
মাধবদত্ত॥ সত্যি নাকি? কিরকম শুনি।
অমল॥ তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরা-জুতো প'রে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি।

আচ্ছা, পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয়?

মাধবদত্ত॥ হয় বৈকি। কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল॥ বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধবদত্ত॥ খুঁজে যদি না পাও?

অমল॥ খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব।—

তার পরে সেই নাগরা-জুতো-পরা লোকটা চলে গেল, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝর্না বয়ে যাচ্ছে সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝর্নার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে— তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে— পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝর্নার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল।

পিসিমাকে বলে রেখেছি, ওই ঝর্নার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধবদত্ত॥ পিসিমা কী বললে?

অমল॥ পিসিমা বললেন, তুমি ভালো হও, তার পর তোমাকে ওই ঝর্নার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব।

কবে আমি ভালো হব?

মাধবদত্ত॥ আর তো দেরি নেই বাবা!

অমল॥ দেরি নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধবদত্ত॥ কোথায় যাবে?

অমল॥ কত বাঁকা বাঁকা ঝর্নার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব— দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে তখন আমি কোথায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধবদত্ত॥ আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি—

অমল॥ তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

মাধবদত্ত॥ তুমি কী হতে চাও বলো।

অমল॥ এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না— আচ্ছা, আমি ভেবে বলব।

মাধবদত্ত॥ কিন্তু, তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল॥ বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধবদত্ত॥ যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

অমল॥ তা হলে তো সে বেশ হত। কিন্তু, আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না —সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধবদত্ত॥ আমার কাজ আছে, আমি চললুম— কিন্তু বাবা, দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল॥ যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

২

দইওয়ালা॥ দই— দই— ভালো দই!

অমল॥ দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা!

দইওয়ালা॥ ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল॥ কেমন করে কিনব? আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা॥ কেমন ছেলে তুমি! কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল॥ আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওয়ালা॥ আমার সঙ্গে!

অমল॥ হাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওয়ালা॥ (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল॥ কবিরাজ আমাকে বেরতে বারণ করেছে, তাই আমি সারা দিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওয়ালা॥ আহা, বাছা, তোমার কী হয়েছে?

অমল॥ আমি জানি নে। আমি তো কিছু পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে।

দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওয়ালা॥ আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল॥ তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওয়ালা॥ আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল॥ পাঁচমুড়া পাহাড়— শামলী নদী— কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি —কবে, সে আমার মনে পড়ে না।

দইওয়ালা॥ তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনো দিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল॥ না, কোনো দিন যাই নি। কিন্তু, আমার মনে হয়, যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম— একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা॥ ঠিক বলেছ বাবা!

অমল॥ সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওয়ালা॥ কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল॥ মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়— তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওয়ালা॥ বা! বা! ঠিক কথা! আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা, তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়— কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনো দিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

অমল॥ সত্যি বলছি দইওয়ালা, আমি এক দিনও যাই নি। কবিরাজ যে দিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সে দিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওয়ালা॥ যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল॥ আমাকে তোমার মতো ওই রকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ওই রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে—ওই রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওয়ালা॥ মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা! এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল॥ না না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কিরকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই! আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওয়ালা॥ হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল॥ না না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে ওই গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওয়ালা॥ বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল॥ আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা॥ না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল॥ তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওয়ালা॥ কিচ্ছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

[প্রস্থান

অমল॥ (সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই।—দই, দই দই—ই—ভালো দই!

এই-যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও-না প্রহরী!

প্রহরী॥ অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল॥ কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী॥ যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল॥ কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ওই পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী॥ একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল॥ রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে। কিন্তু, আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না—আমাকে কেবল দিন-রাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।

প্রহরী॥ কবিরাজ বারণ করেছে? আহা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে

গেছে। চোখের কোলে কালী পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।

অমল॥ তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী॥ এখনো সময় হয় নি।

অমল॥ কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

প্রহরী॥ সে কি হয়! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল॥ বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা— আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে। দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়— পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনের ওই কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে— তখন তোমার ওই ঘণ্টা বাজে— ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

প্রহরী॥ ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল॥ কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্ দেশে?

প্রহরী॥ সে কথা কেউ জানে না।

অমল॥ সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করছে, ওই সময়ের সঙ্গে চলে যাই— যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী॥ সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!

অমল॥ আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী॥ হবে বৈকি।

অমল॥ কিন্তু, কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী॥ কোন্‌দিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন।

অমল॥ না না, তুমি তাকে জানো না, সে কেবলই ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী॥ তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল॥ আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

প্রহরী॥ অমন কথা বলতে নেই বাবা!

অমল॥ না— আমি তো বসেই আছি— যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমি তো বেরোই নে— কিন্তু, তোমার ওই ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং, আর আমার মন-কেমন করে।— আচ্ছা, প্রহরী!

প্রহরী॥ কী বাবা?

অমল॥ আচ্ছা, ওই-যে রাস্তার ও পারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে-যাচ্ছে— ওখানে কী হয়েছে?

প্রহরী॥ ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল॥ ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী॥ ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর।

এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল॥ রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী॥ আসে বৈকি। দেখো, এক দিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল॥ আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলেমানুষ।

প্রহরী॥ ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকু-টুকু ছোট্টো ছোট্টো চিঠি লেখেন।

অমল॥ বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী॥ তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অত বড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন?
ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে।

অমল॥ আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী॥ রাজার যে অনেক ডাক-হরকরা আছে— দেখ নি বুকে গোল গোল সোনার তক্‌মা প'রে তারা ঘুরে বেড়ায়?

অমল॥ আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী॥ ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।— এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।

অমল॥ বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।

প্রহরী॥ হা হা হা হা! ডাক-হরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই বৃষ্টি নেই, গরিব নেই বড়োমানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো— সে খুব জবর কাজ!

অমল॥ তুমি হাসছ কেন! আমার ওই কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগছে। না না, তোমার কাজও খুব ভালো— দুপুর বেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আবার এক-এক দিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্‌ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

প্রহরী॥ ওই-যে, মোড়ল আসছে— আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তা হলেই মুশকিল বাধাবে।

অমল॥ কৈ মোড়ল, কৈ, কৈ?

প্রহরী॥ ওই-যে, অনেক দূরে। মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল॥ ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে?

প্রহরী॥ আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায়, ও তার সঙ্গে দিন রাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যাবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্ছে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব।

[প্রস্থান

অমল॥ রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়— এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু, আমি তো পড়তে পারি নে! কে পড়ে দেবে? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পড়ব। কিন্তু ডাক-হরকরা যদি আমাকে না চেনে!
মোড়ল-মশায়, ও মোড়ল-মশায়— একটা কথা শুনে যাও।

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল॥ কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল॥ তুমি মোড়ল-মশায়, তোমাকে তো সবাই মানে।

মোড়ল॥ (খুশি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বৈকি। খুব মানে।

অমল॥ রাজার ডাক-হরকরা তোমার কথা শোনে?

মোড়ল॥ না শুনে তার প্রাণ বাঁচে! বাস্ রে, সাধ্য কী!

অমল॥ তুমি ডাক-হরকরাকে বলে দেবে, আমারই নাম অমল— আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল॥ কেন বলো দেখি।

অমল॥ আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল॥ তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখবে?

অমল॥ রাজা যদি চিঠি লেখে, তা হলে—

মোড়ল॥ হা হা হা হা! এ ছেলেটা তো কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তার পরম বন্ধু! ক দিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়তো আজই আসে কি কালই আসে।

অমল॥ মোড়ল-মশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন! তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মোড়ল॥ বাস্ রে! তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!

মাধবদত্তর বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দু-পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসো-না, ওকে মজা দেখাচ্ছি।

ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।

অমল॥ না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল॥ কেন রে? তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব— তিনি তা হলে আর দেরি করতে পারবেন না— তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনই পাইক পাঠিয়ে দেবেন!—

না, মাধবদত্তর ভারি আস্পর্ধা— রাজার কানে একবার উঠলে দুরস্ত হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

অমল॥ কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ, একটু দাঁড়াও-না ভাই!

বালিকার প্রবেশ

বালিকা॥ আমার কি দাঁড়াবার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।

অমল॥ তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না— আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।

বালিকা॥ তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকাল বেলাকার তারা—তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল ॥ জানি নে কী হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা ॥ আহা, তবে বেরিয়ো না— কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়— দুরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছট্‌ফট্‌ করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল ॥ না, না, বন্ধ কোরো না— এখানে আমার আর-সব বন্ধ, কেবল এইটুকু খোলা। তুমি কে বলো-না— আমি তো তোমাকে চিনি নে!

বালিকা ॥ আমি সুধা।

অমল ॥ সুধা?

সুধা ॥ জানো না? আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল ॥ তুমি কী করো?

সুধা ॥ সাজি ভ'রে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুলতে চলেছি।

অমল ॥ ফুল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা-দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে, যতই চলেছ মল বাজছে— ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তা হলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা ॥ তাই বৈকি! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি নাকি বেশি জানো!

অমল ॥ জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয়, আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি— খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি।— তুমি আমার পারুল দিদি হবে?

সুধা ॥ কী বুদ্ধি তোমার! পারুল দিদি আমি কী করে হব! আমি যে সুধা— আমি শশী মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়।— আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম, তা হলে কেমন মজা হত।

অমল ॥ তা হলে সমস্ত দিন কী করতে?

সুধা ॥ আমার বেনেবউ পুতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম। আমার পুষি মেনি আছে, তাকে নিয়ে— যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না।

অমল ॥ আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো না, আমার খুব ভালো লাগছে।

সুধা ॥ আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল ॥ আর, আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা ॥ ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল ॥ আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ওই ঝর্না পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা ॥ আচ্ছা, বেশ।

অমল ॥ তুমি তা হলে ফুল তুলে আসবে?

সুধা ॥ আসব।

অমল ॥ আসবে?

সুধা॥ আসব।

অমল॥ আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা॥ না ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে।

[প্রস্থান

ছেলের দলের প্রবেশ

অমল॥ ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একটুখানি এইখানে দাঁড়াও-না।

ছেলেরা॥ আমরা খেলতে চলেছি।

অমল॥ কী খেলবে তোমরা ভাই?

ছেলেরা॥ আমরা চাষ-খেলা খেলব।

প্রথম॥ (লাঠি দেখাইয়া) এই-যে আমাদের লাঙল।

দ্বিতীয়॥ আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল॥ সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা॥ হাঁ, সমস্ত দি—ন।

অমল॥ তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা॥ হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল॥ আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই!

ছেলেরা॥ তুমি বেরিয়ে এসো-না, খেলবে চলো।

অমল॥ কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা॥ কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি!
চল্‌ ভাই, চল্‌, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অমল॥ না ভাই, তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করো—আমি একটু দেখি।

ছেলেরা॥ এখেনে কী নিয়ে খেলব?

অমল॥ এই-যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে—এ-সব তোমরাই নাও ভাই! ঘরের ভিতরে একলা খেলতে ভালো লাগে না—এ-সব ধুলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে—এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা॥ বা, বা, বা, কী চমৎকার খেলনা! এ-যে জাহাজ! এ-যে জটাইবুড়ি! দেখছিস ভাই? কেমন সুন্দর সেপাই!
এ-সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে? তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

অমল॥ না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, সব তোমাদের দিলুম।

ছেলেরা॥ আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল॥ না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা॥ কেউ তো বকবে না?

অমল॥ কেউ না, কেউ না। কিন্তু, রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিক ক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোনো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা॥ বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা— আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই? ওই-যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে— ওইটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ!

অমল॥ হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আসছে। জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেক ক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে— আমার পিঠ ব্যথা করছে।

ছেলেরা॥ এখন যে সবে এক প্রহর বেলা— এখনই তোমার ঘুম পায় কেন? ওই শোনো এক প্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

অমল॥ হাঁ, ওই-যে বাজছে ঢং ঢং ঢং— আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।

ছেলেরা॥ তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসব।

অমল॥ যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই! তোমরা তো বাইরে থাকো, তোমরা ওই রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন?

ছেলেরা॥ হাঁ, চিনি বৈকি, খুব চিনি।

অমল॥ কে তারা, নাম কী?

ছেলেরা॥ একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ— আরও কত আছে।

অমল॥ আচ্ছা, আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে?

ছেলেরা॥ কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল॥ কাল সকালে যখন আসবে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো-না।

ছেলেরা॥ আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল॥ পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না? কবিরাজ বারণ করেছে?

মাধবদত্ত॥ হাঁ বাবা! সেখানে রোজ রোজ বসে থেকেই তো তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।

অমল॥ না পিসেমশায়, না— আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধবদত্ত॥ সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ— আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে যায়— এতেও কি কখনো শরীর টেঁকে! দেখো দেখি, আজ তোমার মুখখানা কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

অমল॥ পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না

দেখতে পেয়ে চলে যাবে।

মাধবদত্ত॥ তোমার আবার ফকির কে?

অমল॥ সেই-যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশ-বিদেশের কথা বলে যায়—শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধবদত্ত॥ কৈ, আমি তো কোনো ফকিরকে জানি নে।

অমল॥ এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো-না সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে।

ফকিরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল॥ এই-যে, এই-যে ফকির! এসো, আমার বিছানায় এসে বোসো।

মাধবদত্ত॥ একি! এ যে—

ঠাকুরদা॥ (চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধবদত্ত॥ তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে।

অমল॥ এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির?

ঠাকুরদা॥ আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম--সেইখান থেকেই এইমাত্র আসছি।

মাধবদত্ত॥ ক্রৌঞ্চদ্বীপে?

ঠাকুরদা॥ এতে আশ্চর্য হও কেন? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ? আমার তো যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।

অমল॥ (হাত-তালি দিয়া) তোমার ভারি মজা! আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির?

ঠাকুরদা॥ খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে, সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধবদত্ত॥ এ-সব কী পাগলের মতো কথা হচ্ছে তোমাদের!

ঠাকুরদা॥ বাবা অমল, পাহাড় পর্বত সমুদ্রকে ভয় করি নে—কিন্তু, তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তা হলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।

অমল॥ না, না, পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না। এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব না, কিন্তু, যে দিন আমি ভালো হব সেই দিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব—নদী পাহাড় সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধবদত্ত॥ ছি বাবা, কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই—শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল॥ ক্রৌঞ্চদ্বীপ কিরকম দ্বীপ আমাকে বলো-না ফকির!

ঠাকুরদা॥ সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ—সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।

অমল॥ বাঃ, কী চমৎকার! সমুদ্রের ধারে?

ঠাকুরদা॥ সমুদ্রের ধারে বৈকি।

অমল॥ সব নীল রঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুরদা॥ নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে, আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে—সেই আকাশের রঙে, পাখির রঙে, পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল॥ পাহাড়ে ঝর্না আছে?

ঠাকুরদা॥ বিলক্ষণ! ঝর্না না থাকলে কি চলে! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কী নৃত্য! নুড়িগুলোকে ঠুংঠাং ঠুংঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্‌কল্‌ ঝর্‌ঝর্‌ করতে করতে ঝর্নাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে এক দণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ওই ঝর্নার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার এক পাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল॥ আমি যদি পাখি হতুম তা হলে—

ঠাকুরদা॥ তা হলে একটা ভারি মুশকিল হত। শুনলুম, তুমি নাকি দইওয়ালাকে বলে রেখেছ বড়ো হলে তুমি দই বিক্রি করবে—পাখিদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যাবসাটা তেমন বেশ জমত না। বোধ হয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত।

মাধবদত্ত॥ আর তো আমার চলল না। আমাকে সুদ্ধ তোমরা খেপিয়ে দেবে দেখছি। আমি চললুম।

অমল॥ পিসেমশায়, আমার দইওয়ালা এসে চলে গেছে?

মাধবদত্ত॥ গেছে বৈকি। তোমার ওই শখের ফকিরের তল্পি বয়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখির বাসায় উড়ে বেড়ালে তার তো পেট চলে না। সে তোমার জন্য এক-ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে, তাদের গ্রামে তার বোনঝির বিয়ে—তাই সে কলমি-পাড়ায় বাঁশির ফর্মাশ দিতে যাচ্ছে, তাই বড়ো ব্যস্ত আছে।

অমল॥ সে যে বলেছিল, আমার সঙ্গে তার ছোটো বোনঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুরদা॥ তবে তো বড়ো মুশকিল দেখছি।

অমল॥ বলেছিল, সে আমার টুক্‌টুকে বউ হবে—তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকাল বেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুরদা॥ বা, বা, খাসা বউ তো! আমি যে ফকির-মানুষ, আমারই লোভ হয়। তা বাবা, ভয় নেই, এবারকার মতো বিয়ে দিক-না। আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনো দিন ওর ঘরে বোনঝির অভাব হবে না।

মাধবদত্ত॥ যাও যাও! আর তো পারা যায় না।

[প্রস্থান

অমল॥ ফকির, পিসেমশায় তো গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না, ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে?

ঠাকুরদা॥ শুনেছি তো, তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।

অমল॥ পথে? কোন্ পথে? সেই-যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুরদা॥ তবে তো তুমি সব জানো দেখছি— সেই পথেই তো।

অমল॥ আমি সব জানি ফকির!

ঠাকুরদা॥ তাই তো দেখতে পাচ্ছি— কেমন করে জানলে?

অমল॥ তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই— মনে হয়, যেন আমি অনেক বার দেখেছি, সে অনেক দিন আগে, কত দিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে— বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্নার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে— নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই আসছে— তার পরে আখের ক্ষেত, সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে— রাত দিন একলাটি চলে আসছে— ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে— নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে— আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা॥ অমন নবীন চোখ তো আমার নেই, তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল॥ আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জানো?

ঠাকুরদা॥ জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল॥ সে তো বেশ। আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে?

ঠাকুরদা॥ বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল॥ না না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে 'জয় হোক' ব'লে ভিক্ষা চাইব— আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব— সে বেশ হবে, না?

ঠাকুরদা॥ সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

অমল॥ আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জানো ফকির? আমাকে একজন বলেছে, আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে— আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুরদা॥ কে বলো দেখি।

অমল॥ ছিদাম।

ঠাকুরদা॥ কোন্ ছিদাম?

অমল॥ সেই-যে অন্ধ, খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে; ঠিক আমার

মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুরদা॥ সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল॥ সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে; তিনি বলেন, ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানাই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না—সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা॥ ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ওইটুকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না—তা ওকে কানা বলো আর নাই বলো।

তা, ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে?

অমল॥ ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বলো সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সে দিন আমাকে সেই-যে হাল্কা দেশের কথা বলেছিলে যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই, যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হাল্কা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল।—

আচ্ছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুরদা॥ ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল॥ ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতেই পাবে না—ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল—আমি ওকে বললুম, ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা॥ বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ?

অমল॥ না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না। আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে—এক দিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।—

কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা॥ তা নাই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে—তা হলেই হল।

মাধবদত্তের প্রবেশ

মাধবদত্ত॥ তোমরা দুজনে মিলে একি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি!

ঠাকুরদা॥ কেন, হয়েছে কী?

মাধবদত্ত॥ শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা॥ তাতে হয়েছে কী?

মাধবদত্ত॥ আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা॥ সকল কথাই রাজার কানে ওঠে সে কি আমরা জানি নে?

মাধবদত্ত॥ তবে সামলে চল না কেন? রাজা-বাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আনো কেন? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুশকিলে ফেলবে।

অমল॥ ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা॥ অমনি বললেই হল! রাগ করবে! কেমন রাগ করে দেখি-না। আমার মতো ফকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ ক'রে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।

অমল॥ দেখো ফকির, আজ সকাল বেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারেই চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না।

রাজার চিঠি কি আসবে না? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়— যদি—

ঠাকুরদা॥ (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ॥ আজ কেমন ঠেকছে?

অমল॥ কবিরাজ-মশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ॥ (জনান্তিকে মাধবদত্তের প্রতি) ওই হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ওই-যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে, ওইটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধরদত্ত বলছেন—

মাধবদত্ত॥ দোহাই কবিরাজ-মশায়, চক্রধরদত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন, ব্যাপারখানা কী।

কবিরাজ॥ বোধ হচ্ছে আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম, কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধবদত্ত॥ না কবিরাজ-মশায়, আমি ওকে খুব করেই চারি দিক থেকে আগলে সামলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই নে— দরজা তো প্রায়ই বন্ধই রাখি।

কবিরাজ॥ হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে— আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। নাহয় দিন দুই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই থাক্-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি দরজা আছে। ওই-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধবদত্ত॥ অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন—

কবিরাজ-মশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখলুম, তাকে ভালোবাসলুম, এখন বুঝি আর তাকে রাখতে পারব না।

কবিরাজ॥ ওকি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে! একি উৎপাত! আমি আসি ভাই! কিন্তু, তুমি যাও, এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি

গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেইটে খাইয়ে দেখো, যদি রাখবার হয় তো সেইটেতেই টেনে রাখতে পারবে।

[মাধবদত্ত ও কবিরাজের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল ॥ কী রে ছোঁড়া!

ঠাকুরদা ॥ (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আরে আরে, চুপ চুপ!

অমল ॥ না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা, আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।

মাধবদত্তের প্রবেশ

মোড়ল ॥ ওহে মাধবদত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধবদত্ত ॥ বলেন কী মোড়ল-মশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল ॥ তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধবদত্ত ॥ ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল ॥ না, না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেইজন্যেই দেখছ না ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে?

ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি!

মোড়ল ॥ এ কি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই-যে তাঁর চিঠি।

অমল ॥ আমাকে ঠাট্টা কোরো না।

ফকির, ফকির, তুমি বলো-না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি।

ঠাকুরদা ॥ হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি, এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল ॥ কিন্তু, আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে—আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে! মোড়ল-মশায়, বলে দাও-না, এ চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল ॥ রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি-মুড়্কির ভোগ তৈরি করে রেখো—রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

মাধবদত্ত ॥ (হাত জোড় করিয়া) মোড়ল-মশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করবেন না।

ঠাকুরদা ॥ পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন এমন সাধ্য আছে ওঁর!

মাধবদত্ত ॥ আরে! ঠাকুরদা, তুমিও খেপে গেলে নাকি!

ঠাকুরদা ॥ হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি।

রাজা লিখছেন— তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজ-কবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।

অমল॥ ফকির, ওই-যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে— শুনতে পাচ্ছ না?

মোড়ল॥ হা হা হা হা! উনি আরও-একটু না খেপলে তো শুনতে পাবেন না।

অমল॥ মোড়ল-মশায়, আমি মনে করতুম তুমি আমার উপর রাগ করেছ— তুমি আমাকে ভালোবাস না। তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করি নি— দাও, আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।

মোড়ল॥ না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো।

অমল॥ এত ক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়। ওই-যে ঢং ঢং ঢং— ঢং ঢং ঢং! সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে?

ঠাকুরদা॥ ওরা যে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি।

বাহিরে দ্বারে আঘাত

মাধবদত্ত॥ ওকি ও! ওকে ও! এ কী উৎপাত!

বাহির হইতে॥ খোলো দ্বার।

মাধবদত্ত॥ কে তোমরা?

বাহির হইতে॥ খোলো দ্বার।

মাধবদত্ত॥ মোড়ল-মশায়, এ তো ডাকাত নয়!

মোড়ল॥ কে রে? আমি পঞ্চানন মোড়ল। তোদের মনে ভয় নেই নাকি?— দেখো একবার, শব্দ থেমেছে। পঞ্চাননের আওয়াজ পেলে আর রক্ষা নেই। যত বড়ো ডাকাতই হোক-না—

মাধবদত্ত॥ (জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) দ্বার যে ভেঙে ফেলেছে, তাই আর শব্দ নেই।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত॥ মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন।

মোড়ল॥ কী সর্বনাশ!

অমল॥ কত রাত্রে দূত? কত রাত্রে?

দূত॥ আজ দুইপ্রহর রাত্রে।

অমল॥ যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং —তখন?

দূত॥ হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক-বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

রাজকবিরাজের প্রবেশ

রাজকবিরাজ॥ একি! চারি দিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।—
(অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ?

অমল॥ খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজ-মশায়! আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ, সব খুলে দিয়েছ—সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

রাজকবিরাজ॥ অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরোতে পারবে?

অমল॥ পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি, কিন্তু সে যে কোন্‌টা সে তো আমি চিনি নে।

রাজকবিরাজ॥ তিনি সব চিনিয়ে দেবেন।—

(মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্য পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো। (মোড়লকে নির্দেশ করিয়া) ওই লোকটিকে তো এ ঘরে রাখা চলবে না।

অমল॥ না, না, কবিরাজ-মশায়, উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আস নি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।

রাজকবিরাজ॥ আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ ঘরে রইলেন।

মাধবদত্ত॥ (অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন—তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জানো তো সব?

অমল॥ সে আমি ঠিক করে রেখেছি, পিসেমশায়, সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

মাধবদত্ত॥ কী ঠিক করেছ বাবা?

অমল॥ আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন—আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধবদত্ত॥ (ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!

অমল॥ পিসেমশায়, রাজা আসবেন, তাঁর জন্যে কী ভোগ তৈরি রাখবে?

দূত॥ তিনি বলে দিয়েছেন, তোমাদের এখানে তাঁর মুড়িমুড়্‌কির ভোগ হবে।

অমল॥ মুড়ি-মুড়্‌কি! মোড়ল-মশায়, তুমি তো আগেই বলে দিয়েছিলে! রাজার সব খবরই তুমি জানো! আমরা তো কিছুই জানতুম না।

মোড়ল॥ আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তা হলে রাজার জন্যে ভালো ভালো কিছু—

রাজকবিরাজ॥ কোনো দরকার নেই।—

এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব—ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধবদত্ত॥ (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাত জোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা॥ চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।

সুধার প্রবেশ

সুধা॥ অমল!

রাজকবিরাজ॥ ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা॥ আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না?

রাজকবিরাজ॥ আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা॥ ও কখন জাগবে?

রাজকবিরাজ॥ এখনই যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা॥ তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ॥ কী বলব?

সুধা॥ বোলো যে 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'।

* ১৩১৮

মুক্তধারা

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরবমন্দিরচূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহু বৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝর্নাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরবমন্দিরপ্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সমস্ত দিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।

গান

জয় ভৈরব! জয় শংকর!
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর শংকর শংকর!
জয় সংশয়ভেদন জয় বন্ধনছেদন
জয় সংকটসংহর শংকর শংকর!

[সন্ন্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ
উত্তরকূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল

পথিক॥ আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।
নাগরিক॥ জানো না? বিদেশী বুঝি! ওটা যন্ত্র।
পথিক॥ কিসের যন্ত্র?
নাগরিক॥ আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল সেটা ওই তো শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।
পথিক॥ যন্ত্রের কাজটা কী?
নাগরিক॥ মুক্তধারা ঝর্নাকে বেঁধেছে।
পথিক॥ বাবা রে! ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে— মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিন-রাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে!
নাগরিক॥ আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা কোরো না।
পথিক॥ তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিন-রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে?

নাগরিক॥ আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক॥ দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতি বৎসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনও এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল— ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না।

[প্রস্থান

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ। একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে

স্ত্রীলোক॥ সুমন! আমার সুমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা, আমার সুমন এখনও ফিরল না! তোমরা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক॥ কে তুমি?

স্ত্রীলোক॥ আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন!

নাগরিক॥ তার কী হয়েছে বাছা?

অম্বা॥ তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল! আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম— ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

নাগরিক॥ তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা॥ আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ওই গৌরীশিখরের পশ্চিমে — সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

নাগরিক॥ কেঁদে কী হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো।

অম্বা॥ না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখো, আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌঁচচ্ছে না— পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক॥ কে নিচ্ছে?

অম্বা॥ যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনও তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন!

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ

দূত॥ যন্ত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি॥ কী তাঁর আদেশ?

দূত॥ এত কাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝর্নাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি॥ তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত॥ শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি॥ দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত॥ তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—

বিভূতি॥ চাষের ক্ষেতের কথা কী বলছ?

দূত॥ সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি॥ বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত॥ যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন, এখনও কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি॥ না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত॥ ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি॥ না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত॥ অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি॥ অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে! দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত॥ যুবরাজ বলছেন, কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভূতি॥ কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত॥ যুবরাজ বলছেন, ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি॥ স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন! তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত॥ তিনি বলেন, উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি॥ যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব, এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো, আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত॥ ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি॥ (চমকিয়া) ছিদ্র! সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জানো?

দূত॥ আমি কি জানি! যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন। [দূতের প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে

বিভূতিকে দেখিয়া

১॥ বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি তো বেশ লোক! কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।

২॥ সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চবুয়া গাঁয়ের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাণ্ডটা করে বসল!

৩॥ ওরে গবরু, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আর কখনও চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগুলো বের কর্, পরিয়ে দিই।

বিভূতি॥ থাক্ থাক্, আর নয়।

৩॥ আর নয় তো কী? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত, আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত, তা হলেই ঠিক মানাত।

২॥ ভাই, হরিশ ঢাকী তো এখনও এসে পৌঁছল না।

১॥ বেটা কুঁড়ের সর্দার— ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩॥ সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুত।

৪॥ মনে করেছিলুম, বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু, রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন—

৫॥ ভালোই হয়েছে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ! পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দশরথ! আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ!

৫॥ সাধে বলি! ছেলের বিয়েতে ওই রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।

৪॥ এক কাজ কর্। বিভূতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।

বিভূতি॥ আরে, করো কী! করো কী!

৫॥ না না, এই তো চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর

বিভূতিকে তুলিয়া লইল

সকলে॥ জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!—

গান

নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র!
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত—
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।

তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ -লঙ্ঘন লঘু মায়া—
তব খনিখনিত্রনখবিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র।
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজিৎ॥ শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এত দিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু, মন্ত্রী, তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্ষা?

মন্ত্রী॥ ক্ষমা করবেন মহারাজ! খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ॥ তাতে ফল হল কী? দু বছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী॥ খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিৎ॥ তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি। এ কথা বলো নি?

মন্ত্রী॥ বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্য রকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু, এখন—

রণজিৎ॥ যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী॥ কেন মহারাজ?

রণজিৎ॥ যে প্রজারা দূরের লোক তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী॥ মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলছেন। কিছু দিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝর্নাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে—

রণজিৎ॥ তা তো জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝর্নাতলায় গিয়ে শুয়ে

থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন? ও বললে, এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই।

মন্ত্রী॥ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমার কী হয়েছে যুবরাজ? রাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন? তিনি বললেন, আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁচেছে।

রণজিৎ॥ ওই ছেলের যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে।

মন্ত্রী॥ যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু, অভিরামস্বামী।

রণজিৎ॥ ভুল করেছেন তিনি; ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী॥ অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ॥ কিন্তু, এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! শিবতরাইয়ের ওই-যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠীসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী॥ মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু, জানেন তো, এমন-সব দুর্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ॥ আচ্ছা, সেজন্যে চিন্তা কোরো না।

মন্ত্রী॥ আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী॥ মোহনগড়ের খুড়া-মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে।

[প্রস্থান

রণজিৎ॥ ওই আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ; পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ। ও কিসের শব্দ?

মন্ত্রী॥ ভৈরবপন্থীর দল মন্দিরপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর শংকর শংকর!
বজ্রঘোষবাণী রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শংকর শংকর!

[প্রস্থান

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন

তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ

রণজিৎ॥ প্রণাম! খুড়া-মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পুজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিৎ॥ উত্তরভৈরব আজকের পুজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ॥ তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ॥ কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ॥ শত্রুদমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ॥ মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ॥ যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শুলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ॥ তবে তোমাদের পুজা পুজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ॥ খুড়া-মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিৎ॥ আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি? শেষে কখন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ওই উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিৎ॥ মুক্তধারার ঝর্নাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল, এ কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি?

বিশ্বজিৎ॥ হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কী দেখছ ভাই? সে বললে, যে-সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি— দূরকে নিকট করবার পথ। শুনে তখনই মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম না; ওকে বললুম, ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন, ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।

রণজিৎ॥ এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ॥ কী বুঝলে?

রণজিৎ॥ এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্যে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ॥ ক্ষতি কী হয়েছে? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই— যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ॥ খুড়া-মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য রেখেছি। কিন্তু, আর নয়— স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজিৎ॥ আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি করো তবে সহ্য করব।

[প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা॥ (রাজার প্রতি) ওগো, তোমরা কে? সূর্য তো অস্ত যায়— আমার সুমন তো এখনও ফিরল না!

রণজিৎ॥ তুমি কে?

অম্বা॥ আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সুমন কি তবে এখনও চলেছে, কেবলই চলেছে— পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

রণজিৎ॥ মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী॥ হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ॥ (অম্বাকে) তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা॥ তাই যদি সত্যি হবে, তা হলে সে দান সন্ধেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ॥ দেবে এনে। সেই সন্ধে এখনও আসে নি।

অম্বা॥ তোমার কথা সত্যি হোক বাবা! ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন!

[প্রস্থান

একদল ছাত্র লইয়া

অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল

গুরু॥ খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি! খুব গলা ছেড়ে বল্‌, জয় রাজরাজেশ্বর!

ছাত্রগণ॥ জয় রাজরা—

গুরু॥ (হাতের কাছে দুই-একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া) জেশ্বর!

ছাত্রগণ॥ জেশ্বর!

গুরু॥ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ॥ শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু॥ (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ॥ পাঁচবার।

গুরু॥ লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! বল্‌ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ॥ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু ॥ উত্তরকূটাধিপতির জয়!
ছাত্রগণ ॥ উত্তরকূটা—
গুরু ॥ ধিপতির
ছাত্রগণ ॥ ধিপতির
গুরু ॥ জয়!
ছাত্রগণ ॥ জয়!
রণজিৎ ॥ তোমরা কোথায় যাচ্ছ?
গুরু ॥ আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন, তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে।
রণজিৎ ॥ বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?
ছেলেরা ॥ (লাফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।
রণজিৎ ॥ কেন দিয়েছেন?
ছেলেরা ॥ (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।
রণজিৎ ॥ কেন জব্দ করা?
ছেলেরা ॥ ওরা যে খারাপ লোক।
রণজিৎ ॥ কেন খারাপ?
ছেলেরা ॥ ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।
রণজিৎ ॥ কেন খারাপ তা জানো না?
গুরু ॥ জানে বৈকি মহারাজ! কী রে, তোরা পড়িস নি? বইয়ে পড়িস নি? ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
ছেলেরা ॥ হাঁ হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
গুরু ॥ আর, ওরা আমাদের মতো—কী বল্‌-না— [নাক দেখাইয়া
ছেলেরা ॥ নাক-উঁচু নয়।
গুরু ॥ আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন? নাক উঁচু থাকলে কী হয়?
ছেলেরা ॥ খুব বড়ো জাত হয়।
গুরু ॥ তারা কী করে? বল্‌-না—পৃথিবীতে—বল্‌—তারাই সকলের উপর জয়ী হয় না?
ছেলেরা ॥ হাঁ, জয়ী হয়।
গুরু ॥ উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?
ছেলেরা ॥ কোনোদিনই না।
গুরু ॥ আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দু শো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত শো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?
ছেলেরা ॥ হাঁ, দিয়েছিলেন।
গুরু ॥ নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায় একদিন এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয়

তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি এক দণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী॥ কিন্তু, ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু॥ বড়ো সুন্দর বলেছেন মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা! কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন-না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী॥ আচ্ছা, বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পুজোর সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল

রণজিৎ॥ তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী॥ পঞ্চগব্যের একটা-কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এই-সব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিৎ॥ মন্ত্রী, ওটা কী আকাশে?

মন্ত্রী॥ মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ॥ এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না!

মন্ত্রী॥ আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ॥ দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে! অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী॥ আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

রণজিৎ॥ এখন মন্দিরে যাবার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

১॥ দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কিরকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে! ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন, খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।

২॥ তা যা বলিস ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেছে বটে।

১॥ আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। ওই-যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।

৩॥ আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে?

১॥ দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২॥ কেন কেন, কী হয়েছে?

১॥ কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো বলছে—

২॥ কী বলছে ভাই?

১॥ কী বলছে! ন্যাকা নাকি রে! এও আবার জিগগেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কী বলব—

২॥ তবু, ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্-না—

১॥ রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর্-না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—

২॥ সর্বনাশ! বলিস কী দাদা! হঠাৎ একেবারে?

১॥ হাঁ ভাই, ঝগড়ুর কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে-জুখে দেখে এসেছে।

২॥ ঝগড়ুর ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের ক'রে বসে।

৩॥ আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা-কিছু বিদ্যে সব—

১॥ আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মতো গুণী। কত বড়ো মাথা! ওরে বাস রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেয়েই মারা গেল।

৩॥ শুধুই কি না খেতে পেয়ে?

১॥ আরে, না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কী? আবার কে কোন্ দিক থেকে—নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেশের মানুষ যে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।

২॥ তা, তোরা যাই বলিস, লোকটা কিন্তু—

১॥ আহা, তা হবে না কেন? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম বুঝে দেখ্। ওই চবুয়াগাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম শুনেছিস তো?

২॥ আরে বাস্ রে! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে? তিনি তো সেই—ওই-যে কী বলে—

১॥ হাঁ হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মুল্লুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শত্রুজিতের একদিনও চলত না।

৩॥ সে-সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর, আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে॥ যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২॥ ওই শোনো, বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

বটুকের প্রবেশ : গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো

১॥ কী বটু, যাচ্ছ কোথায়?

বটু॥ সাবধান, বাবা, সাবধান! যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।

২॥ কেন বলো তো।

বটু॥ বলি দেবে, নরবলি! আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর

তারা ফিরল না।

৩॥ বলি কার কাছে দেবে খুড়ো?

বটু॥ তৃষ্ণা, তৃষ্ণাদানবীর কাছে।

২॥ সে আবার কে?

বটু॥ সে যত খায় তত চায়। তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মতো কেবলই বেড়ে চলে।

১॥ পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তরভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণাদানবী কোথায়?

বটু॥ খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।

২॥ চুপ চুপ পাগলা! এ-সব কথা শুনলে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেলবে।

বটু॥ তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।

১॥ তারা তো মিথ্যে বলে না।

বটু॥ বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে।

[প্রস্থান

২॥ দেখো দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

১॥ রঞ্জু, তুই বেজায় ভীতু! চল্‌ চল্‌।

[সকলের প্রস্থান

যুবরাজ অভিজিৎ

ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়॥ বুঝতে পারছি নে যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ।

অভিজিৎ॥ সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়॥ কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আল্‌গা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল?

অভিজিৎ॥ ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্‌ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে! আমার এই পথ-যাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়॥ দেখছ না, যুবরাজ, ওই যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে? যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ॥ যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়॥ রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এত দিন পরে সে কথা তুমি কী করে বুঝলে?

অভিজিৎ॥ বুঝলুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়॥ তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ॥ মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম—উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি, তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়॥ যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

অভিজিৎ॥ না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চলো তা হলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়॥ তুমি অত কঠোর হোয়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ॥ তুমি আমার হৃদয় জানো, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়॥ কোথায় তোমার ডাক পড়েছে, তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু, যুবরাজ, এই-যে সন্ধে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই-যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ॥ ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়॥ সকালে যে আসনে তুমি পুজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেতপদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে। কিন্তু, এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পুজো গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ॥ পড়ছে বৈকি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে ব'লেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়॥ গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁচচ্ছে না?

অভিজিৎ॥ হাঁ, পৌঁচচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে। চেয়ে দেখো, ওই পাখি দেবদারু গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে—ও কি নীড়ে যাবে, না অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে—জানি নে। কিন্তু, ও-যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে! সুন্দর এই পৃথিবী! যা-কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে-সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

বটুর প্রবেশ

বটু॥ যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ॥ কী হয়েছে বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে!

বটু॥ আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম; বলছিলুম, যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।

অভিজিৎ॥ কেন, কী হয়েছে?

বটু॥ জানো না যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে— মানুষ-বলি চায়!

সঞ্জয়॥ সেকি কথা!

বটু॥ সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করে-ছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু, এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না!

অভিজিৎ॥ ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু॥ (কাছে আসিয়া চুপে-চুপে) তবে শুনেছ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ?

অভিজিৎ॥ শুনেছি।

বটু॥ সর্বনাশ! তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই?

অভিজিৎ॥ না, নেই।

বটু॥ এই দেখছ না আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো? সইতে পারবে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?

অভিজিৎ॥ ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু॥ চারি দিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোক যখন ধিক্‌কার দেবে?

অভিজিৎ॥ সইতেই হবে।

বটু॥ তা হলে ভয় নেই?

অভিজিৎ॥ না, ভয় নেই।

বটু॥ বেশ বেশ! তা হলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ওই পথে। ভৈরব আমার কপালে এই-যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন, তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে।

[বটুর প্রস্থান

রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব॥ নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ?

অভিজিৎ॥ শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব॥ মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়া-মায়া আছে।

অভিজিৎ॥ ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ ক'রে বাঁ হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই, ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ধব॥ মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজন-পাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ॥ চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব॥ দুঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন, এর বেশি আর-কিছু বলতে পারব না। যদি পারো তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।

[উদ্ধবের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা॥ সুমন! বাবা সুমন!—

যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি?

অভিজিৎ॥ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে?

অম্বা॥ হাঁ, ওই পশ্চিমে, যেখানে সূর্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ॥ ওই পথেই আমি যাব।

অম্বা॥ তা হলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো— যখন তার দেখা পাবে, বোলো, মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ॥ বলব।

অম্বা॥ বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন!

[প্রস্থান

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান

জয় ভৈরব! জয় শংকর!
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর!
জয় সংশয়ভেদন জয় বন্ধনছেদন
জয় সংকটসংহর শংকর শংকর!

[প্রস্থান

সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল॥ যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিৎ॥ কী তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল॥ গোপনে বলব।

সঞ্জয়॥ (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপনে কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল॥ সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়॥ আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল॥ মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়॥ আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী, কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে—
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে।

[প্রস্থান

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী॥ বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?
সঞ্জয়॥ কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?
ফুলওয়ালী॥ আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শুনেছি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।
সঞ্জয়॥ সাধুপুরুষ না হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।
ফুলওয়ালী॥ কী কাজ করেছেন তিনি?
সঞ্জয়॥ আমাদের ঝর্নাটাকে বেঁধেছেন।
ফুলওয়ালী॥ তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?
সঞ্জয়॥ না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।
ফুলওয়ালী॥ তাই পুষ্পবৃষ্টি! বুঝলুম না।
সঞ্জয়॥ না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট কোরো'না, ফিরে যাও।—শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ওই শ্বেতপদ্মটি বেচবে?
ফুলওয়ালী॥ সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।
সঞ্জয়॥ আমি যে সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।
ফুলওয়ালী॥ তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। বোলো আমি দেওতলির দুখ্নী ফুলওয়ালী।

[প্রস্থান

বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়॥ দাদা কোথায়?
বিজয়পাল॥ শিবিরে তিনি বন্দী।
সঞ্জয়॥ যুবরাজ বন্দী! একি স্পর্ধা!
বিজয়পাল॥ এই দেখো মহারাজের আদেশপত্র।
সঞ্জয়॥ এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।
বিজয়পাল॥ ক্ষমা করবেন।
সঞ্জয়॥ আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী।
বিজয়পাল॥ আদেশ নেই।

সঞ্জয়॥ আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চললুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে, জানি জানি, পেঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল তোমার করুণ পায়ে।

শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জয়॥ একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে?

১॥ প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরও অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়॥ ওরে, আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২॥ রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার! বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়॥ তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পেঁছবে না।

গণেশ সর্দারের প্রবেশ

গণেশ॥ আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশপিশ করছে।

ধনঞ্জয়॥ তা হলে হাত দুটো বেহাত হয়েছে বল্।

গণেশ॥ ঠাকুর, একবার হুকুম করো, ওই ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়॥ মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪॥ তা হলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়॥ মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩॥ সেটা কী করে হবে প্রভু?

ধনঞ্জয়॥ মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২॥ লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়॥ আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার— সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই ক'রে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২॥ তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই-বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়॥ তা হলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ॥ কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না। তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়॥ তার পরে বিকেল যখন হবে? তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।

গণেশ॥ ও কথা বোলো না ঠাকুর! তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে ক'রে হোক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়॥ বুঝিস নি যে তা আর বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে সুর বেরোল না। একটু সুর ধরিয়ে দেব?—

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করেই মারো মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মারতে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই—
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ্ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, মার আমায় বাজে কিনা তুমি নিজে বাজিয়ে নাও। যে ডরে কিম্বা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো সারো—
আমিই হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

সকলে॥ শাবাশ ঠাকুর, তাই সই—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

২॥ কিন্তু, তুমি কোথায় চলেছ বলো তো।

ধনঞ্জয়॥ রাজার উৎসবে।

৩॥ ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ায় বলা যায় কি? সেখানে কী করতে যাবে?

ধনঞ্জয়॥ রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪॥ রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না না, সে হবে না।

ধনঞ্জয়॥ হবে না কী রে? খুব হবে, পেট ভরে হবে।

১॥ রাজাকে ভয় করো না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়॥ তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

২॥ আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩॥ রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়॥ কী চাইবি রে?

৩॥ চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো।

ধনঞ্জয়॥ রাজত্ব চাইবি নে?

৩॥ ঠাট্টা করছ ঠাকুর?

ধনঞ্জয়॥ ঠাট্টা কেন করব? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস, কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে, রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২॥ যখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়॥ রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না—রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় ক'রে বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে, বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি— লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে— মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে, যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১॥ যাই বলো, রাজদুয়োরে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়॥ কেন বলব? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

১॥ সেকি কথা!

ধনঞ্জয়॥ তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেছি সেইখানে যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১॥ কিন্তু, রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়॥ ছাড়বে কেন রে? যদি আমাকে বাঁধতে পারে তা হলে আর ভাবনা রইল কী?—

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন— সে কি অমনি হবে?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন— সে কি অমনি হবে?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে? সে কি অমনি হবে?
আপনাকে সে করুক-না বশ, মজুক প্রেমের রসে— সে কি অমনি হবে?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন— সে কি অমনি হবে?

২॥ কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়॥ আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন তবে তোদেরও সইবে।

১॥ আচ্ছা—চলো ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি; তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়॥ তবে তোরা এইখানে বোস্। এ জায়গায় কখনও আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান

১॥ দেখছিস ভাই, কী চেহারা ওই উত্তরকূটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ করে উঠতে ফুরসত পান নি।

২॥ আর, দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরার ধরণটা?

৩॥ যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।

১॥ ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২॥ ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কী!

১॥ কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মতো?

২॥ উইপোকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।

৩॥ আর, গ'ড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

১॥ ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

২॥ পাপ! পাপ! আমাদের গুরু বলে, ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস?

৩॥ কেন বল্ তো।

২॥ তা জানিস নে! সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর, দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ—অপবিত্র!

৩॥ এ তুই কোথায় পেলি?

২॥ স্বয়ং গুরু বলে দিয়েছেন।

৩॥ (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সত্য।

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

উ ১॥ আর-সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে, সেটা তো—

উ ২॥ ও-সব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে নেব। এখন বল্, যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

উ ৩॥ ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

উ ১॥ ও ভাই, ওই-যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২॥ কী করে বুঝলি?

উ ১॥ কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে? কিরকম অদ্ভুত দেখতে! যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২॥ আচ্ছা, এত দেশ থাকতে, ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১॥ কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে, বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়।

সকলের হাস্য

উ ৩॥ তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে! (হাস্য)

উ ১॥ পাছে উত্তরকূটের কান-মলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই—হয়েছে কী রে?

উ ৩॥ জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

উ ১॥ চুপ করে রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টুঁটি চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বুঝি? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

গণেশ। কেন বিভূতির জয়? কী করেছে সে?

উ ১॥ বলে কী! কী করেছে! এত বড়ো খবরটা এখনও পৌঁছয় নি? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো?

উ ৩॥ তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙ-গুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।

শি ২॥ পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?

উ ২॥ দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১॥ দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি তো।

উ ১॥ ওই-যে মুক্তধারার বাঁধ।

শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য

উ ১॥ এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেছিস?

গণেশ॥ ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাঁধবে? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েছেন—তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে?

উ ১॥ স্বচক্ষে দেখ্-না, ওই আকাশে।

শি ১॥ বাপ্ রে! ওটা কী রে?

শি ২॥ যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে!

উ ১॥ ওই ফড়িঙের ঠ্যাঙ দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ॥ রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বলবে ওই ফড়িঙের ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে!

উ ১॥ ওই দেখো কান ঢাকার গুণ। ওরা শুনেও শুনবে না, তাই তো মরে।

শি ১॥ আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩॥ বেশ করেছ, বাঁচাবে কে?

গণেশ॥ আমাদের দেবতাকে দেখ নি? প্রত্যক্ষ দেবতা? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩॥ কান-ঢাকারা বলে কী! ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরকূটের দলের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়॥ কী বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তা হলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ॥ উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

ধনঞ্জয়॥ বাঁধ বেঁধেছে বললে?

গণেশ॥ হাঁ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়॥ সব কথাটা শুনলি নে বুঝি?

গণেশ॥ ও কি শোনবার কথা? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়॥ তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুনতে হবে?

শি ৩॥ ওর মধ্যে শোনবার আছে কী ঠাকুর?

ধনঞ্জয়॥ বলিস কী রে? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা? তা সে অন্তরেই হোক আর বাইরেই হোক।

গণেশ॥ ঠাকুর, তাই ব'লে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে?

ধনঞ্জয়॥ সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা বোস্, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩॥ এ কী, বিষণ যে! খবর কী?

বিষণ॥ যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে॥ সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ॥ কী করবি?

সকলে॥ ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ॥ কী ক'রে?

সকলে॥ জোর ক'রে।

বিষণ॥ রাজার সঙ্গে পারবি?

সকলে॥ রাজাকে মানি নে।

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিৎ॥ কাকে মানিস নে?

সকলে॥ প্রণাম।

গণেশ॥ তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিৎ॥ কিসের দরবার?

সকলে॥ আমরা যুবরাজকে চাই।

রণজিৎ॥ বলিস কী!

১॥ হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ॥ আর, মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি?

সকলে॥ অন্ন বিনে মরছি যে।

রণজিৎ॥ তোদের সর্দার কোথায়?

২॥ (গণেশকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

রণজিৎ॥ ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ॥ ওই আসছেন।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ॥ তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়॥ ক্ষেপাই বৈকি, নিজেও ক্ষেপি।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কোন্ ক্ষেপা সে!
ওরে, আকাশ জুড়ে মোহন সুরে কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে!
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা!
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

রণজিৎ॥ পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়॥ না মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ॥ দেবে না! এত বড়ো আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়॥ যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ॥ আমার নয়!

ধনঞ্জয়॥ আমার উদ্‌বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ॥ তুমিই প্রজাদের বারণ করো খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়॥ ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি— প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ॥ তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বৈ তো নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন ওরা মরবে যে। দেখো বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়॥ যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওয়ালা সেইখানে বাস করেন।

রণজিৎ॥ (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে॥ আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না।

ধনঞ্জয়॥— গান

রইল বলে রাখলে কারে? হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রণজিৎ॥ মানে কী হল?

ধনঞ্জয়॥ যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁকবে না।—

যা-খুশি তাই করতে পারো, গায়ের জোরে রাখো মারো,
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।—

ভাবছ হবে তুমি যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিৎ॥ মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী॥ মহারাজ—

রণজিৎ॥ আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না?

মন্ত্রী॥ শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরও চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা॥ এ আমাদের সহ্য হবে না।
ধনঞ্জয়॥ যা বলছি, ফিরে যা।
১॥ ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বুঝি?
২॥ তা হলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব?
ধনঞ্জয়॥ আমার জোরেই কি তোদের জোর? এ কথা যদি বলিস তা হলে যে আমাকে-সুদ্ধ দুর্বল করবি।
গণেশ॥ ও কথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।
ধনঞ্জয়॥ তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।
সকলে॥ কেন ঠাকুর!
ধনঞ্জয়॥ আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি! এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে! বড়ো লজ্জা পেলুম।
১॥ সেকি কথা ঠাকুর! আচ্ছা, যা করতে বলো তাই করব।
ধনঞ্জয়॥ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।
২॥ চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে? আমাদের ভালোবাস না?
ধনঞ্জয়॥ ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে, ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা।
সকলে॥ আচ্ছা ঠাকুর, চললুম, কিন্তু—
ধনঞ্জয়॥ কিন্তু কী রে! একেবারে নিষ্কিন্তু হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।
সকলে॥ আচ্ছা, তবে চলি।
ধনঞ্জয়॥ ওকে চলা বলে? জোরে।
গণেশ॥ চললুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে।

[প্রস্থান

রণজিৎ॥ কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে?
ধনঞ্জয়॥ ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে রাজা!
রণজিৎ॥ কিসের ভাবনা?
ধনঞ্জয়॥ তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পারো নি, আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।
রণজিৎ॥ এমনটা হয় কী করে?
ধনঞ্জয়॥ ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।
রণজিৎ॥ ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।
ধনঞ্জয়॥ তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না।

ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ॥ রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়॥ ওরে বাপ্ রে! বাজে না তো কী! দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে—দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ॥ এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জয়॥ তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ॥ তবে আর দেরি কেন? সরো-না।

ধনঞ্জয়॥ আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিৎ॥ নিজে সরতে না পারো, আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।

ধনঞ্জয়॥— গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই-যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই-যে—
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কি বল্।
আমি তাঁর দুয়ারে পেঁচেছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ডরে পরান ডরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান

রণজিৎ॥ মন্ত্রী, বন্দীশালায় অভিজিৎকে দেখে এসো গে। যদি দেখো সে আপন কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত, তা হলে—

মন্ত্রী॥ মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ॥ না না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর শংকর শংকর!
বজ্রঘোষবাণী রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শংকর শংকর!

[প্রস্থান

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব॥ একি! যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন!
মন্ত্রী॥ পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই, যুবরাজকে দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১॥ মাসি, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন বলছে যুবরাজ অন্যায় করেছেন— আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।
২॥ বুঝতে পারিস নে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে! উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।
১॥ আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে যে, যুবরাজ অন্যায় করেছেন।
২॥ তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।
১॥ কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?
২॥ সবাই বলছে যে, শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে উনি এখনই উত্তরকূটের সিংহাসন জয় করতে চান— ওঁর আর তর সইছে না।
১॥ সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর! উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। যারা ওঁর নিন্দে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব, আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না!
২॥ তুই চুপ কর্‌। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এ-সব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ তার—
১॥ আমি দেশসুদ্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারি যে—
২॥ চুপ চুপ!
১॥ কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজকে আমি সব চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা হয় একটা-কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব;

বলব, বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে।

২॥ চুপ চুপ চুপ! কোথা থেকে কে শুনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

১॥ কিছুতেই ছাড়ছি নে, চল্ রাজার কাছে যাই।

২॥ ফল কী হবে। যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।

১॥ করুন রাগ, স্পষ্ট কথা বলব কপালে যাই থাক্।

৩॥ এ দিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি! হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল!

২॥ এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা, বলো তো দাদা!

৩॥ কাউকে চেনবার জো নেই।

১॥ রাজা ওঁকে শাস্তি না দেন তো আমরা দেব।

২॥ কী করবি?

১॥ এ দেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩॥ কিন্তু, ওই তো চবুয়া গাঁয়ের লোক বললে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

১॥ রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।

৩॥ লুকিয়েছে? ইস! দেয়াল ভেঙে বের করব।

১॥ ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।

৩॥ আমাদের ফাঁকি দেবে! মরি মরব, তবু—

উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী॥ কী হয়েছে?

১॥ লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুবরাজকে।

মন্ত্রী॥ আরে বাপু, আমি বের করবার কে?

২॥ তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।

মন্ত্রী॥ আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩॥ গারদ থেকে?

মন্ত্রী॥ মহারাজ তাঁকে বন্দী করেছেন।

সকলে॥ জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের!

২॥ চল্ রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী॥ গিয়ে কী করবি?

২॥ বিভূতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩॥ গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী॥ যুবরাজ পথ ভেঙেছেন ব'লে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে তাতে অপরাধ নেই?

২॥ আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে?

মন্ত্রী॥ পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩॥ আচ্ছা, তবে গারদ থাক্‌, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

৩॥ ও ভাই, ওই দেখ। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২॥ আর, ভৈরবমন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কিরকম দেখাচ্ছে!

[নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী॥ মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেছি।

উদ্ধব॥ কেন?

মন্ত্রী॥ প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু, ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়॥ মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না, তাতে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী॥ রাজকুমার, শান্ত থাকবেন; উৎপাতকে আরও জটিল করে তুলবেন না।

সঞ্জয়॥ বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী॥ তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধনমোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়॥ সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জানতুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে, তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসংকটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী॥ তবেই বুঝছেন; বন্দীশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়॥ আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্তী, বন্দীশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী॥ কী হবে?

সঞ্জয়॥ পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-একজনের

সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী॥ রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়॥ মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না; এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী॥ তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে; ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়॥ কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ; দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী॥ কী করতে?

সঞ্জয়॥ শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী॥ সময় যে বড়ো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়॥ সেইজন্যেই এই তো উপযুক্ত সময়।

[উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিৎ॥ ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব॥ হাঁ খুড়া-মহারাজ।

বিশ্বজিৎ॥ অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

উদ্ধব॥ পেয়েছি।

বিশ্বজিৎ॥ সেইমত কাজ হয়েছে?

উদ্ধব॥ অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ॥ মনে সংশয় কোরো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর-কেউ যদি এ কাজ সাধন করে তা হলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব॥ কিন্তু, সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ॥ আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে॥ আগুন! আগুন!

উদ্ধব॥ ওই হয়েছে! বন্দীশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বন্দী দুটিকে বের করে দিই।

কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিৎ॥ একি! দাদামশায় যে!

বিশ্বজিৎ॥ তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ॥ আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না—না ক্রোধে, না স্নেহে।

তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ॥ কেন ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিৎ॥ জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ॥ তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ॥ সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ॥ আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ॥ না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ॥ তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ॥ যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ॥ ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ॥ যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ॥ তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ, তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ॥ তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয়, এই কথাটি মনে রেখো।

[দুই জনের দুই পথে প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।
দু হাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিসের গানে?
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই, আগল যাবে সরে,
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল্ দাহ মিটবে দাহে— ঘুচবে সব বালাই।

বটুর প্রবেশ

বটু॥ ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়॥ বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই

একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু॥ ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত-পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে?

ধনঞ্জয়॥ ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু॥ ভরসা দাও— প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে। জাগো, ভৈরব, জাগো! আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

[প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকদলের প্রবেশ

১॥ মিথ্যে কথা! রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।

২॥ দেখব কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়॥ না বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে— সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১॥ এ আবার কে রে! বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চমকিয়ে দিলে।

৩॥ তা, বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা, এই বৈরাগীটাকেই ধরো। ওকে বাঁধো।

ধনঞ্জয়॥ যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে?

১॥ সাধুগিরি রাখো, আমরা ও-সব মানি নে।

ধনঞ্জয়॥ না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে-সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১॥ তাদের গুরু কে?

ধনঞ্জয়॥ যার হাতে তারা মার খায়।

১॥ তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি-না কেন?

ধনঞ্জয়॥ রাজি আছি বাবা! দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হোক।

২॥ সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ।

ধনঞ্জয়॥ তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।

২॥ দেখলি তো? কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কী ফন্দি চলছে।

১॥ নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন! যুবরাজকে শিবতরাইয়ে সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব। ওহে কুন্দন, বাঁধো-না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন॥ এই নাও-না দড়ি, তুমিই বাঁধো-না।

২॥ ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন?

ধনঞ্জয়॥ কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর শংকর শংকর!
বজ্রঘোষবাণী রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শংকর শংকর!

[প্রস্থান

কুন্দন॥ ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১॥ দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন॥ বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

৪॥ খবর পাওয়া গেল, ওই আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েছে।

২॥ এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। ও থাক্ এইখানেই বাঁধা পড়ে, ততক্ষণ দেখে আসি।

[নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের গান

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে গুণী মোর, ও গুণী?
বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে গুণী মোর, ও গুণী?
তা হলে হার হল যে, হার হল—
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল গুণী মোর, ও গুণী!
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে
তা হলেই সুর জাগে গুণী মোর, ও গুণী!
না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

১॥ এ কি কাণ্ড!

২॥ খুড়ো-মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরী-সুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল?

কুন্দন॥ উত্তরকূটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

১॥ ভারি অন্যায়! একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না?

২॥ এর উচিত বিধান হচ্ছে— বুঝলে দাদা—

১॥ হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন॥ আর, জানিস তো ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে?

১॥ তার সব কটি গুনে নিয়ে তবে— কী অন্যায়! অসহ্য অন্যায়!

৩॥ আর, ওঁদের সেই জাফরানের ক্ষেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বৎসরে—

২॥ হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু, এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায়?

১॥ ও ওইখানেই থাক্-না পড়ে।

[নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে ও অবোধ!
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে ও অবোধ!
ও-যে কোন্ রতন তা দেখ্ না ভাবি,
ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি সেই দরদীর প্রাণে সবে?

কুন্দনের পুনঃপ্রবেশ

কুন্দন॥ ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়॥ কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে, সেইজন্যেই তো বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন॥ এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়॥ উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন॥ তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়॥ ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে॥ জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন॥ আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম।

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ

১॥ এখন কোন্ দিকে যাই? নওসানুতে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে, তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২॥ আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে, মহারাজের হুকুম।

১॥ মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু, অম্বা পাগ্‌লির কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ, আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।

২॥ কিন্তু, এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না।

১॥ আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে।

[উভয়ের প্রস্থান

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক॥ (চীৎকার করিয়া) ওরে বুধ—ন! শম্ভু—উ! বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন নাকি?

২ পথিক॥ আমি নিম্‌কু, বাতিওয়ালা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জ্বলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

১ পথিক॥ আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু-অধিকারীর দল?

নিম্‌কু॥ অনেক মানুষ আসছে, কাকে চিনব?

হুব্বা॥ অনেক মানুষের মধ্যে তাকে খোরো না। আমাদের আন্দু, সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ— ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না, সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেক-গুলো আছে, একখানা দাও-না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিম্‌কু॥ দাম কত দেবে?

হুব্বা॥ দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব কেন?

নিম্‌কু॥ রসিক বট হে। [প্রস্থান

হুব্বা॥ বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়। উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। নাঃ, বাতিওয়ালার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক॥ হেইয়ো!

হুব্বা॥ বাবা রে! চম্‌কিয়ে দাও কেন?

পথিক॥ এখন চলো।

হুব্বা॥ চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কি-রকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি।

পথিক॥ দলের লোক তৈরি আছে, এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হুব্বা॥ কথাটা কী বললে? আমরা তিন-মোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে— স্পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক॥ আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, স্পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে তো?

হুব্বা॥ উঃ! বুঝেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে, মর্জি থাক্‌ আর না থাক্‌। কোথায় চলব? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক॥ শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা॥ শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যা-রাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক॥ নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুব্বা॥ ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না ব'লেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক॥ তুমি যেই হও-না কেন, দুখানা হাত আছে তো?

হুব্বা॥ নেহাত না থাকলে নয় ব'লেই আছে, নইলে একে কি—

পথিক॥ হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে— এখন ওঠো।

দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক॥ ওই আর-একজন লোককে পেয়েছি কঙ্কর!

কঙ্কর॥ লোকটা কে?

৩॥ আমি কেউ না বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর॥ সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন॥ যাব তো, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর॥ বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন॥ দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগছে।

কঙ্কর॥ তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে নয় সে মরবে; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা॥ ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর॥ ওই-যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কী নরসিঙ, খবর ভালো তো?

কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিঙ॥ এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয় দল আগেই রওনা হয়েছে।

কঙ্কর॥ তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরও কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন॥ আমি যাব না।

কঙ্কর॥ কেন যাবে না? কী হয়েছে?

উক্ত ব্যক্তি॥ কিছুই হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর॥ লোকটার নাম কী নরসিঙ?

নরসিঙ॥ ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর॥ আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই। কেন যাবে না বলো তো।

বনোয়ারি॥ প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর॥ আচ্ছা, নাহয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে?

বনোয়ারি॥ আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর॥ ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে, সেইখানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি॥ উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

শঙ্কর॥ ওহে নরসিঙ, লোকটা তর্ক করে যে! দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিঙ॥ শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি॥ তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কঙ্কর॥ উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খুঁজছি।

হুব্বা॥ বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা বুঝতে চাও ব'লেই যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো।

বনোয়ারি॥ তোমার প্রণালীটা কী?

হুব্বা॥ আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না ব'লেই সুর বের করছি নে; নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কঙ্কর॥ (বনোয়ারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় কী?

বনোয়ারি॥ আমি এক পা নড়ব না।

কঙ্কর॥ তা হলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

হুব্বা॥ একটা কথা বলি কঙ্করদাদা, রাগ কোরো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগত।

কঙ্কর॥ উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

হুব্বা॥ এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি।

[নরসিঙ ও কঙ্কর ছাড়া আর-সকলের প্রস্থান

নরসিংহ॥ ওই-যে বিভূতি আসছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

বিভূতির প্রবেশ

কঙ্কর॥ কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু, তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভূতি॥ উৎসবে আমার শখ নেই।

নরসিংহ॥ কেন বলো তো।

বিভূতি॥ আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌঁছল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কঙ্কর॥ কার প্রতিযোগিতা যন্ত্ররাজ?

বিভূতি॥ নাম করতে চাই নে, সবাই জানো। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে না আমার, এই হয়ে দাঁড়ালো সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই—এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে, আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিংহ॥ এত বড়ো কথা!

কঙ্কর॥ তুমি সহ্য করলে বিভূতি!

বিভূতি॥ প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর॥ কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই-এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি॥ সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিংহ॥ পাহারা রাখলে ভালো করতে না?

বিভূতি॥ সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ওই নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর॥ তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি॥ না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুশকিল এই যে, ওই গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিংহ॥ বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি॥ মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর॥ মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে॥ জাগো, ভৈরব, জাগো!

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

কঙ্কর॥ ওই দেখো, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি॥ বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এপর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বলো সেই আমিই ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়॥ সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি॥ এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়॥ না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি॥ সহজ শিকল আমাদের নয়—পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়॥ সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব! জয় শংকর!
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর!
জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর শংকর শংকর!

[প্রস্থান

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী॥ মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েছে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিৎ॥ তারা যেখানেই থাক্-না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কঙ্কর॥ মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণজিৎ॥ শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি?

কঙ্কর॥ তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিৎ॥ কী! সংশয় কার সম্বন্ধে?

কঙ্কর॥ ক্ষমা করবেন মহারাজ! প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি॥ মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ॥ আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি॥ যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে, এরকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী॥ মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন এক দিকে আত্মশ্লাঘায় অন্য দিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিৎ॥ ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়॥ বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিৎ॥ যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জানো।

ধনঞ্জয়॥ না মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।
রণজিৎ॥ তবে এখানে কী করছ?
ধনঞ্জয়॥ যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।
নেপথ্যে॥ সুমন! বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।
রাজা॥ ও কে ও?
মন্ত্রী॥ সেই অম্বা পাগ্‌লি।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা॥ কই, সে তো ফিরল না?
রণজিৎ॥ কেন খুঁজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।
অম্বা॥ ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনও ফিরিয়ে দেন না? চুপি-চুপি? গভীর রাত্রে?—সুমন! সুমন!

[প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর॥ শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।
বিভূতি॥ সেকি কথা! আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তা হলে, কী করে—
কঙ্কর॥ কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ করো নাকি?
বিভূতি॥ সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।
কঙ্কর॥ তা হলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।
বিভূতি॥ সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক, সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।
রণজিৎ॥ (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জানো?
চর॥ তারা শুনেছে যুবরাজ বন্দী হয়েছেন; তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।
বিভূতি॥ আমরাও খুঁজছি যুবরাজকে আর ওরাও খুঁজছে; দেখি কার হাতে পড়েন।
ধনঞ্জয়॥ তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।
চর॥ ওই-যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ॥ (ধনঞ্জয়ের প্রতি) ঠাকুর, পাব তো তাঁকে?
ধনঞ্জয়॥ হাঁ রে, পাবি।
গণেশ॥ নিশ্চয় করে বলো।
ধনঞ্জয়॥ পাবি রে!

রণজিৎ॥ কাকে খুঁজছিস?
গণেশ॥ এই-যে রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।
রণজিৎ॥ কাকে রে?
গণেশ॥ আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই।— আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে? ওকেও?
ধনঞ্জয়॥ মানুষ চিনলি নে বোকা? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার?
গণেশ॥ ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।
ধনঞ্জয়॥ রাখবি বৈকি। ও রাজবেশ প'রে আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর শংকর শংকর!
বজ্রঘোষবাণী রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শংকর শংকর!

[প্রস্থান

নেপথ্যে॥ মা ডাকে, মা ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!
বিভূতি॥ ওকি শুনি? ও কিসের শব্দ?
ধনঞ্জয়॥ অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল যে!
বিভূতি॥ আঃ! থামো-না! শব্দটা কোন্‌ দিকে বলো তো।
নেপথ্যে॥ জয় হোক ভৈরব!
বিভূতি॥ এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ!
ধনঞ্জয়॥ নাচ-আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি!
বিভূতি॥ শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে!
কঙ্কর॥ এ যেন—
নরসিংহ॥ বোধ হচ্ছে যেন—
বিভূতি॥ হাঁ হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? তার নিস্তার নেই!

[কঙ্কর নরসিংহ ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান

রণজিৎ॥ মন্ত্রী, একি কাণ্ড!
ধনঞ্জয়॥ বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয়মাঝে, হৃদয়মাঝে!

মন্ত্রী ॥ মহারাজ, এ যেন—

রণজিৎ ॥ হাঁ, এ যেন তারই—

মন্ত্রী ॥ তিনি ছাড়া আর তো কারও—

রণজিৎ ॥ এমন সাহস আর কার?

ধনঞ্জয় ॥—

নাচে রে নাচে চরণ নাচে
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে!

রণজিৎ ॥ শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু, এই-সব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে— আমার অভিজিৎ, দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ ॥ প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

ধনঞ্জয় ॥—

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে—
তারায় তারায় কাঁপন লাগে!

রণজিৎ ॥ ওই পায়ের শব্দ শুনছি যেন! অভিজিৎ! অভিজিৎ!

মন্ত্রী ॥ ওই যেন আসছেন।

ধনঞ্জয় ॥—

মরমে মরমে বেদনা ফুটে—
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে!

সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ ॥ এ যে সঞ্জয়! অভিজিৎ কোথায়?

সঞ্জয় ॥ মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিৎ ॥ কী বলছ কুমার!

সঞ্জয় ॥ যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিৎ ॥ বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

সঞ্জয় ॥ না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ওই পর্যন্ত— বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিৎ ॥ কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয় ॥ ওই বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ ॥ যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, তা হলে তাঁকে কি আর পাব না!

ধনঞ্জয় ॥ চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব! জয় শংকর!
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর!
জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর শংকর শংকর!
তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর শংকর শংকর!
বজ্রঘোষবাণী রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শংকর শংকর!

শান্তিনিকেতন
পৌষ-সংক্রান্তি ১৩২৮

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থরথর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারি দিকে মোর এ কী কারাগার ঘোর,

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর।

* অগ্রহায়ণ ১২৮৯

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়!
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল—যদি সে ফুল শুকায়।

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে।

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে, বিহগ বিহগী কী যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়।
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায়।
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারি দিকে চায়, মন কেঁদে গায় 'এ নহে, এ নহে, নয় গো'।
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্ ছায়াময়ী অমরায়—
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায়।
আমি যদি গাঁথি গান অথিরপরান সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি, দূরে গেলে এই মনে হয়—
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি, এমন বিপুল এ সংসার—
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি, ছাড়া পেলে কে আর কাহার!

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে অন্ধকারে অসীম গগনে—
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি, তরুহীন মরুময় ব্যোম—
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কী আছে কে জানে, নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কালতুরঙ্গম রাশ নাহি মানে, বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে-কাছে পাছে-পাছে চলিবারে চাই, জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম— চমকি তাকাই, গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে দু দণ্ডের দেখা, তাও কেন রাহু এসে ঘিরে!
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়, পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে, পড়ে রবে হায় ধরণীর শূন্য খেলাঘর!

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী, শূন্য ঘেরি জগতের ভিড়—
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি আমাদের দুদণ্ডের নীড়—
কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রিবেলা কে কোথায় হইব অতিথি!
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা, দরশের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে ক'রে কি রে চোখে জল আসে একটুকু চোখের আড়ালে!
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসে সেও কি রবে না এক কালে!
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল— সুখ দুঃখ মনের বিকার!
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল— চায়, পায়, হারায় আবার!

স্তন

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়—
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে,
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।

ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন—
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে!
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

স্মৃতি

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে—
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ—
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক!
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ—
সেই হাসি, সেই অশ্রু, সেই-সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

মোহ

এ মোহ ক দিন থাকে! এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চেনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পপটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!

কোথা কুসুমিততনু পূর্ণবিকশিত,
কম্পিত পুলকভরে যৌবন কাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ-অনল—
মনে প'ড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপনচয়ন!
দেখো, ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা—
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে—
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান—
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।

৭ই অগ্রহায়ণ
১৮৮৭

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!
রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার
আকাশেতে আলো!
সন্ধ্যা নত আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে
ক্ষুধার্ত নয়নে,
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে!
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি! কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম —
ওই নয়নের
সুগভীর অন্ধকারে (তলে) কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা!

'নিষ্ফল কামনা'। মানসী। পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

খুঁজিতেছি, কোথা তুমি, কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায় সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষাপারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে, হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী করুণ শান্তির তলে,
তোমারে কোথায় পাব—তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন! হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর, কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন একা অসহায়?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে!
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,

কেহ নহে তোমার আমার!
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে, সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে, শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে, শতদল উঠিতেছে ফুটি-
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ, দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪

তবু

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ-ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৪

জীবনমধ্যাহ্ন

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে, চলেছিনু আপনার বলে;
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস, বচনে ছিল না বিষানল;
ভাবনাভ্রূকুটিহীন সরল ললাট সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন, বেড়ে গেল জীবনের ভার;
ধরণীর ধূলি-মাঝে গুরু আকর্ষণ— পতন হইল কতবার!
আপনার 'পরে আর কিসের বিশ্বাস, আপনার মাঝে আশা নাই—
দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, ধূলি সাথে মিশে লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বারবার ধাই তব পানে ওহে তুমি নিখিলনির্ভর!
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া আছ তুমি আপনার 'পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে তোমার এ ব্রহ্মান্ড বৃহৎ—
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি, কোন্ পথে চলেছে জগৎ।

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন জ্যোতির্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা-অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি, অপ্রকাশ, চিরস্বপ্রকাশ!

যখন জীবনভার ছিল লঘু অতি, যখন ছিল না কোনো পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে, জানি নাই তোমার প্রতাপ—
তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার, সৌন্দর্য অসীম অতুলন—
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী ক্ষীণগঙ্গা সৈকতশয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগযুগান্তের ইতিহাসে নিবিষ্টনয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা, কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস, বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি ধরার অঞ্চলতল ভরি—
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে আনিতেছে জীবনলহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়, নয়নে উঠিছে অশ্রুজল—
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে আমার জীবন হয় হারা—
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে ধূলিম্লান পাপতাপধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গলমধুর, বেড়ে যায় জীবনের গতি;
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে ধরে যেন আনন্দমুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয় অবারিত জগতের মাঝে;
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবনকুহরে মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

গাজিপুর
১৪ বৈশাখ ১২৯৫

দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁষে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালো-মানুষ সেজে বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোশে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান—
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে-ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালিসন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন—
বর্‌শা হাতে ভর্‌সা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল-বাধা-হীন।

বিপদ-মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।

অন্ধকারে সূর্যালোতে সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা সঙ্গী পরানের—
ঝঞ্ঝা-মাঝে ধায় সে প্রাণ, সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষ-তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে পোলিটিকাল্ তর্ক করে,
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা, তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর!

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত জোড়কর
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি ঘৃণায়-মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘর!
ঘরেতে ব'সে গর্ব করো পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজোদর্পভরে পৃথ্বী থরহর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি।

গাজিপুর
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি—
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি।
তোমার পাই নে কূল,
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়নসম—
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার।

জোড়াসাঁকো
২৬ শ্রাবণ ১২৯৬

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী, প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহমিলনকথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া তোমারি মুরতি এসে
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ নিখিলপ্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে, সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১২৯৬

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব!
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।
সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়গৃহ-পানে? বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন

পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা দূরে বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্তকেশে, ম্লানবেশে, সজলনয়নে ?
তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে খুঁজি বিরহিণী প্রিয়া ?—
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন, গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগনপানে: ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনাসম; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণীসম। কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন!
সে-সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি ব'সে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি আর-এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।
আজি অন্ধকার দিবা বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে
বনস্পতি; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন গগনে নেহারি
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি;
বলে 'মা গো গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি'।
কোথায় অবন্তীপুরী, নির্বিন্ধ্যা তটিনী;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী

স্বর্ণহিমচ্ছায়া, যেথা নিশীথপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র; কোথা কন্‌খল
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল!

এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি; সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়। হেরি চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান!
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ!
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ!
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে!

শান্তিনিকেতন
৭-৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। অপরাহ্ণে। ঘনবর্ষায়

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি, মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে, বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি, নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা—
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে, ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

আমরা মূর্খ কহিতে জানি নে কথা, কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি,
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও—
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ, নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহন মধুর মন্ত্র জানি নে মোরা, আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

শান্তিনিকেতন
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্যে-ভরা মানবের গেহে।
তাই দুটি বাহু-'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কণদুটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ককঠিন
সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধদ্বন্দ্ব যতকিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ-বজ্র-সম সর্বত্র স্বাধীন।

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গন্ডি, কাঁকন দুখানি।

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বৈষ্ণবকবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয়স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার!
এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা! এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে—শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা—মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটিরপ্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালোবাসা,
ওই গানে যদি-বা সে পায় নিজ ভাষা,

যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি—
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি?
সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে! তারি নারীহৃদয়সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

আমাদেরই কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে—আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণবকবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চলমতিগতি।

দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।

শাহাজাদপুর
১৮ আষাঢ় ১২৯৯

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর,
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্নবাতাসে; স্নিগ্ধ অশত্থের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন; পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে;
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ ঘরে, ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার

একদণ্ডতরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড!
এত ঘট, এত পট, হাঁড়ি সরা ভাণ্ড,
বোতল বিছানা বাক্স, রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে? কিছু এর রেখে যাই,
কিছু লই সাথে।' সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনোজন। 'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে?—
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি, কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুইভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল,
আমসত্ত্ব আমচুর, সের দুই দুধ—
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধ-বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে—
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।'
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে,
'তবে আসি।' অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল-অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নানসমাপন;
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে, এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে;
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে

চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মা গো, আসি' সে কহিল বিষণ্ণনয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়;
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার;
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
তবুও সময় হল শেষ; তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে
'যেতে আমি দিব না তোমায়'? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্রদেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুক-ভরা স্নেহ!
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে;
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন—
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারা দিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো

নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে—
'যেতে নাহি দিব! যেতে নাহি দিব!' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণদীপমুখে শিখা নিব-নিব
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শত বার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন— 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিতব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'— নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা-কণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন

বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধ'রে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি; তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
'যেতে নাহি দিব'। ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব;
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়
তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব'। তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি-সম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরু-সম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।'— তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণতনুলতা
বলে, 'মৃত্যু, তুমি নাই।'— হেন গর্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কা-ভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদকুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে—
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে

পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া!

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্য-ভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে!
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী—
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লানমুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৪ কার্তিক ১২৯৯

হৃদয়যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি নূপুর-রিনিকি-ঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে?
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে—
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগতরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে—
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।

১২ আষাঢ় ১৩০০

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে—শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে; নবপুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্-দিগন্তরে; শুভ্র-উত্তরীয়-প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদয়ের চারি ধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্‌বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে

সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া! বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।

সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস, বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।
কত দিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে—চারি দিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি; হিমরেখা
নীল গিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্র পরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণ-হীন;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে

অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে— সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া-বাঁকিয়া ; ইচ্ছা করে, সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে-সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে, তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি,
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরবসন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে,
নির্লিপ্তপ্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত— সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,

নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমানতরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালোবাসি;
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘুতরীসম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে—
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ;
প্রভাতরৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি' আলিঙ্গন

সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ-'পরে সারা দিন দুলি'
আনন্দদোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দচরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রা-রূপে
তোমার সমস্ত পশু-পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চল-প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্তহিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনোদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেল-দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা

মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিতমর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহো
মোরে আরবার; দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে, জনশূন্য বালুকার তীরে—
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি! কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যামকল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিতপরানি যত; আনন্দের রস
কত রূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই

একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার?
প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে—যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে—জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকা-সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন; তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে, আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্তবাসী
নিদ্রা হতে উঠি? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি? আসিব না নেমে
তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গ-মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ,
প্রেমের অঙ্কুর-রূপে? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন

ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি
এই-সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়-মাঝে; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা-রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা,
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ-মাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটে নি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহো গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে—
আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের—
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক ১৩০০

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায় অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে?
তুমি হাসো শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না ব'লে।

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীলনীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি 'কে যাবে সাথে',
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।

তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়—
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।
বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

জ্যোৎস্নারাত্রে

শান্ত করো, শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমাযামিনী! অতিশয়
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারম্বার, তুমি এসো স্নিগ্ধ অশ্রুপাত

দগ্ধ বেদনার 'পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহ-ভরা নিদ্রা-ভরা করপদ্মদল
আমার সর্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া,
বিভাবরী, সর্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

বহুদিন পরে আজি দক্ষিণবাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপ্ত শির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর
হে মৌনরজনী! পান্ডুর অম্বর হতে
ধীরে ধীরে এসো নামি লঘুজ্যোৎস্নাস্রোতে,
মৃদুহাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জন শিয়রতলে। বেড়াক ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদিরলহরী
সমীরহিল্লোলে; স্বপ্নে বাজুক বাঁশরি
চন্দ্রলোকপ্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক আমার তনু; অধীর মর্মরে
শিহরি উঠুক বন মাথার উপরে;
চকোর ডাকিয়া যাক দূরশ্রুত তান;
সম্মুখে পড়িয়া থাক্ তটান্তশয়ান
সুপ্ত নটিনীর মতো নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা।

হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহো দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি-মাঝে, অসীমসুন্দর,
ত্রিলোকনন্দনমূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা-লাগি—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা।
আজি মোরে করো দয়া, এসো তুমি অয়ি—
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,

খুলে ফেলো—আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এসো ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মতো হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে। সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্নপুষ্পদলসম পড়ে যাক খুলি
তব চারি দিকে—বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে যাক নীচে। বক্ষ হতে লহো টানি
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহো অপসারি
উন্মুক্ত অলক। কোনো মর্ত দেখে নাই
যে দিব্যমুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ করো; একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও, একান্ত নির্জন
সন্ধ্যার তারার মতো; আলিঙ্গনস্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে, ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো। একরাত্রি-তরে,
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর;
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ! কোথায় গাহিছে গান!
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে, উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব বিরহে! খোলো দ্বার, খোলো দ্বার—
তোমাদের মাঝে মোরে লহো একবার

সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি, সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা— রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা!

রাত্রি। ৫-৬ মাঘ ১৩০০

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত করো শির। দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আনো
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখো রাখো অভিযোগ তব,
মৌন করো বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ। হেরো মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্বাক্‌ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী— নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়নযুগল
অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনাপরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্তমনে, সন্ধি করো অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে। বিন্দু-দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি। অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে, মর্মান্তিক নীরবতা
করুক বিস্তার।

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটিদুই-তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দচরণে; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো। ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীবজীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা,
তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষকোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর,
শূন্য-পানে—'আরো কোথা! আরো কত দূর!'

পতিসর
সন্ধ্যা। ৯ ফাল্গুন ১৩০০

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালো সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী?
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা!
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবালপালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে!
যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে-গঠিতা
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,

তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্তভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা—
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,
অয়ি অসম্বৃতে।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা;
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী॥

'পদ্মা'। শিলাইদহ-অভিমুখে
২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
হে দেব, হে দেবীগণ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো।

দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে; অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্তের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে; নন্দনকানন
মর্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি; মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে; সন্ধ্যা আসি দিবা-অবসানে
নির্জনপ্রান্তরপারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্যসংগীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনকনূপুরে
তালভঙ্গ হত। হেলি উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝংকারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা। দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি। ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস—খসি ঝরি
পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী।

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে: করো সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—

মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা— অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

হে অপ্সরী,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান— লইনু বিদায়।
তুমি কারে করো না প্রার্থনা; কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিতকম্পিতবক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে
চন্দনচর্চিতভালে রক্তপট্টাম্বরে
উৎসবের বাঁশরিসংগীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্রশিয়রে।

দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন-সম— যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের; মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর; দক্ষিণ-অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্তভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পূরিল, অমনি এ স্বর্গলোক
অলস-কল্পনা-প্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা— বিন্দু-অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া। হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত, আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুন তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ; স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে-সুখে-ভয়ে-ভরা প্রেমের সংসারে,
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে

আমারে লইবে চির-পরিচিত-সম—
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমানপ্রাণে,
শঙ্কিত-অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই
'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'।

শিলাইদহ
২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে মধুর আবেশভরে।

তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি।
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার কমলকোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন, মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি—
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসিমুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে নবীনমিলনসুখে।

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠিছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।

দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণসিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিয়েছ দেখা'!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনতশিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে।

১ ফাল্গুন ১৩০২

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

২৮ চৈত্র ১৩০২

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা শ্যামগম্ভীর-সরসা।

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে—
নিখিলচিত্তহরষা ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা, কোথা তোরা অভিসারিকা
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা। কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী, ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী। এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী!

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে— অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিতবয়নে— কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে,
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী—কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী— শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না, নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা! নীপশাখে, সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা, গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে "
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা— শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, এই আমি।'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলে নি দীপ,
পরিতেছিলেম কপালে সোনার টিপ,
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন-মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ক্লান্তচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, এই আমি।'

ফাগুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন-বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ারসমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, এই আমি।'

শান্তিনিকেতন
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি—ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।

তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণকরে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে; ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।

দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

শান্তিনিকেতন
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন-মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।
পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

লীলা

কেন	বাজাও কাঁকন কনকন কত	ছলভরে!
ওগো	ঘরে ফিরে চলো কনককলসে	জল ভ'রে।
কেন	জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি	করো খেলা!
কেন	চাহ খনে খনে চকিত নয়নে	কার তরে
কত	ছলভরে!
হেরো	যমুনাবেলায় আলসে হেলায়	গেল বেলা,
যত	হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি	কলস্বরে
কত	ছলভরে!
হেরো	নদীপরপারে গগনকিনারে	মেঘ-মেলা,
তারা	হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি	মুখ-'পরে
কত	ছলভরে!

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৪

সুওরানীর সোহাগ

সুওরানী কহে, 'রাজা, দুওরানীটার
কত মতলব আছে বুঝে ওঠা ভার!
গোয়াল ঘরের কোণে দিলে ওর বাসা,
তবু দ্যাখো অভাগীর মেটে নাই আশা!
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালো গোরুটিরে তব দুহে নিতে চায়!
ছেলে তার ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে রাত্রিদিবা,
এবার তাহার কান্না থামিল বুঝিবা!'
রাজা বলে, 'ঠিক ঠিক! বিষম চাতুরী!
এখন কী করে ওর ঠেকাইব চুরি!'
সুও বলে, 'একমাত্র রয়েছে ওষুধ—
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ!'

* কার্তিক ১৩০৫

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুম্‌ধাম্‌—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'—হাসে অন্তর্যামী।

* অগ্রহায়ণ ১৩০৬

উদারচরিতানাম্‌

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
'ধিক্‌ ধিক্‌' করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠে বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই?'

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পরিচয়

দয়া বলে, 'কে গো তুমি, মুখে নাই কথা!'
অশ্রুভরা আঁখি বলে, 'আমি কৃতজ্ঞতা।'

* অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পরশপাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা, গায়ে মাখে ছাইধুলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারি হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর—
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়,
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্বগগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল্‌,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।
কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে—
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

এত দিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু—
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা—
তবু ডাকে সারা দিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভুলি আকাশে তরঙ্গ তুলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত—
যত করে হায়-হায় কোনো কালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর—
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে,
'সন্ন্যাসীঠাকুর, একি! কাঁকালে ও কী ও দেখি,
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?'
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে!
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার! তুলে দেখে বার বার,
আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর ব'সে পড়ে ভূমি'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা।
পাগলের মতো চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের 'পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি—
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিমদিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর, নুয়ে পড়ে দেহভার,
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।

পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে,
আসন্ন রজনীছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর।

শান্তিনিকেতন
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

পুরস্কার

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে, কহিল কবির স্ত্রী—
'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো তার খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম!
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব, না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা—
নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা!
ভারতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি।
এত শিখিয়াছ, এটুকু শেখ নি কিসে কড়ি আসে দুটো!'
দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া
কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া কহে জুড়ি করপুট—
'ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে—
ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে এ কথা শুনিবে কেবা!
আমার কপালে বিপরীত ফল—
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল এত করি তাঁর সেবা।

তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্তে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল অমনি সর্বনাশ।'
মনে মনে হাসি মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া, 'পারি নেকো আর—
ঘরসংসার গেল ছারেখার, সব তাতে পরিহাস!'
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখখানি
শিঞ্জিত করি কাঁকন দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি রোষছলে যায় চলি।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন
উচাটন কবি কহিল, 'অমন যেয়ো না হৃদয় দলি।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু পায়;
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়— বুদ্ধি জোগাও তুমি।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমারি মুরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই— সমস্ত মরুভূমি।'
'হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়'
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়,
'যেমন বিনয় তেমনি প্রণয় আমার কপালগুণে।
কথার কখনো ঘটে নি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব—
একবার, ওগো বাক্যনবাব, চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখো পাঁজি খুলি,
সঙ্গে করিয়া লহো পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি চলো রাজসভামাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মানুষ হইয়া গেল কত লোক—
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক লাগিবে কিসের কাজে!'
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ;
ভাবিল, 'বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানি নে রাজা-মহারাজ— কপালে কী জানি আছে!'
মুখে হেসে বলে, 'এই বৈ নয়!
আমি বলি আরো কী করিতে হয়—
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয় বিধবা হইবে পাছে।
যেতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ!
ত্বরা ক'রে তবে নিয়ে এসো সাজ—

হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ, কেয়ূর, কনকহার।
বলে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে আয়োজন করো তার।'
ব্রাহ্মণী কহে, 'মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই কী চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে তার না দেখি আবশ্যক।
নানা বেশভূষা হীরা রুপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা—
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা, রসনা ক্ষান্ত হোক।'
এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ
আনে বেশবাস নানান-ধরণ;
কবি ভাবে মুখ করি বিবরন আজিকে গতিক মন্দ।
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কষিয়া পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়, কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন সেও আজি হার মানে।
এইমতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক—
হাসি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক, 'আ মরি, সেজেছ কিবা!'
কোলের উপরে বসি, বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, 'কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব ও রাঙা চরণতলে।'
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি,

উষ্ণীষ-পরা মস্তক তুলি
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি— দ্রুত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উঁকি মারি চায়, মনে মনে হাসে— কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুলপুলকে,
'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে,
এমনটি আর পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে।'

এ দিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে,
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ্‌ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা,
সারি সারি দাঁড়ি করে দিশাহারা— হেথা কি আসিতে আছে!
হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারীমহাশয় সবে গম্ভীরমুখ।
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি, দমি যায় তার বুক।
বসি মহারাজ মহেন্দ্ররায়
মহোচ্চ গিরি-শিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায় অচল-অটল-ছবি।
কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহামহিমা নয়ন ভরিয়া চাহিয়া দেখিল কবি।
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত কারো বা হরিৎবর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য—
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ—
যার যথামত পায় বরাদ্দ, রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ, 'হোথা বসিয়া কে ওই,
এসো তো মন্ত্রী, সন্ধান লই।'

কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই, আমি শুধু এক কবি।'
রাজা কহে, 'বটে ! এসো এসো তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।'
বসাইলা কাছে মহাগৌরবে ধরি তার কর দুটি।
মন্ত্রী ভাবিল, 'যাই এই বেলা,
এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা।'
কহে, 'মহারাজ, কাজ আছে মেলা, আদেশ পাইলে উঠি।'
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ-ইঙ্গিতে মহাতটস্থ
বাহির হইয়া গেল সমস্ত সভাস্থ দলবল—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ-উপাধি বন্যার যেন জল।

চলি গেল যবে সভ্যসুজন
মুখোমুখি করি বসিলা দুজন,
রাজা বলে, 'এবে কাব্যকূজন আরম্ভ করো কবি !'
কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে—
'প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানসসরসবাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিতমঞ্জুভাষিণী কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া—
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি—
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জানো তো, মা বাণী, নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মা গো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী অমৃত-উৎস-ধারা—
যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত-মাঝে বহমান নিয়ত আত্মহারা।

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চির-জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া,
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়—
বালুকার 'পরে কালের বেলায় ছায়া-আলোকের খেলা
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ—
সকালে ফুটিছে সুখ দুখ লাজ, টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর—
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী—
জানে না আপনা, জানে না ধরণী, সংসারকোলাহল।
সে জন পাগল, পরান বিকল—
ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল, ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা-আনন্দ—
অপূর্বগীত অলোকছন্দ শুনিছে নিত্যনব।
বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী—
বারেকের তরে ভুলাও, জননী,
কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী, কেবা আগে কেবা পিছে—
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়, কে উপরে কেবা নীচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে—
সুখে প'ড়ে রবে পদপল্লবে যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি
কুন্দবরন-সুন্দর-হাসি বীণা হাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা
সারি সারি যত মানবের ধারা

অনাদি কালের পান্থ যাহারা তব সংগীতস্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল নাচে দশ দিক হতে।'

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি রাঘবের ইতিহাস—
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,
জীবনের শেষ দিবস অবধি অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই এক দিন কেটেছে কেমনে
যে দিন মলিন বাকলবসনে চলিলা বনের পথে—
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লানছায়াসম বিষাদবিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন উঠিলা বিদায়রথে।
রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার—
এমন বজ্র কখনো কি আর পড়েছে এমন ঘরে!
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারি ধার—
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার শুধু নিমেষের ঝড়ে।
আর-এক দিন, ভেবে দেখো মনে,
যে দিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটিরভবনে দেখিলা জানকী নাহি—
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—
এত বিষাদের এত বিরহের এত সাধনের ধন
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়বিনয়ে নমি রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে হইলা অদর্শন।
সে-সকল দিন সেও চলে যায়—
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—
যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায় অসীম দগ্ধ রেখা।

দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল শ্যামলেখা।
শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে বাজে মানবের কানে।

হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্‌দিগন্ত হাসিয়া গিয়াছে ভাসি
এমনি বরষা আজিকার মতো
কত দিন কত হয়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত ফেলেছ অশ্রুরাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে আজি আমাদেরই মতো—
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান
দু'হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ— ভেসে ভেসে যায় কত।
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে,
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা সুন্দর ধরাতল।
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদ-প্রতিবাদ,
যে ক দিন আছি মানসের সাধ মিটাব আপনমনে—
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি ফুটাই আকাশভালে—

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন সংসারধূলিজালে।
অতিদুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে ঝর্ঝরসংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা ছোটো এই বাঁশরিতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর— তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ'পরে শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে মাগিছে তেমনি সুর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী—
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি, রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল, হয়ে গেছে দুখ—
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,

ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক উন্মুখ ভালোবাসা।
শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তরমাঝে— আয় রে বৎস, আয়,
ফেলে রেখে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন চিরবসন্তবায়।
সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু পায় বার বার নমো নম।'

এত বলি কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধনয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান বীণাঝংকারসম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল্‌,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল—
দু বাহু বাড়ায়ে পরান-উতল কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা, 'ধন্য, কবি গো, ধন্য—
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য, চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্‌ উপহারে,
যাহা-কিছু আছে রাজভাণ্ডারে সব দিতে পারি আনি।'
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দু নয়ন কবি তাঁরে বলে,
'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে ওই ফুলমালাখানি।'

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে—
কেহ শিবিকায় কেহ ধায় রথে,
নানা দিকে লোক যায় নানা মতে কাজের অন্বেষণে।
কবি নিজমনে ফিরিছে লুব্ধ,
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃতদুগ্ধ দোহন করিছে মনে।
কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ
সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস
বসি একাকিনী বাতায়নপাশ, সুখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারি দিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,

যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে দিতেছে চঞ্চুপুটে।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি,
অতিসত্বর সম্মুখে আসি
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি, 'দেখো কী এনেছি বালা!
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন রাজকণ্ঠের মালা।'
এত বলি মালা শির হতে খুলি
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি—
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি, ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি মুখে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ— হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে, 'বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন।'
বসি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ শূন্যে নয়ন মেলি।
কবির ললনা আধখানি বেঁকে
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে—
পতির মুখের ভাবখানা দেখে মুখের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া পড়িল তাহার বুকে—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া
শতবার করি আপনি সাধিয়া চুম্বিল তার মুখে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়—
মালাখানি লয়ে আপন গলায় আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে লক্ষ্মী সরস্বতী।

সাহাজাদপুর
১৩ শ্রাবণ ১৩০০

ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, 'বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি
করো অবধান।'

হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
'ভগবন্‌, ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম নাম মোর।' শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
'কুশল হউক সৌম্য! গোত্র কী তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' বালক কহিলা ধীরে,
'ভগবন্‌, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।'

এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম ঘন-অন্ধকার

বনবীথি দিয়া, পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী; বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম—
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার?'
শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি তাত!'

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণকণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্তসামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম;
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।

আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে,—
'কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন?'
তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্‌,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে; কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।'

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো সবে বিস্ময়বিকল—
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি; বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত—
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'

৭ ফাল্গুন ১৩০১

পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী, চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা, লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে, আমি তারি এক বারাঙ্গনা।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ আঁকিল প্রথম সোনার লেখা,
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে পূর্ব-অচলে উষার মতো—
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা, জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ-শত।
মনে হল, মোর নবজনমের উদয়শৈল উজল করি
শিশিরধৌত পরম প্রভাত উদিল নবীন জীবন ভরি।
তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া পঞ্চম সুরে ধরিল গান—
ঋষির কুমার মোহিত চকিত মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে মুনিবালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।

নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে নদীজলতলে বাজিল শিলা—
ভগবান ভানু রক্তনয়নে হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশুসম চাহিলা কুমার কৌতূহলে—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তিকিরণ দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি—
বন্দনাগান রচিলা কুমার জোড় করি করকমল দুটি।
করুণ কিশোর কোকিলকণ্ঠে সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তিমগন পাতায় পাতায় শিহরি উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা নির্জনগিরিশিখর-'পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা নীলনির্বাক্ সিন্ধুতলে।
শুনে গ'লে যায় আর্দ্র হৃদয় শিশিরশীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।
ব্যথিতচিত্তে ত্বরিতচরণে করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি—
কহিনু, 'হে মোর প্রভু তপোধন, চরণে আগত অধম দাসী।'
তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ মুছানু আপন পট্টবাসে—
জানু পাতি বসি যুগল চরণ মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো—
তাপসকুমার চাহিলা আমার মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা, সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়, উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া, কুমারীর নব নীরব প্রীতি—
আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রে বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে, 'কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃতসরস, তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'

মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা, শুনি নি এমন সত্যবাণী।
দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি, নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা—
দূরদুর্গম মনোবনবাসে পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস, সেই পথহীন বিজন গেহ—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর যেথা কোনোদিন আসে নি কেহ।

সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল, জাগে আনন্দ ভকতপ্রাণে—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে, 'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার, ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন, দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন সঁপি দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি নিল পলকেই মোরে তপোবনপবন এসে।

তোমার পামরী পাপিনীর দল খলখল করি হাসিল হাসি—
আবেশে বিলাসে, ছলনার পাশে চারি দিক হতে ঘেরিল আসি।
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে, বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি—
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে লীলায়িত করি হস্ত-দুটি।
হে মোর অমল কিশোর তাপস, কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি
আমার কাতর অন্তর দিয়ে ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া পারিতাম যদি দিতাম টানি
উষার রক্ত মেঘের মতন আমার দীপ্ত শরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না, নিয়ো না, হে মোর অনল, তপের নিধি—
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই এমন ক্ষমতা দিল না বিধি!
ধিক্ রমণীরে, ধিক্ শতবার, হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্!
রমণীজাতির ধিক্কারগানে ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।
ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায় লুটায়ে ছিন্নলতিকাসমা
কহিনু তাপসে, 'পুণ্যচরিত, পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি!'
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু শরমের শর মর্মে বিঁধি।
কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে, 'আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি!'
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি।

ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার তপোবনতরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল বাঁশির মতন মধুর বাণী—
'আনন্দময়ী মুরতি তোমার, কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ, তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার সরল নয়ন করে নি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

৯ কার্তিক ১৩০৪

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল,
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেইমত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্‌বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি—রক্তবেগতরঙ্গিত-বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তার উদ্দেশ—
তরুণগরুড়-সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়!—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি উত্তরিলা তপোভূমি-'পরে।
নমস্কার করি কবি শুধাইলা সঁপিয়া আসন,
'কী মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্তে আগমন?'
নারদ কহিলা হাসি, 'করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, 'যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর-বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো, বোলো তারে, ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহাসংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্তলোকে দিবে অমরতা?''

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
'দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য, অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জনগান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি মিলাইছে এক স্রোতে
সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু-পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্‌ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্মকোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ, সকল প্রয়াস,
জীবলোকমাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গমপল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান—সেইমত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত-উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদ্বারণকারী মর্মান্তিক মহান্‌ নিশ্বাস!
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্‌ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম-সুন্দর-গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোমনীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি,
ছন্দ সেই অগ্নি-সম বাক্যেরে করিব সমর্পণ—
যাবে চলি মর্তসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্ব-পানে—
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,
তেমনি আমার ছন্দ ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে,
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে—
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহো মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'

নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'
'জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা।
কহিলা বাল্মীকি, 'তবু, নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।'

নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

* ১৩০৬

অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে   একদা ছিলেন সুপ্ত—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে   ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ   সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল   ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।
নগরীর নটী চলে অভিসারে   যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীলবরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ   থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার   নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান   ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।
কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,   নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর—   এ নহে তোমার শয্যা।'

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,   'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যে দিন আসিবে আপনি   যাইব তোমার কুঞ্জে।'

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য।

...

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।
অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বার বার—
এত দিন পরে এসেছে কি তাঁর আজি অভিসাররাত্রি।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী বাহির-প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে তাঁহার চরণোপান্তে।
নিদারুণ রোগে মারী গুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে শীতচন্দনপঙ্কে।
ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী। সন্ন্যাসী কয়,
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!'

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

মহাবস্তুবদান

'রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে!' রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগরবাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী বণিক পান্থ, তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোওয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি;
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে
সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি—নয়নসম্মুখে
স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি—
শ্যামা ডাকিতেছে তারে: বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি।' শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত: সত্বর পশিল গৃহমাঝে,
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি

রাজকার্যে—সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।'
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা,
'একি লীলা হে সুন্দরী, একি তব লীলা!
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান!' শুনি শ্যামা কহে,
'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।'
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে,
'আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।' কহিল প্রহরী,
'তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।' ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, 'শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো, এ মিনতি করি।'
'রাখিব তোমার কথা' কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্গদস্বরে,
'বিকারের বিভীষিকা-রজনীর 'পরে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র-উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুরনগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী!'

'আমি দয়াময়ী!'— রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা,
'এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।'
এত বলি দৃঢ়বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে
পূর্ববনান্তরে; ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
'হে বিদেশী, এসো এসো' কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, 'হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবনমরণপ্রভু!' নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসবগান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল, 'কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি, অয়ি বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।' আলিঙ্গন ঘনতর করি
'সে কথা এখন নহে' কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণস্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন,
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে, জনপদ-বাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে

কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীতশব্দহীন;
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন;
পক্কশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ, পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়,
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে,
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।' বস্ত্র টানি মুখোপরি
'সে কথা এখনো নহে' কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।

শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়—
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো, ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা; পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, 'প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব;
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো— বালক কিশোর,

উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর; সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।'

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহামাঝে; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি—মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা। মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্ত নারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, 'ক্ষমা করো, নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা-লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।'
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, 'আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল! এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।'

এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতি ক্ষণে। ঘন গুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত

বায়ুশূন্য বনতলে; তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার;
নিস্তব্ধনিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্তকলেবর
পথিক বসিল ভূমে।

কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম। সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ ক'রে
গর্জিল পথিক, 'তবু ছাড়িবি না মোরে?'
রমণী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ-সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্তবেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘননিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার; আর্দ্রগদ্‌গদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় 'ছাড়িব না—ছাড়িব না'
কহে বারম্বার, 'তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত—
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।'
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতিস্বর; তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন,
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎবরন
মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।

ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে, 'কে গো গৃহছাড়া,
এসো আমাদের ঘরে।' দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি; শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি, ঝংকার তাহার
শতমুখ শর-সম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি; রাশীকৃত করি
তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।

শুক্লপঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণতরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন 'এসো এসো প্রিয়া'
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম!
'এসো এসো প্রিয়া!' 'আসিয়াছি প্রিয়তম'—
চরণে পড়িল শ্যামা, 'ক্ষম মোরে ক্ষম।
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে!' শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ'পরে;
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি
চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি—
গরজিল, 'কেন এলি, কেন ফিরে এলি!'
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি
জ্বলন্ত অঙ্গারসম, নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি।
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি

কহিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও!'
নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে; পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল; তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমিরমাঝে মিলায় যেমন।

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

শেষ শিক্ষা

এক দিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবনকথা—যে সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণ রূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটমগ্ন। তবে এ কি ভুল!
তবে কি জীবন ব্যর্থ!—দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়
গোবিন্দ ভাবিতেছিল; হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, 'যাব চলি দেশে,
ঘোড়া যে কিনেছ তুমি দেহো তার দাম।'
কহিল গোবিন্দ গুরু, 'শেখজি, সেলাম!
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই!'
পাঠান কহিল রোষে, 'মূল্য আজই চাই।'
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত
'চোর' বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, 'বুঝিলাম আজ,
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার

নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।'

পুত্র ছিল পাঠানের, বয়স নবীন—
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখালো তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, 'একি প্রভু, একি!
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্রশাবকেরে
যত যত্ন করো তার স্বভাব কি ফেরে!
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর,
গুরুদেব, মনে রেখো হবে যে প্রখর।'
গুরু কহে, 'তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে!'
বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন, সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠান-তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজির। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বীজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
'শিক্ষা মোর সারা হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।'
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
'আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।'

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
'অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে।' ভক্তদল
'সঙ্গে যাব' 'সঙ্গে যাব' করে কোলাহল।
গুরু কন, 'যাও সবে ফিরে।' দুই জনে,
কথা নাই, ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটুজল,
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে এক ধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইশারা করিল গুরু, পাঠান দাঁড়ালো।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিম প্রান্তর-পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে,
'মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে।'
উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,
'পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়। আজ আসিয়াছে দিন—
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার, পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণরক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।'

বাঘের মতন
হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে—গুরু রহে স্থির
কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান;
কহিল, 'হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। 'ধর্ম জানে

ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু ব'লে জেনেছি তোমারে
এত দিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা প'ড়ে হিংসা যাক ম'রে। প্রভু, দেহো
পদধূলি।'—এত বলি বনের বাহিরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল; না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সে দিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

এক দিন আরম্ভিলা শতরঞ্চ-খেলা
গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁটশিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন্ হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু; কহে অট্টহাসি,
'পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার!'
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, 'এত দিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু—আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার!'

৬ কার্তিক ১৩০৬

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এত বকুল ফোটে, গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো, সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ-সব যারা বোঝে তারা পঞ্চাশতের অনেক নীচে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।

ঘরের মধ্যে বকাবকি, নানান মুখে নানা কথা—
হাজার লোকে নজর পাড়ে, একটুকু নাই বিরলতা—
সময় অল্প, ফুরায় তাও অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি সৎপ্রসঙ্গ-আলোচনায়—
হতভাগ্য নবীন যুবা কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।

আমরা সবাই নব্যকালের সভ্য যুবা অনাচারী,
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে, পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়-পত্র, চালান মামলা-মকদ্দমা;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন থাকুক রত কঠিন ব্রতে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।

* ১৩০৭

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা, হে পুরাতন সহচরী!
ইচ্ছা বটে বছর-কতক তোমার জন্য বিলাপ করি—
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায় মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে,
নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক তোমায় চির-আপন জেনেই—
হায় রে আমার হতভাগ্য, সময় যে নেই, সময় যে নেই।

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে, বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে ঝ'রে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে অস্তে পালায় পূর্ণ-ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু—
তাঁদের পানে তাকাব না তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়োই বর্বরতা— সময় যে নেই, সময় যে নেই।

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি, এসো আমার শরৎলক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্তদিন লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো, তুমি এসো, এবং তুমি—
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জানো ধরণীর নাম মর্তভূমি—
যে যায় চলে বিরাগ-ভরে তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ ক'রে কাটাই এমন সময় যে নেই, সময় যে নেই।

ইচ্ছে করে ব'সে ব'সে পদ্যে লিখি গৃহকোণায়—
তুমিই আছ জগৎ জুড়ে— সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়।
ইচ্ছে করে কোনো মতেই সান্ত্বনা আর মানব না রে—
এমন সময় নতুন আঁখি তাকায় আমার গৃহদ্বারে,
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি তারেই শুধু আপন জেনেই—
কখন তবে বিলাপ করি? সময় যে নেই, সময় যে নেই।

* ১৩০৭

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার দেবে তুলে?

দাও তো ভালোই, কিন্তু জেনো হে নির্মলে—
আমার মালা দিয়েছি, ভাই, সবার গলে।
যে-কটা ফুল ছিল জমা অর্ঘ্য মম
উদ্দেশেতে সবায় দিনু— নমো নমঃ।

কেউ-বা তাঁরা আছেন কোথা কেউ জানে না,
কারো-বা মুখ ঘোমটা-আড়ে আধেক-চেনা।
কেউ-বা ছিলেন অতীত কালে অবন্তীতে,
এখন তাঁরা আছেন শুধু কবির গীতে।
সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে পরিচ্ছদে
কহেন বিধি 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে'।

হৃদয় নিয়ে আজ কি, প্রিয়ে, হৃদয় দেবে?
হায় ললনা, সে প্রার্থনা ব্যর্থ এবে।
কোথায় গেছে সেদিন আজি যেদিন মম
তরুণকালে জীবন ছিল মুকুল-সম—
সকল শোভা, সকল মধু, গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে বন্ধ ছিল বন্দীমত।

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে অনেক দূরে—
অনেক দেশে, অনেক বেশে, অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধতে পারে একটিখানে
এমনতরো মোহন-মন্ত্র কেই-বা জানে!
নিজের মন তো দেবার আশা চুকেই গেছে,
পরের মনটি পাবার আশায় রইনু বেঁচে।

* ১৩০৭

প্রতিজ্ঞা

আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুল-বন,
যদি মনের মতন মন না পাই জিনি,
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না পাই সে তপস্বিনী।

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই ভুবন-ভুলানো হাসি।

যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন-মল রিনিক্‌ঝিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না পাই গো তপস্বিনী।

আমি হব না তাপস, তোমার শপথ, যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে নূতন হৃদয়তলে।
যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরমদ্বার
কোনো নূতন আঁখির ঠার না লই চিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, হব না, না পেলে তপস্বিনী।

১৩০৭

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন যায় যবে জল আনতে!
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায় দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন্ কটাক্ষে চায় কিছু তো পারি নে জানতে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন যায় যবে জল আনতে!

দুটি বোন তারা করে কানাকানি কী না জানি জল্পনা!
গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি, কী গোপন মন্ত্রণা!
আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহা-পানে,
কাহারো মনের কোনো কথা তারা করেছে কি কল্পনা?
দুটি বোন তারা করে কানাকানি কী না জানি জল্পনা!

এইখানে এসে ঘট হতে কেন জল উঠে উচ্ছলি?
চপল চক্ষে তরল তারকা কেন উঠে উজ্জ্বলি?
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনোমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয় দুলে উঠে চঞ্চলি।
এইখানে এসে ঘট হতে জল কেন উঠে উচ্ছলি?

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন যায় যবে জল আনতে!
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের পড়েছে চোখের প্রান্তে?
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায়?
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন যায় যবে জল আনতে!

শিলাইদহ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা, মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশানকোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।

কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

৪ আষাঢ় [১৩০৭]

শেষ

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু!
সেই আনন্দে যাও রে চলে কালের পিছু-পিছু।
অধিক দিন তো বইতে হয় না শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি গায় না একই গান।
মালা বটে শুকিয়ে মরে— যে জন মালা পরে
সেও তো নয় অমর, তবে দুঃখ কিসের তরে?
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু!
সেই আনন্দে যাও রে চলে কালের পিছু-পিছু।

সবই হেথায় একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে থাকে গানের রেশ।
কাটলে বেলা সাধের খেলা সমাপ্ত হয় ব'লে
ভাবনাটি তার মধুর থাকে আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই রঙটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎসন্ধ্যামেঘে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু-
সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে কালের পিছু-পিছু।

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি, পাছে ঝ'রেই পড়ে।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি, পাছে যায় সে স'রে।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে, চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে অধর ধেয়ে যায়।

সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই, বক্ষোদোলায় দোলে—
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায় মত্ত আকুল রোলে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু—
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে কালের পিছু-পিছু।

কোনো জিনিস চিনব যে রে প্রথম থেকে শেষ,
নেব যে সব বুঝে-প'ড়ে— নাই সে সময়-লেশ।
জগৎটা যে জীর্ণ মায়া সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দু'দিন ভালোবাসবার মতো,
কাজের জন্যে জীবন হলে দীর্ঘজীবন হত।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু—
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে কালের পিছু-পিছু।

আজ তোমাদের যেমন জানছি তেমনি জানতে জানতে
ফুরায় যেন সকল জানা— যাই জীবনের প্রান্তে।
এই-যে নেশা লাগল চোখে এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার বাকি না রয় মোটে।
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে যায় যদি যাক্ খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙে যায় মিথ্যে মায়াগুলি।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু—
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে কালের পিছু-পিছু।

* ১৩০৭

আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে আজি নবঘনবিপুলমন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে সে গান তোমার করো সায়,
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ—
কোথা চম্পক-আভরণ!

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে তব নিশ্বাসপরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায় সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার—
এ নহে তোমার উপহার।

কে জানিত সেই ক্ষণিকামুরতি দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ! তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসরঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য-বিরচন—
একি রূপে দিলে দরশন।

ক্ষমা করো তবে, ক্ষমা করো মোর আয়োজনহীন পরমাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

আসো নাই তুমি নবফাল্গুনে ছিনু যবে তব ভরসায়—
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে, এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজাবে সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়।

১০ আষাঢ় [১৩০৭]

প্রাণ

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে— সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

১৩০৮

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা-বর্ণ-গন্ধ-ময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

* ১৩০৮

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ!
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ,
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

* বৈশাখ ১৩০৮

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা— নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

* বৈশাখ ১৩০৮

আত্মনিবেদন

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য—মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—করো আশীর্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিতমনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

* ১৩০৮

নীড় ও আকাশ

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

* ১৩০৮

নিবেদন

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর! বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিতমুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো,
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

* ১৩০৮

মরীচিকা

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না—
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে চাহে যেন বাঁশি মম উতলা-পাগল-সম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

* ১৩১০

কবিচরিত

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া—
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে—
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া— আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।

নর-অরণ্যে মর্মরতান তুলি
যৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্তগুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ কিরণে ঢাকি থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি—
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

* জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

চিরায়ত

আজ মনে হয়, সকলেরই মাঝে তোমারেই ভালোবেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারি দিক-পানে কী যে জেগে ওঠে প্রাণে!
তোমার আমার অসীম মিলন যেন গো সকলখানে।

কত যুগ এই আকাশে যাপিনু সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি এই অকথিত বাণী
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে ,জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি!

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস সুখের দুখের কাহিনী—
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা দুজনে এসেছি খেলিয়া।

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণকিরণকণিকা গাঁথ নি কি মোর জীবনে?
সে প্রভাতে কোন্ খানে জেগেছিনু কেবা জানে!
কী মুরতি-মাঝে ফুটালে আমারে সেদিন লুকায়ে প্রাণে!
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া—
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, রবে চিরদিন ধরিয়া।

১৩১০

শুক্লসন্ধ্যা

শূন্য ছিল মন,
নানা-কোলাহলে-ঢাকা
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা-জনতায়-ফাঁকা
কর্মে-অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুরবিহীন   নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণরেখা
কী লিখিল শেষ লেখা   দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা   তাও ছিনু ভুলি।   আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো   কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্লসন্ধ্যা এল ভেসে   আঁধারের স্রোতে!
বুঝি সে আপনি মেশে   আপন আলোতে।   এল কোথা হতে!

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে   তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই,
সে শুধু আমারি ঠাঁই   এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়ালো তাই   মোর মুখে রাখি   অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে   শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে   নিকুঞ্জবিতানে—
কার কথা হেনকালে   কহি গেল কানে   শুনেছি পুরাণে।

জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া   এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর   ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন্ উৎসুকের   মিলনকৌতুকে   এল মোর বুকে!

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে   সর্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির   কথাটি না কয়ে।
কোন্ পদ্মবনানীর   কোমলতা লয়ে   পশিল হৃদয়ে!

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম   আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম   লিপি যার লেখা।
এই শুধু বুঝিলাম   না পাইলে দেখা   রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী   এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন   এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ   করিছে বহন   ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন, হে সৌম্যসুন্দর,
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে কী দিব উত্তর!
অশ্রু আসে দু নয়নে, নির্বাক্ অন্তর হে সৌম্যসুন্দর!

* আশ্বিন ১৩০৯

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
ওই শোনা যায় বেণুবনছায় কংকণঝঙ্কারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ— দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দিঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরোথরো পাতা-মরোমরো ছায়া-সুশীতল বাটে?
বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ—
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ— এ বেলা কেমনে কাটে?
আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে?

ওগো, কী আমি কহিব আর!
ভাবিস্ নে কেহ ভয় করি আমি ভরা কলসের ভার।
যা হোক তা হোক এই ভালোবাসি—
বহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি, কত দিন কতবার।
ওগো, আমি কী কহিব আর!

এ কি শুধু জল নিয়ে আসা?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে কী কব, কী আছে ভাষা!
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে কত কাঁদা, কত হাসা!
এ কি শুধু জল নিয়ে আসা!

আমি ডরি নাই ঝড় জল,
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে উদ্দাম অঞ্চল।
বেণুশাখা-'পরে বারি ঝরোঝরে,
এ কূলে ও কূলে কালো ছায়া পড়ে, পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড় জল।

আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব নির্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লির সাথে ঝমকে ঝমকে চরণে ভূষণ বাজে
আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে।

যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা,
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে অকারণ আকুলতা,
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলোছলি জলভরা কলকথা—
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো, দিনে কতবার ক'রে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি ওই পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোতকূজনকরুণ আকাশে উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো, দিনে কতবার ক'রে।

আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারা দিন কে বসিয়া থাকে নীল আকাশের কোলে।
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,
কালো লহরীর মাথায় মাথায় চঞ্চল আলো দোলে—
আমি বাহির হইব ব'লে।

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে ঘর ছেড়ে যেতে নারি।
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।

ভাদ্র ১৩১২

শুভক্ষণ

ওগো মা,

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে!
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরনের বাস।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক্ নয়নে মুখপানে কেন চাস?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ-লাগি না করিয়া বেশ রহিব বলো কী মতে!

২

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে—
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার 'পরে।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক্ নয়নে চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ, ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে!

শান্তিনিকেতন
১৩ শ্রাবণ ১৩১২

প্রভাতে

এক রজনীর বরষনে শুধু কেমন ক'রে
আমার ঘরের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই ঘন নীল জল করে থই থই;
কূল কোথা এর, তল মেলে কই কহো গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখো উঠেছে ভরে।

কাল রজনীতে কে জানিত মনে এমন হবে
ঝরোঝরো বারি তিমিরনিশীথে ঝরিল যবে—
ভরা শ্রাবণের নিশি দুপহরে শুনেছিনু শুয়ে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে কাতর রবে।
তখন সে রাতে কে জানিত মনে এমন হবে!

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু -সলিল-মাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেতশতদল আলোকপুলকে করে ঢলোঢল্,
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্ এমন সাজে
আমার অতল অশ্রুসাগর -সলিল-মাঝে!

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে ইহারে দেখি—
দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন হেরিনু এ কি!
ইহারই লাগিয়া হৃদ্‌বিদারণ— এত ক্রন্দন, এত জাগরণ—
ছুটেছিল ঝড় ইহারই বদন বক্ষে লেখি!
দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন হেরিনু এ কি!

১৪ শ্রাবণ ১৩১২

অবারিত

ওগো, তোরা বল্ তো এরে ঘর বলি কোন্ মতে।
এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে আনাগোনার পথে!
আসতে যেতে বাঁধে তরী আমারি এই ঘাটে,
যে খুশি সেই আসে— আমার এই ভাবে দিন কাটে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে হায় রে—
কী কাজ নিয়ে আছি, আমার
বেলা বহে যায় যে, আমার বেলা বহে যায় রে।

পায়ের শব্দ বাজে তাদের, রজনীদিন বাজে।
ওগো, মিথ্যে তাদের ডেকে বলি, 'তোদের চিনি না যে।'
কাউকে চেনে পরশ আমার, কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত, কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে হায় রে—
ডেকে বলি, 'আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয় রে, তোরা যার খুশি সেই আয় রে।'

সকাল-বেলায় শঙ্খ বাজে পুবের দেবালয়ে।
ওগো, স্নানের পরে আসে তারা ফুলের সাজি লয়ে।
মুখে তাদের আলো পড়ে তরুণ আলোখানি।
অরুণ পায়ের ধুলোটুকু বাতাস লহে টানি।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে হায় রে—
ডেকে বলি, 'আমার বনে
তুলিবি ফুল আয় রে, তোরা তুলিবি ফুল আয় রে।'

দুপুর-বেলা ঘণ্টা বাজে রাজার সিংহদ্বারে।
ওগো, কী কাজ ফেলে আসে তারা এই বেড়াটির ধারে!
মলিনবরন মালাখানি শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের ক্লান্ত বাঁশি বাজে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে হায় রে—
ডেকে বলি, 'এই ছায়াতে
কাটাবি দিন আয় রে, তোরা কাটাবি দিন আয় রে।'

রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে গহন বনমাঝে।
ওগো, ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর কার সে আঘাত বাজে!
যায় না চেনা মুখখানি তার, কয় না কোনো কথা,
ঢাকে তারে আকাশ-ভরা উদাস নীরবতা।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে হায় রে—
চেয়ে থাকি সে মুখ-পানে,
রাত্রি বহে যায়, নীরবে রাত্রি বহে যায় রে।

শান্তিনিকেতন
১৫ পৌষ ১৩১২

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই সে সুর কোথায় পাব।

যেমন সহজ ভোরের জাগা, স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির, মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা আষাঢ়-অন্ধকারে—
খুঁজে মরি তেমনি সহজ তেমনি ভরপুর
তেমনিতরো অর্থ-ছোটা আপনি-ফোটা সুর,
তেমনিতরো নিত্য নবীন অফুরন্ত প্রাণ—
বহু কালের পুরানো সেই সবার-জানা গান।

আমার যে এই নূতন-গড়া নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায় সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারি দিকের সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কী যে বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে হয় না সুরের মিল।

শিলাইদহ
২৪ মাঘ ১৩১২

পথের শেষ

পথের নেশা আমায় লেগেছিল, পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য তখন পূর্বগগনমূলে,
নৌকা তখন বাঁধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শুকায় নিকো ফুলে, শিবালয়ে উঠল বেজে শাঁখ।
পথের নেশা তখন লেগেছিল, পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা ঘর-ছাড়া ওই নানা দেশের পথ—
প্রভাত-কালে অপার-পানে চেয়ে
কী মোহগান উঠতেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে বহু দূরের অরণ্য পর্বত।
নানা-দিনের-নানা-পথিক-চলা ঘর-ছাড়া ওই নানা দেশের পথ।

ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি ছুটে চলে এলেম পথের 'পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে।
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে বাহির হয়ে এলেম পথের 'পরে।

বেলা এখন অনেক হয়ে গেছে, পেরিয়ে চলে এলেম বহু দূর।
ভেবেছিলেম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখতে পাব কাকে, শুনতে যেন পাব নূতন সুর।
তার পরে তো অনেক বেলা হল, পেরিয়ে চলে এলেম বহু দূর।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ, ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল-মনে যাচি তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি, ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

শান্তিনিকেতন
১৪ চৈত্র ১৩১২

কোকিল

আজ বিকালে কোকিল ডাকে, শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন তিন-শো বছর আগে।
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ অশ্রুজলের ছায়া।—

পল্লীখানি প্রাণে ভরা, গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে হাসির কলতান।
সন্ধ্যাবেলায় ছাদের 'পরে দখিন-হাওয়া বহে,
তারার আলোয় কারা ব'সে পুরাণ-কথা কহে।
ফুল-বাগানের বেড়া হতে হেনার গন্ধ ভাসে,
কদম-শাখার আড়াল থেকে চাঁদটি উঠে আসে।
বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুল-বনে কোকিল কোথা ডাকে।

তিন-শো বছর কোথায় গেল, তবু বুঝি নাকো
আজও কেন, ওরে কোকিল, তেমনি সুরেই ডাকো।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে, ফেটেছে সেই ছাদ—
রূপকথা আজ কাহার মুখে শুনবে সাঁঝের চাঁদ?
শহর থেকে ঘণ্টা বাজে, সময় নাই রে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতায়!
আর কি, বধূ, গাঁথো মালা, চোখে কাজল আঁকো?
পুরানো সেই দিনের সুরে কোকিল কেন ডাকো?

শান্তিনিকেতন
২৯ বৈশাখ [১৩১৩]

গান শোনা

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি শোনাই কখন বলো!
ভরা চোখের মতো যখন নদী করবে ছলোছলো,
ঘনিয়ে যখন আসবে মেঘের ভার বহুকালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার নামবে তোমার ঘরে,
যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে তবুও বেলা আছে,
সাথি তোমার আসত যারা রাতে আসে নি কেউ কাছে,
তখন আমায় মনে পড়ে যদি, গাইতে যদি বলো—
নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী করবে ছলোছলো।

ম্লান' আলোয় দখিন-বাতায়নে বসবে তুমি একা—
আমি গাব ব'সে ঘরের কোণে, যাবে না মুখ দেখা।
ফুরাবে দিন, আঁধার ঘন হবে, বৃষ্টি হবে শুরু,
উঠবে বেজে মৃদুগভীর রবে মেঘের গুরুগুরু।
ভিজে পাতার গন্ধ আসবে ঘরে, ভিজে মাটির বাস,
মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে বনের নিশ্বাস।
বাদল-সাঁঝে আঁধার বাতায়নে বসবে তুমি একা—
আমি গেয়ে যাব আপন-মনে, যাবে না মুখ দেখা।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে, বাড়বে অন্ধকার,
নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেঘে ভেদ রবে না আর।
কাঁসর ঘণ্টা দূরে দেউল হতে জলের শব্দে মিশে
আঁধার পথে ঝোড়ো হাওয়ার স্রোতে ফিরবে দিশে দিশে।
শিরীষ-ফুলের গন্ধ থেকে থেকে আসবে জলের ছাঁটে,
উচ্চরবে পাইক যাবে হেঁকে গ্রামের শূন্য বাটে।

জলের ধারা ঝরবে বাঁশের বনে, বাড়বে অন্ধকার—
গানের সাথে বাদলা রাতের সনে ভেদ রবে না আর।

ও ঘর হতে যবে প্রদীপ জেবলে আনবে আচম্বিত,
সেতারখানি মাটির 'পরে ফেলে থামাব মোর গীত।
হঠাৎ যদি মুখ ফিরিয়ে তবে চাহ আমার পানে
এক নিমিষে হয়তো বুঝে লবে কী আছে মোর গানে।
নামায়ে মুখ নয়ন ক'রে নিচু বাহির হয়ে যাব,
একলা ঘরে যদি কোনো-কিছু আপন-মনে ভাবো।
থামায়ে গান আমি চলে গেলে যদি আচম্বিত
বাদল-রাতে আঁধারে চোখ মেলে শোন আমার গীত।

শান্তিনিকেতন
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

বর্ষাপ্রভাত

ওগো, এমন সোনার মায়াখানি কে যে গড়েছে!
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
গাছে-পালায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাস রাগে কী গান ধরেছে!

আজ বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে কোন্ সে ভিখারি
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল দু হাত বিথারি—
আঁচল ভ'রে সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিতে,
লুটিয়ে গেল পৃথিবীতে, একি নেহারি!

ওগো, পারিজাতের কুঞ্জবনে স্বর্গপুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল মধু-চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভারে,
সোনার মধু লক্ষ ধারে লাগে ঝুরিতে।

আজ সকাল হতেই খবর এল— লক্ষ্মী একেলা
অরুণ-রাগে পাতবে আসন প্রভাতবেলা।

শুনে দিগ্‌বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়-মধুপ জুটে করেছে মেলা।

ও কি সুরপুরীর পর্দাখানি নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন জানালা-মূলে!
কে জানে গো কী উল্লাসে
হেরেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে পড়েছে দুলে।

ওগো, কাহারে আজ জানাই আমি, কী আছে ভাষা—
আকাশ-পানে চেয়ে আমার মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই-নে-কিছু'র স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে সকল পিপাসা।

শান্তিনিকেতন
৭ আষাঢ় ১৩১৩

সব পেয়েছি'র দেশ

সব-পেয়েছি'র দেশে কারো নাই রে কোঠাবাড়ি—
দুয়ার খোলা পড়ে আছে, কোথায় গেল দ্বারী!
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়, হস্তীশালায় হাতি!
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে।
দেউলে নেই সোনার চূড়া সব-পেয়েছি'র দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা পাশ দিয়ে তার চলে।
কুটিরেতে বেড়ার 'পরে দোলে ঝুম্‌কো-লতা,
সকাল হতে মৌমাছিদের ব্যস্ত ব্যাকুলতা।
ভোরের বেলা পথিকেরা কী কাজে যায় হেসে,
সাঁঝে ফেরে বিনা-বেতন সব-পেয়েছি'র দেশে।

আঙিনাতে দুপুর-বেলা   মৃদু করুণ গেয়ে
বকুল-তলার ছায়ায় বসে   চরকা কাটে মেয়ে।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে   নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি   হঠাৎ আসে প্রাণে!
নীল আকাশের হৃদয়খানি   সবুজ বনে মেশে—
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়   সব-পেয়েছি'র দেশে!

সদাগরের নৌকা যত   চলে নদীর 'পরে,
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ   কেনা-বেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা   কাঁপিয়ে চলে পথ,
হেথায় কভু নাহি থামে   মহারাজের রথ।
এক রজনীর তরে হেথা   দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই   সব-পেয়েছি'র দেশে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,   নাইকো হাটে গোল—
ওরে কবি, এইখানে তোর   কুটিরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্ রে পথের ধুলো,   নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা—   রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস্ রে হেথায়   সারা দিনের শেষে
তারায়-ভরা আকাশ-তলে   সব-পেয়েছি'র দেশে।

৯ আষাঢ় ১৩১৩

বেলাশেষে

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া—
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কি না, কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।

১৩ ভাদ্র ১৩১৬

এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন।
এই-যে মধুর আলস-ভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ—
এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ।

প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

আগমনী

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত আপন-মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে তারই চরণ বাজে বুকে,

সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।

কলিকাতা
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

মাতৃ-অভিষেক

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্ত শিখা।
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে— আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এসো হে আর্য এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

প্রণতি

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে তো চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি;
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে

সব-হারাদের মাঝে।
ধনেমানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথা আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

১৯ আষাঢ় ১৩১৭

মনের মাঝে

স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে, আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া উঠেছে ঐ বিজন পুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

দিনের শেষে মলিন আলোয় কোন্ নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি উড়েছে সেই পারের পানে।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে উদাস ধ্বনি উধাও আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে তান তুলেছে কোন্ নূপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

নিচল জলে নীল নিকষে সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,
পারাপারের সময় গেল খেয়াতরীর নাইকো দেখা।
পশ্চিমে ঐ সৌধছাদে স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি বেদন-ভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

সারাটা দিন দিনের কাজে হয় নি কিছুই দেখাশোনা,
কেবল মাথার বোঝা ব'হে হাটের মাঝে আনাগোনা।
এখন আমায় কে দেয় আনি কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি,
সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

শিলাইদহ
১৫ চৈত্র ১৩১৮

প্রত্যাশা

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।

শান্তিনিকেতন
১৫ পৌষ ১৩২০

ফুল

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখো ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

ওরা আমার হৃদয়-পানে মুখ তুলে যে থাকে।
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে, ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মুখে তবু
প্রভু, তোমার মুখের সোহাগ-বাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

প্রাতের পরে প্রাতে ওরা রাতের পরে রাতে
তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে—
তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়াটি ওদের মুখে আছে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩২১

গান

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।

* বৈশাখ ১৩২৬

২

তোমায় নতুন ক'রেই পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন!
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন!
ওগো তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের—
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন
ও মোর ভালোবাসার ধন!
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপ্‌নাকে যে—
ওই হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন
ও মোর ভালোবাসার ধন!

সুরুল
২০ ফাল্গুন ১৩২১। রাত্রি

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া!
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।

* বৈশাখ ১৩২৬

৪

আমার ঢালা গানের ধারা সেই তো তুমি পিয়েছিলে,
আমার গাঁথা স্বপনমালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে।
মন যবে মোর দূরে দূরে ফিরেছিল আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে আভাস দিয়ে গিয়েছিলে।
যবে বিদায় নিয়ে যাব চলে মিলন-পালা সাঙ্গ হলে
শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে এই কথাটি রইবে লেগে—
এই শ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

৫

ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে পরান খুলে।
দেখব কেমন রয় সে ভুলে।
সে ডাক বেড়াক বনে বনে,
সে ডাক শুধাক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে
ফিরুক দুলে।
সাঁঝ-সকালে রাত্রিবেলায়
ক্ষণে ক্ষণে

একলা বসে ডাক দেখি তায়
মনে মনে।
নয়ন তোরই ডাকুক তারে,
শ্রবণ রহুক পথের ধারে,
থাক্‌-না সে ডাক গলায় গাঁথা
মালার ফুলে।

* ফাল্গুন ১৩৩১

৬

তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে।
তোমার পরশ আমার মাঝে
সুরে সুরে বুকে বাজে,
সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ
বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে।
ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো
দুই আমারে লাগল ভালো,
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি
তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে।

* অগ্রহায়ণ ১৩৩২

৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের সুরটি মেলাতে।
আকাশে ওই অরুণ রাগে মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার মায়ার খেলাতে।
নীলিমা এই নিলীন হল আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল মনের কামনায়।
লোকান্তরের ও পার হতে কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই মেঘের ভেলাতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ বৈশাখ ১৩১৯

৮

কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরোথরো কাঁপে তোমার গানে।
আজিকে এই প্রভাতবেলা মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরোভরো চাহি তোমার পানে।
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী যে— তোমার চোখের চাহনি যে
সুনীল সুধা ঝরোঝরো ঝরে আমার প্রাণে।

* পৌষ ১৩২৯

৯

আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্ব-ভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

* আশ্বিন ১৩৩১

১০

গানের ঝর্নাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার-বরন সুরের ধারা ঢেলে।
যে সুর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে,
কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে।
যে সুর উষার বাণী বয়ে আকাশে যায় ভেসে,
রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।
যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভ'রে দেয় আপনায় উজাড় ক'রে,
যায় চলে যায় চৈত্রদিনের মধুর খেলা খেলে।

* পৌষ ১৩৩১

১১

কত কথা তারে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে।
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পুরবীরাগে কত ললিতে।
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুমবনে, সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

১২

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারা দিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

* আশ্বিন ১৩১৮

১৩

যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলোমল্ টলোমল্।
শরমরক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারই গন্ধকেশরমাঝে
এক বিন্দু নয়নজল।
ধীরে বও, ধীরে বও, সমীরণ,
সবেদন পরশন।
শঙ্কিত চিত্ত মোর পাছে ভাঙে বৃন্তডোর
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখি করে ছলোছল্।

* আশ্বিন ১৩৩২

১৪

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক'রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে,
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে প্রিয় হে প্রিয়!
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো।

শান্তিনিকেতন
১৩ পৌষ ১৩২১

১৫

আমার দোসর যে জন ওগো তারে কে জানে।
একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে কে জানে!
আমার নদীর যে ঢেউ ওগো জানে কি কেউ
যায় বহে যায় কাহার পানে! কে জানে!
যখন বকুল ঝ'রে আমার কাননতল যায় গো ভ'রে
তখন কে আসে-যায় সেই বনছায়ায়,
কে সাজি তার ভরে আনে! কে জানে!

শান্তিনিকেতন
শরৎ ১৩২৮

১৬

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে।
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল-হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

প্রণতি।

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি!
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

অহঙ্কার ত পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে —
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
ঐশ্বর্য্যে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথা আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে
দেখবি কেমন রয় সে ভুলে।
সে ডাক বেড়াক বনে বনে,
সে ডাক শুনুক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে
ফিরুক দুলি।

সাঁঝ সকালে রাত্রিবেলায়
ঝড়ে ঝড়ে
একলা বসে ডাক দেখি তায়
মনে মনে।
যখন তোমার ডাকুক তারি,
শ্রবণ রহুক পথেই ধরে,
থাকনা সে ডাক গলায় গাঁথা
মালার ফুলে॥

—

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায়
সারাবেলা গেল খেলে।
গাইল কি গান সেই তা জানে
সুর বাজে তার আমার প্রাণে;
বলো দেখি তোমরা কি তার
কথার কিছু আভাস পেলে।
আমি তারে শুধাই যবে
"কি তোমারে দিব আনি"
সে শুধু কয় "আর কিছু নয়,
তোমার গলার মালাখানি।"
দিই যদি তো কি দাম দেবে
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে,
ফিরে এসে দেখি, ধুলায়
বাঁশিটি তার গেছে ফেলে॥

— ১ —

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলোক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে।

বাদল প্রাতের উদাস পাখী
উঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে
পিছু ডাকে।

ভরা নদী ছায়ার তলে
ছুটে চলে
খোঁজে কাকে পিছু ডাকে।

আমার প্রাণের ভিতর সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের উতলাকে
পিছু ডাকে॥

১৭

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া!
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া।
অনেক দিনের বিদায়বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি—
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া!
কোন্ ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুল-তলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া।

শান্তিনিকেতন
শরৎ ১৩২৮

১৮

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে।
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে।
যখন শরৎ কাঁপে শিউলিফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।
গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-ঘুমে আধো-জাগায়,
আমার স্বপন-মাঝে দেয় যে কী দোল দুলায়ে।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

১৯

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে,
সংগোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে।
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে।
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে—
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলন-ক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে,

স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে।

* চৈত্র ১৩৩০

২০

যদি হল যাবার ক্ষণ তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন।
বারে বারে যেথায় আপন গানে স্বপন ভাসাই দূরের পানে,
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন— সে মোর শূন্য বাতায়ন।
বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা!
ওরই ডালে আর-শ্রাবণের পাখি স্মরণখানি আনবে না কি,
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—
আমাদের বিরহ মিলন।

* আশ্বিন ১৩৩২

২১

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি। আমার মন কয় 'চিনি চিনি'।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে মাধবীবিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে, কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি।
পারুল শুধাইল, 'কে তুমি গো অজানা কাননের মায়ামৃগ?'
কামিনী ফুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে, ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি।

* আষাঢ় ১৩৩৩

২২

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটের বটের ছায়ায়
সারা বেলা গেল খেলে।
গাইল কী গান সেই তা জানে—
সুর বাজে তার আমার প্রাণে,
বলো দেখি তোমরা কি তার
কথার কিছু আভাস পেলে।
আমি তারে শুধাই যবে
'কী তোমারে দিব আনি'
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়,
তোমার গলার মালাখানি।'

দিই যদি তো কী দাম দেবে
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে,
ফিরে এসে দেখি, ধূলায়
বাঁশিটি তার গেছে ফেলে।

* জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

২৩

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি।
তখনো কুহেলীজালে,
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলোছলি।
এখনো বনের গান বন্ধু, হয় নি তো অবসান—
তবু এখনি যাবে কি চলি!
ও মোর করুণ বল্লিকা,
ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরোঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা দিস বলি।

ফাল্গুন ১৩৩৭

২৪

কেন রে এতই যাবার ত্বরা—
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা?
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবই, বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী—
নিল কি বিদায় শিথিল করবী বৃন্তঝরা!
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে?
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল কপোতকূজনে হল যে আকুল,
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল বসুন্ধরা।

১৮ চৈত্র ১৩৩২

২৫

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল, নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে।

নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরই নবোচ্ছ্বাসে ফাগুন-মাসে বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে।
মাতবে দখিন-বায় মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়, চঞ্চলিত এলো কেশে।

* ভাদ্র ১৩৪০

২৬

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী-'পরে,
এ পারে কৃষি হল সারা, যাব ও পারের ঘাটে।
হংসবলাকা উড়ে যায় দূরের তীরে, তারার আলোয়,
তারই ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে।
ভাঁটার নদী ধায় সাগর-পানে কলতানে,
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারই টানে।
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে।

* ভাদ্র ১৩৪৬

২৭

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থরনবনীলনীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে।

* ভাদ্র ১৩৩৮

২৮

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে।
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে, বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে।
বাঁধন-হারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে ব'লে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে।

২ আষাঢ় ১৩২৯

২৯

পূব-সাগরের পার হতে কোন্‌ এল পরবাসী—
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
সহসা তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী।
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরুগুরু ডমরু-রব হয়েছে ওই শুরু।
তাই শুনে আজ গগন-তলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরন নাগ-নাগিনী ছুটেছে উদাসী।

১ আষাঢ় ১৩২৯

৩০

বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্‌ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে।
যে মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে।
সে দিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

৩১

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝরো ঝরো ঝরো-ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর-টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

৩২

কদম্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছায়া খেলে,
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে।

বরষনের পরশনে শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন যে আমার সুদূর-পানে পাখা মেলে।
আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,
পুব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে।
ঝিল্লিমুখর বাদল-সাঁঝে কে দেখা দেয় হৃদয়-মাঝে
স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে।

* ভাদ্র ১৩৩০

৩৩

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনি চিনি—
ঘন বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার-ঘোমটা-পরা।
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তা জানে!
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা।

* অগ্রহায়ণ ১৩৩০

৩৪

গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে! কেন গো মিছে জাগাবে ওরে!
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে।
নাহয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে মনের কথা শয়নদ্বারে।
নাহয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে নীরবে এসে,
নাহয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।

* শ্রাবণ ১৩৩২

৩৫

আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা এসো হে গোপনে
আমার স্বপন-লোকে দিশাহারা।
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন দাও ঢেকে মোর পরানমন—
আমি চাই নে তপন, চাই নে তারা।
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে নিয়ো গো, নিয়ো গো
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ করে।
একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে—
দিয়ো গো, দিয়ো গো
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

শান্তিনিকেতন
আশ্বিন ১৩২২

৩৬

আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
বাদল প্রাতের উদাস পাখি
ওঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে,
পিছু ডাকে।
ভরা নদী ছায়ার তলে
ছুটে চলে—
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের উতলাকে
পিছু ডাকে।

ভাদ্র ১৩৩০

৩৭

হৃদয়ে ছিলে জেগে, দেখি আজ শরৎমেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল সরে
তোমার ওই আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে।
কী-যে গান গাহিতে চাই, বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ওই শিউলিদলে ছড়ালো কানন-তলে,
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে।

৮ আশ্বিন ১৩২৮

৩৮

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে!
ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে, ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয়কুঞ্জবনে মুঞ্জরিল মধুর শেফালিকা।

ভাদ্র ১৩৩২

৩৯

আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে, নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।
আমার মনের ভাবনাগুলি বাহির হল পাখা তুলি,
ওই কমলের পথে তাদের সেই জুটালে।

শরৎবাণীর বীণা বাজে কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্মরানির ঢেউ উঠালে।

১৬ ফাল্গুন ১৩৩৩

৪০

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা দুখের সুরে বরণ-মালা
গাঁথি মনে মনে শূন্যক্ষণে।
দিনের কোলাহলে ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়-তলে—
রাতের তারা উঠবে যবে সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে মনে মনে।

শান্তিনিকেতন
৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮

৪১

এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে। এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে।
করো ত্বরা, করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা—
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে।
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে।

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮

৪২

নীল আকাশের কোণে কোণে
ঐ বুঝি আজ শিহর লাগে। আহা!
শাল পিয়ালের বনে বনে
কেমন যেন কাঁপন জাগে। আহা!
সুদূরে কার পায়ের ধ্বনি
গণি গণি দিনরজনী
ধরণী তার চরণ মাগে। আহা!

দখিন হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
কেন ডাকিস 'জাগো জাগো'।
ফিরিস মেতে শিরীষবনে—
শোনাস কানে কোন্ কথা গো।
শূন্যে তোমার ওগো প্রিয়,
উত্তরীয় উড়ল কি ও
রবির আলোর রঙিন রাগে। আহা!

* বৈশাখ ১৩২৯

৪৩

আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে?
সুরে সুরে খুঁজি তারে
অন্ধকারে,
আমার যে আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে।
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে!
যখন শুষ্ক প্রহর বৃথা কাটাই
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় দুঃখসুখের তলায়
সুর যে পলায়
আমার যে শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে।
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে!

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

৪৪

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।
বুঝি সময় হল এবার
আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার—
পূর্ণিমাচাঁদ, তুমি এলে।
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে
যাক সে নিবে, যাক সে নিবে—
যা আছে সব দিক সে ঢেলে।

২০ ফাল্গুন ১৩২৮

৪৫

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে।
বাণী তার বুঝি না রে ভরে মন বেদনাতে।
উদয়শৈলমূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে।
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপন-কায়া,
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখচরণপাতে।

১৫ ফাল্গুন ১৩২৮

৪৬

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন দাও তুলে মোর হাতে।
সুরখানি ওই নিয়ে কানে পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্ররাতের মলিন মালা রইবে আমার সাথে।
পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে—
পথ আমারে ডাক দিয়েছে, এখন যাব চলে।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে আমার বেদন গেলেম রেখে,
কোন্ ফাগুনে মিলবে সে-যে তোমার বেদনাতে।

শান্তিনিকেতন
১৯ বৈশাখ ১৩২৯

৪৭

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই!
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই!
দূরে পশ্চিমে ওই দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই!
সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ওই-যে!
সন্ধ্যাহাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ওই-যে!
তোর হঠাৎ-খসা প্রাণের মালা ভরল আমার শূন্য ডালা—
মরণ-পথের সাথি আমায় করলি রে কে তুই।

২ পৌষ ১৩৩০

তাজমহল।

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা,
চিরন্তন হয়ে থাক্‌ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্‌,
শুধু থাক্‌
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই!
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।

শা-জাহান

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা,
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়,
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হৈমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই, নাই, নাই যে সময়।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—
ভাষার অতীত তীরে

কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি-'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান;
যমুনাকল্লোল-সাথে নহবত মিলায় না তান;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

মিথ্যা কথা—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির-অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;

ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজসিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে;
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—

'যত দূর চাই
নাই, নাই, সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

এলাহাবাদ
রাত্রি। ১৪ কার্তিক ১৩২১

তাজমহল

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ?
তাঁই দেবলোক-পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ!

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে রাজবিরহী
বিরহের রত্নখানি;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।

নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক।
আকাশ তাহার 'পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ।

সম্রাট্‌মহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব. পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।
সম্রাটের মন
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণসুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

এলাহাবাদ
৫ পৌষ ১৩২১
প্রভাতে

দুই নারী

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর;
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

পদ্মাতীর
মাঘ ১৩২১

এবার

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে—
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা
২০ মাঘ ১৩২১

আবার

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই-যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরন হৃদয়-ব্যথার মতো;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মরকল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুন-দিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।
সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অংকুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে—অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম—মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম—আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্‌ পার হতে কোন্‌ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

শ্রীনগর
কার্তিক ১৩২২

মানসী

আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির ছলোছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ রৌদ্রে ঝলোমল—
এমনি নিবিড় ক'রে এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে,
তাই তো আমি জানি বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর-জলে কমল টলোমল।
তাই তো আমি জানি আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান, আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জ্বলোজ্বল।

শ্রীনগর। ৭ কার্তিক ১৩২২

ঝড়ের খেয়া

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।'
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'

বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন-মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ।'

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার—
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।

হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত,
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ. প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি

সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়,
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
'তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্‌।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কলিকাতা
২৩ কার্তিক ১৩২২

অপমানিত

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান?
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোরবেলা;
ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হতে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে!
ক্ষুধিতদরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম।
ভেবেছিনু, 'একি দায়
কাজের ব্যাঘাত এ যে!'—দূর হতে করেছি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মতো।
দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি।
গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।

এরই লাগি এসেছিলে হে বন্ধু অজানা—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলই ধারিব,
না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।
তার পরে অর্ধরাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধুলাতে
মনে হবে আমি বড়ো একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,

অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারে-বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারে-বারে-ফিরে-আসা হয়ে।

৮ ফাল্গুন ১৩২২

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানি।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, 'কী হয়েছে বামি?'
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, 'হারিয়ে গেছি আমি!'

তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে—
আমার বামির মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে—'হারিয়ে গেছি আমি!'

* শ্রাবণ ১৩২৫

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক-নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো
শিওরের ঐ জানলা-দুটো—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী।
আমি ছিলেম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠি
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কি হয়েছে বামী?"
সে কেঁদে কয়, নীচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি!"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশপানে চেয়ে,
আমার বামীর মতই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপ-শিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি!"

হারিয়ে যাওয়া। পলাতকা।

তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ—
কত রকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ;
একটুমাত্র অসাবধানেই বিষম কর্মভোগ।
'এইটে ভালো ওইটে মন্দ' যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে—
তাই তো ঘরে পরে
সবাই আমায় বললে, 'লক্ষ্মী সতী!
ভালোমানুষ অতি!'

এ সংসারে এসেছিলেম ন বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ কিম্বা যা-হোক-একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু!
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।

শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি—
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে, সেই চাকাটা ঐ-যে থামল যেন—
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে-বিভোল দক্ষিণবায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল—
হেঁকেছিল 'খোল্ রে দুয়ার খোল্'।
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।

হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
পাড়ায় কোথা শতরঞ্জ-খেলায়।
থাক্‌ সে কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।
বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল, বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে;
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা!
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ঐ-যে অকূল বিরাট মোহানায়
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্‌।
মরণ-বাসর-ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক

দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝারে সে
ঐ-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী—
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি,
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

* বৈশাখ ১৩২৫

কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।
বছর বছর ক'রে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবস-রাত্রি কালো মেয়েটিরে।

সামনে-বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি মেস্‌'এ;
বহুকষ্টে শেষে
কলেজেতে পার হয়েছি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন ক'রে এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে?
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েছি আধ-পেটা।
ভিক্ষা করা সেটা
সইত না একবারে—
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে আধা মাইনেয়, ভর্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে

পাবার আমার ছিল দাবি;
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তি-মাঝে ঢেকে।
আজকে দেখি, নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে, ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায়;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা—
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা!
কোথায় মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী!
একি বাঁধন রাখল আমায় ঘেরি!

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস্ ক'রে।
হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী।
মনে হয় যে, রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা—
ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা:
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথরাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে;
লাজুক ভীরু ঝর্নাখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি;
রাত-জাগা এক পাখি
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি;
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

রাখাল ছেলের সঙ্গে ব'সে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।

আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে;
একলা থাকি মেস্‌'এ।
সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

ঐ-যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী—
যেমনতরো ওর ভাঙা ঐ জানলাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা,
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলস-ভরে,
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী,
তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপন-ভোলা,
চার দিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জানলা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

আষাঢ় ১৩২৫

শেষ অর্ঘ্য

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়
প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে; নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা;

অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা;
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

ফাল্গুন ১৩৩০

পূর্ণতা

স্তব্ধরাতে একদিন নিদ্রাহীন আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে অশ্রুনীরে ধীরে মোর করতল চুমি,—
'তুমি দূরে যাও যদি নিরবধি শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম মরুসম রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশবিস্তীর্ণ ক্লান্তি সব শান্তি চিত্ত হতে করিবে হরণ—
নিরানন্দ নিরালোক স্তব্ধ শোক মরণের অধিক মরণ।'

শুনে, তোর মুখখানি বক্ষে আনি বলেছিনু তোরে কানে কানে,—
'তুই যদি যাস দূরে তোরই সুরে বেদনাবিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য, মোর চিত্ত সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ বিচিত্র খেলা সারা বেলা পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে, প্রিয়ে, দূরে গিয়ে মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে পূর্ণ হবে তোমার চরম অধিকার।'

দুজনের সেই বাণী কানাকানি শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা—
রজনীগন্ধার বনে ক্ষণে ক্ষণে বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে মৃত্যুরূপে মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার—
দেখাশুনা হল সারা, স্পর্শহারা সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে দীপ্তগীতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

হারুনা-মারু জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৪

আশা

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,

ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
প্রাণের গভীর ক্ষুধা পাবে তার শেষ সুধা;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা করেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথাভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা করেছিনু আশা।

আনডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে যতই দেবে বেশি ক'রে
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি আপনি ধরা পড়বে না কি?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি যাই-না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সেও,
সুধায়-ভরা হৃদয় তোমার ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব-তরে চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে—
ভুলতে যদি পারো তবে সেই ভালো গো, যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়—সঙ্গে চলো, আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে ভয় হল যে আমার মনে।
দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে—
তোমায় দেখার স্মৃতি নিয়ে একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর ১৯২৪

ও আমার জুঁই

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই!
অজানা ভাষার দেশে সহসা বলিলি এসে, 'আমারে চেন কি?'
তোর পানে চেয়ে চেয়ে হৃদয় উঠিল গেয়ে, 'চিনি চিনি সখী!'
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
'আমি ভালোবাসি!'

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই!
আজ তাই পড়ে মনে বাদল-সাঁঝের বনে ঝরো ঝরো ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া যেন কী-স্বপনে-পাওয়া ঘুরে ঘুরে সারা!
সজলতিমিরতলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি,
'আমি ভালোবাসি!'

মিলনসুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই
ও আমার জুঁই!
মনে পড়ে কত রাতে দীপ জ্বলে জানালাতে বাতাসে চঞ্চল,
মাধুরী ধরে না প্রাণে— কী বেদনা বক্ষে আনে, চক্ষে আনে জল।
সে রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি,
'আমি ভালোবাসি!'

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই
ও আমার জুঁই!
বক্ষে এনেছিস কার যুগযুগান্তের ভার, ব্যর্থ পথ-চাওয়া,
বারে বারে দ্বারে এসে কোন্ নীরবের দেশে ফিরে ফিরে যাওয়া
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি,
'আমি ভালোবাসি!'

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪

অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা-'পরে
ফিরে যায় দ্বিধাভরে।
আমের মুকুল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে—
ফেরে না সে, শুধু মরে॥

২

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে
ঝংকারে বীণাখানি,
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে
মিলায় ঘোমটা টানি॥

৩

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে॥

৪

চলিতে চলিতে খেলার পুতুল
খেলার বেগের সাথে
একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়,
পড়ে থাকে পশ্চাতে॥

৫

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে-
'বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে'॥

৬

দেবমন্দির-আঙিনাতলে
শিশুরা করেছে মেলা।
দেবতা ভোলেন পূজারী-দলে,
দেখেন শিশুর খেলা॥

৭

নানা রঙের ফুলের মতো
উষা মিলায় যবে
শুভ্র ফলের মতন সূর্য
জাগেন সগৌরবে॥

৮

নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে
শূন্য আকাশমাঝে,
পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায়
বাসা তার মেলে না যে॥

৯

পুঁথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা॥

১০

ভক্তি ভোরের পাখি
রাতের আঁধার শেষ না হতেই
'আলো' ব'লে ওঠে ডাকি॥

১১

যখন পথিক এলেম কুসুমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি দুটি।
চলে যাব যবে, বসন্তসমীরণে
কুসুম উঠিবে ফুটি॥

১২

শিশিরসিক্ত বনমর্মর
ব্যাকুল করিল কেন।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে-কানে-কথা যেন॥

১৩

শুকতারা মনে করে
শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো।
উষা বলে, 'ভালো, সেই ভালো।'

১৪

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে
মল্লিকামুকুল—
'কখন ফুটিবে মোর
অত বড়ো ফুল'॥

১৫

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা
ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে
ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল॥

স্ফুলিঙ্গ

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে।

২

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধুলার 'পর,
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।

৩

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,

আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

৪

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে।

৫

এমন মানুষ আছে
পায়ের ধুলো নিতে এলে
রাখিতে হয় দৃষ্টি মেলে
জুতো সরায় পাছে।

৬

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে।
ভাবিছ ব'সে, সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে!

৭

তব চিত্তগগনের
দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে
পেয়েছে মহিমা।

৮

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই লেখে,
মুছে বারে বারে।

৯

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

১০

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।

১১

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণকপোলতলে
রাতের বিদায়চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে।

১২

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পূরা।

১৩

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাত-রবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান।
ফুল ফুটে বনমাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন
আপনি সে জানে না যে।

১৪

বাতাস শুধায়, 'বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে।'
কমল কহিল, 'আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।'

১৫

বেদনার অশ্রু-ঊর্মিগুলি
গহনের তল হতে
রত্ন আনে তুলি।

১৬

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

১৭

'সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথ-চাওয়া নয়নের বাণী।

১৮

স্মৃতি, সে যে নিশিদিন
বর্তমানেরে নিঃশেষ করি
অতীতের শোধে ঋণ।

১৯

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
'ভালো বেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।'

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ-শাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি?'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উল্লাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চলপ্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি
আসে নি কি?'

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ-শব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
'সে কি আসে?'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষ-গণন হয় না কি মোর সারা!
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
'সে কি এল?'

কলিকাতা
২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো—
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।
বনের মন্দিরমাঝে তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান—

চক্ষে জল ব'হে যায়, নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।

দেবতার বর—
কত জন্ম, কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে লিখিছে আকাশ-পাতে
এ দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে।

বোলো আজি তারে,—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে, জানি, আমার গুণ্ঠনখানি
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য কোরো ক্ষমা।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,

ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়— তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গমপথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব— তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী— তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

সাগরী

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে—
উচ্চহাস্যতরঙ্গ সে হানে
সূর্যচন্দ্র-পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকারপুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর—
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি—
নাম কি সাগরী?

৮ কার্তিক ১৩৩৫

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্তের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গীহীন তরু,
তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়,
চারি দিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারি ধারে—
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।

সে যেন অশোকবনে সীতা,
চারি দিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয়;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্র-পারে,
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
পাঠালো তাহারে!
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল?
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু?
আজও তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
' অধরে রয়েছে তার ম্লান'

—সন্ধ্যার গোলাপ-সম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।
অদৃশ্য যে অশ্রুধারা
আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা
তাহা দিব্য বেদনার করুণানির্ঝরী—
নাম কি ঝামরী?

*কার্তিক ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজও প্রবেশ করো নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা—
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ-বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে,
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জেবলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জবলোজবলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

হাসির পাথেয়

হিমালয়-গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে,
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারে বারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন, বর্ণনাবিহীন।

সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল; মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।
সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ; স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার;
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুকচরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে
আসিয়াছি বহুদূরে; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি—
শৈলশিখরের দূর নির্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে-ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন-বাধায়-কীর্ণ শঙ্কায়-সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে হাসি দেখেছি বসি
শস্যভরা তটচ্ছায়ে, কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তারে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্যদিনে বহি যায় অক্লান্তপ্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া— অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত, অশ্রান্ত, অজেয়।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩৪

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ—কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইন-শাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুন-বরন কিরণ রইত লেগে,
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্বতে পর্বতে—
সামনেতে ঐ কাঁকর-ঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।
মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
একবারও তার হয় নি কামাই কভু।

আজও তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
পাইন-বনের শেষে,
সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝর্নাধারার জলে,
সেই সেকালের মতোই তেমনিধারা
তারার পরে তারা
আলোর মন্ত্র চুপিচুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে;
শুধু আমার কাঁকর-ঢালা পথে
বহুকালের চেনা
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনও বাজবে না!

আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগল আমার মনে—
চলতে চলতে গেলেম অকারণে
ডাকঘরে সেই মাইল-তিনেক দূরে।

দ্বিধা ভরে মিনিট-কুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
ডাকবাবুদের কাছে
শুধাই এসে, 'আমার নামে চিঠিপত্তর আছে?'
জবাব পেলেম, 'কৈ, কিছু তো নেই।'
শুনে তখন নতশিরে আপন-মনেতেই
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসছি যখন শূন্যে আমার ঘরের দিকে ফিরে,
শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে,—
'মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।'
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ-বছর বয়স-কালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকর-ঢালা পথের 'পরে ডাক-পিয়নের পদধ্বনির সুরে।

রম্ফিউস জাহাজ
৬ ভাদ্র ১৩৩৪

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে. নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নবজাগরণী প্রথম যে হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন। ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে বিরাট
ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে—এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে,
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর—
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

শান্তিনিকেতন
১২ আষাঢ় ১৩৩৯

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল—
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ,
ফিকে সবুজের 'পরে ফুল-কাটা সোনালি রঙের।

বিলেতের হাট থেকে এল তার বর—
সেকালের রাজপুত্র, কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালখ;
কাল হবে অধিবাস, পরশু হবে বিয়ে।

সন্ধে হল। পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেক্‌ট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে—
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে, সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।
হানাসান ডেকে বলে,
'চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।'

মণিদিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল, কোথা গেল!
বট গাছে আঙিনার পারে বাসা করে আছে ব্যাঙগমা;
সে বলে, 'আমি তো জানি চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।'
মণি বলে, 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো— ফিরিয়ে আনি গে।'

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা;
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধরে।
ভোর হল; এল চিত্রকূটগিরি,
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, 'হানাসান, কোথা হানাসান—
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে!'

নীল মেঘ বলে এসে,
'মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে!'
মণি বলে, 'তোমাদের খেলা কী রকম?'
কালো মেঘ ভেসে এল, হেসে চিকিমিকি
ডেকে গুরুগুরু—
বলে, 'ঐ চেয়ে দেখো, হানাসান হল নানাখানা।

ওর ছুটি নানা রঙে নানা চেহারায়,
নানা দিকে বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।'
মণি বলে, 'ব্যাঙগমা দাদা,
এ দিকে বিয়ে যে ঠিক—বর এসে কী বলবে শেষে!'
ব্যাঙগমা হেসে বলে, 'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে গোধূলির মেঘে।'
মণি কেঁদে বলে, 'তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা!'
ব্যাঙগমা বলে, 'মণিদিদি, রাত হয়ে যাবে শেষ—
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টিধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

১৩ আষাঢ় ১৩৩৯

শ্যামলা

হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ—
মুখে তব সুদূরের রূপ
পড়িয়াছে ধরা
সন্ধ্যার আকাশ-সম সকল-চঞ্চল-চিন্তা-হরা।
আঁকা দেখি দৃষ্টিতে তোমার
সমুদ্রের পরপার,
গোধূলিপ্রান্তরপ্রান্তে ঘন কালো রেখাখানি;
অধরে তোমার বীণাপাণি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝংকার।
অগীত সে সুর
মনে এনে দেয় কোন্ হিমাদ্রির শিখরে সুদূর
হিমঘন তপস্যায় স্তব্ধলীন
নির্ঝরের ধ্যান বাণীহীন।
জলভারনত মেঘে
তমালবনের 'পরে আছে লেগে
সকরুণ ছায়া সুগম্ভীর—
তোমার ললাট-'পরে সেই মায়া রহিয়াছে স্থির।

ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে
স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে
শান্তধারা,
কলশব্দহারা,
তাহারি বিষাদ কেন
অতল গাম্ভীর্য লয়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।
শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে—সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক্ মুখখানি।

১৩ শ্রাবণ ১৩৩৯

পোড়ো বাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে
আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে,
প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে
তুমি আছ এ ভুবনে।
পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশথের মূলে
বসে আছ এলোচুলে,
আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব—
প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব।
তোমার শয়নঘরে ফুলদানি,
সকালে দিতাম আনি
নাগকেশরের পুষ্পভার
অলক্ষ্যে তোমার।
প্রতিদিন দেখা হত, তবু কোনো ছলে
চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে।
সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন দুটি কালো
আলোরে করিত আরো আলো।
সেদিনের বাতাসেতে তোমার সুগন্ধ কেশপাশ
নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

অনেক বৎসর গেল, দিন গণি নহে তার মাপ—
তারে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ।

নির্মম ভাগ্যের হাতে লেখা
বঞ্চনার কালো কালো রেখা
বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে।
আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে
সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি।
আজ যদি তুমি এস, কোথা তব ঠাঁই—
সে তুমি তো নাই।
আজিকার দিন
তোমারে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন।
তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়ো বাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি;
ভূতে-পাওয়া ঘর,
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, দুর্গ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ।

১৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

বাধা

পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি,
ব্যর্থ হল পথ-খোঁজা—
কহিল, 'হে ভগবান, নিষ্ঠুর যে এ অর্ঘ্যের বোঝা;
আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেষণে
একান্ত পীড়িত আর্ত; তাই সান্ত্বনার অন্বেষণে
এসেছি তোমার দ্বারে; এ প্রেম তুমিই লও প্রভু!'

'লও লও' বারবার ডেকে বলে, তবু
দিতে পারে না যে তাকে—
কৃপণের ধন-সম শিরা আঁকড়িয়া থাকে।
যেমন তুষাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিষ্ফল কঠিনতা

দেয় তারে ব্যথা,
তেমনি সে নারী
নিশ্চল হৃদয়ভারে-ভারী
কেঁদে বলে, 'কী ধনে আমার প্রেম দামি
সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী,
তুমিও কি এরে চিনিবে না?
মানবজন্মের সব দেনা
শোধ করি লও, প্রভু, আমার সর্বস্বরত্ন নিয়ে।
তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ!'

'লও লও' যত বলে খোলে না যে তার
হৃদয়ের দ্বার।
সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,
'লও তুমি লও ভগবান!'

১৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা। সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, 'আমাকে চিনতে পারো না?'

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, 'মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।'

সে বললে, 'আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।'

তার চোখের কোণে একটু ছল্ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, 'সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ?'

কোনো কথাটি না ব'লে সে একটু হাসলে; বুঝলেম—সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ?'

সে বললে, 'এই দেখো-না আমার গলার হার।'

দেখলেম সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, 'আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।'

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, 'মনে আছে? সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।'

লজ্জিত হয়ে বললেম, 'বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।'

সে বললে, 'যে অন্তর্যামীর বর তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়া-তলে গোপনে বসে আছি—আমাকে বরণ করে নাও।'

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, 'একি তোমার অপরূপ মূর্তি!'

সে বললে, 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।'

* আষাঢ় ১৩২৬

আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কেউ আসবে বুঝি?'

মন বলে, 'রোসো! আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।'

চুপচাপ করে আবার খাটতে বসি। ভাবি, জায়গা দখল সারা হবে, জিনিসপত্র সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তখন শেষ জবাব মিলবে।

জায়গা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, 'এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।'

মন বলে, 'আরে রোসো, আমার সময় নেই।'

আমি বললেম, 'কেন, আরও জায়গা চাই? আরও ঘর, আরও সরঞ্জাম?'

মন বললে, 'চাই বৈকি।'

আমি বললেম, 'এখনও যথেষ্ট হয় নি?'

মন বললে, 'এতটুকুতে ধরবে কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'কী ধরবে? কাকে ধরবে?'

মন বললে, 'সে-সব কথা পরে হবে।'

তবু আমি প্রশ্ন করলেম, 'সে বুঝি মস্ত বড়ো?'

মন উত্তর করলে, 'বড়ো বৈকি।'

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠে পড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে, বললে, 'কাজের লোক বটে।'

এক-একবার কেমন আমার সন্দেহ হতে লাগল, বুঝি মন-বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না—সেইজন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজ-সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু, ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়ি-পাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজনদরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, 'আরও না হলে চলবে না।'

'কেন চলবে না?'

'সে যে মস্ত বড়ো?'

'কে মস্ত বড়ো?'

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি 'অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে', তখন সে রেগে উঠে বলে, 'জবাব দিতেই হবে' এমন কি কথা! যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই; লাঠি-সড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; মিস্ত্রিতে মজুরে ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকিতে কোথাও পা ফেলবার জো কী! সমস্তই স্পষ্ট; এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন!'

শুনে তখন ভাবি, 'মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ।'

আবার ঝুড়িতে করে ইঁট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকি।

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতে পাঁচতলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হল সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরে পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ওই বাড়িটার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।'

তারা বলে, 'ছাড়ো, আমার কাজ আছে।'

একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বললে, 'আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।'

আমি যে কী বুঝলেম জানি নে, বলে উঠলেম, 'তবে আর দেরি নেই।'

সে হেসে বললে, 'না, এল বলে।'

তখনই খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বললেম, 'এবার কাজ বন্ধ করো।'

মন বললে, 'সে কী কথা!— লোকে যে বলবে অকর্মণ্য!'

আমি বললেম, 'বলুক গে।'

মন বললে, 'তোমার হল কী! কিছু খবর পেয়েছ নাকি?'

আমি বললেম, 'হাঁ, খবর এসেছে।'

'কী খবর?'

মুশকিল, স্পষ্ট করে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানস-সরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌঁছল।

মন মাথা নেড়ে বললে, 'মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।'

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝল্‌মল্ করে উঠল।

কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, 'দূত এসেছে।'

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, 'আসছেন নাকি?'

চারি দিক থেকে জবাব এল, 'হাঁ, আসছেন।'

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'কী করি!— সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর সাজ-সরঞ্জাম সব তো এসে পৌঁছল না!'

উত্তর শোনা গেল, 'আরে, ভাঙো ভাঙো তোমার ছ'তলা বাড়ি ভাঙো।'

মন বললে, 'কেন!'

উত্তর এল, 'আজ আগমনী যে! তোমার ইমারতটা বুক ফুলিয়ে পথ আটকেছে।'

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শুনি, 'ঝেঁটিয়ে ফেলো তোমার সাজ-সরঞ্জাম।'

মন বললে, 'কেন!'

'তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।'

যাক গে। কাজের দিনে বসে বসে ছ'তলা বাড়ি গাঁথলেম, ছুটির দিনে একে একে সব ক'টা তলা ধূলিসাৎ করতে হল। কাজের দিনে সাজ-সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ?

মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কী দেখতে পেলে?

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ওইটুকু?

হাঁ, ওইটুকু। আর দেখতে পেলে শিউলিবনের শিউলিফুল।

কেবল ওইটুকু?

হাঁ, ওইটুকু। আর দেখা দিল লেজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর কী?

আর একটি শিশু, সে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

'তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্যে?'

'হাঁ, এরই জন্যেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।'

'এরই জন্যে এত জায়গা চাই?'

'হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাত-মহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্যে ঘর-ভরা সরঞ্জাম। আর, এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।'

'আর মস্ত বড়ো?'

'মস্ত বড়ো এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।'

'ওই শিশু তোমাকে কী বর দেবে?'

'ওই তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন তূণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।'

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হাঁ গো কবি, কিছু দেখতে পেলে, কিছু বুঝতে পারলে?'

আমি বললেম, 'সেইজন্যেই ছুটি নিয়েছি। এতদিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।'

* মহালয়া ১৩২৬

মেঘদূত

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল?

সে বলেছিল, 'সেই মানুষ আমার কাছে এল, যে মানুষ আমার দূরের।'

আর বাঁশি বলেছিল, 'ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।'

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন? কেননা, আধখানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে; কিন্তু, সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না— তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না। কাছের পর্দা আড়াল করেছে।

দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না। সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতিদিনের কাজে কর্মে কথায় ভ'রে গিয়েছে, প্রতিদিনের ভয় ভাবনা কৃপণতায়।

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়, বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে— মনে পড়ে এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন ক'রে— আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ?

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে? সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র! ওকে আবার নূতন ক'রে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে?

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে?

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে হল— প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মরমুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা ক'রে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌঁছিয়ে দিক যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে, সংসারের কাজে ব্যস্ত।

বহুদূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে

পড়ল। কানে কানে বললে, 'আমি তোমারই।'

পৃথিবী বললে, 'সে কেমন ক'রে হবে! তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।'

আকাশ বললে, 'আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।'

পৃথিবী বললে, 'তোমার যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।'

আকাশ বললে, 'আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।'

পৃথিবী বললে, 'আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।'

আকাশ বললে, 'আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি? আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।'

সে এই ব'লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থর্ থর্ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

* কার্তিক ১৩২৬

বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা— প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্তের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি, আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি— চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে— চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে? কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন

অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাঁশির দৈববাণীতে এ-সব বার্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম— তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

* কার্তিক ১৩২৬

গলি

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়— এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বলো তো দিদি, তুমি কোন্ নীল শহরের গলি?'

দুপুর বেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, 'কিচ্ছুই বোঝা গেল না।'

বর্ষামেঘের ছায়া দুই-সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্‌সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে! পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে প'ড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, 'ছিল খট্‌খটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত?'

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে হয়; ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, 'এ কোন্ পাগলা দেবতার মাতলামি!'

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ইঁদুর—সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনো দিন ভুলেও ভাবে না 'এ সমস্ত কেন'।

অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পুজোর নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, 'এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা-কিছু আছে বা!'

এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি ক'রে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁওয়ায় গলি ভরে যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, 'এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মস্ত একটা-কিছু সে মস্ত একটা স্বপ্ন।'

* অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শিশুতীর্থ

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা—
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি!
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা!
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট—
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল!
ও কি ঘূর্ণতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ!
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ!
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদ্‌গদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি,
কুৎসিত জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয়-ছায়ায় তাদের মুখে বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে;
বলে, 'হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল!'
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে;
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না।

জ্যোতিষী বললে, "নক্ষত্রের ইঙ্গিত ভুল হতে পারে না, তাদের সংকেত এইখানে এসে থেমেছে।"

ঐ বলে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল।

সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক, প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গীতধারায় বিগলিত।

নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটীর অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।

দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে, "মাতা, দ্বার খোলো।"

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।

সম্মিলিত জনসংঘ তাদের নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে সৃষ্টির সেই প্রথম মন্ত্র—"মাতা, দ্বার খোলো।"

দ্বার খুলে গেল।

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু, ঊষার কোলে যেন শুকতারা।

দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।

কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান গেয়ে উঠল, "জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, "জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

পূর্ব্বদেশের বৃদ্ধ মনে মনে বললে,
"আমার দেখা হোলো।"

শেষ পৃষ্ঠা

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, 'ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো।'
ওরা শোনে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি।
বলে, পশুই শাশ্বত।
বলে, সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ করে বলে, 'ভাই, তুমি কোথায়?'
উত্তরে শুনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না;
তর্ক করে, এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি—আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত, পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়? যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতিসূক্ষ্ম স্বর
সবার কানে কানে বললে, 'চলো সার্থকতার তীর্থে।'
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে একটি মহৎপ্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে।
জোড়হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে—
সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

যাত্রীরা চারি দিক থেকে বেরিয়ে পড়ল
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,

লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে।
রাজা চলল; অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে—কত মাতা, কুমারী, কত বধূ—
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে—
তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর, অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ আতুর, আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না—কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে—তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়—কত পথ বাকি?
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না—
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে;
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র;
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল। দিগন্তের পর দিগন্ত আসে—
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

রাত হয়েছে। পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়;
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,—
'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ!'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে। বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে; পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, 'চুপ করো!'
কুকুর ডেকে ওঠে; চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে।
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায় এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ।
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে!'
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, 'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে!'
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।'
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল;
কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে, 'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়!'

তরুণের দল ডাক দিল, 'চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে!'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল,
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর!'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না; তাদের মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল।
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ,
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।
রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া?'
সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।'
তরুণ বলে, 'থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্ররাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে। পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

প্রত্যুষের প্রথম আভা অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বললে, 'বন্ধু, আমরা এসেছি।'
পথের দুই ধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমাণ।
কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,

বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু, কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানে এসেই থেমেছে।
এই ব'লে ভক্তিনম্রশিরে
পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে, 'মাতা, দ্বার খোলো!'

•

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধ দ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক্ হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী : মাতা, দ্বার খোলো!
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে—
'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের!'
সকলে জানু পেতে বসল—
রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে,
'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের!'

শ্রাবণ ১৩৩৮

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিম গাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তাল গাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।

ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।

জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূরকালের আর-কোনো একটা দিনের মতো।
এরকম দিন মানে না কোনো দায়কে, এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের-নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা ব'লে
সে অতীত কি ছিল কোনোকালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়!
প্রেয়সীকে মনে হয়, সে আমার জন্মান্তরের জানা—
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই-যে সোনায়-পান্নায় ছায়ায়-আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে-তবু-নেই—
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানি—
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মের্‌জাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।
ভাদ্রমাসের সকাল বেলা,
পাতলা মেঘের ঝাপসা রোদ্‌দুর;
কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা করে বইছে আমলকীর কাঁচ ডালে।

পথিকটিকে দেখা গেল আমার বিশ্বের শেষ রেখাতে,
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।

ওকে শুধু জানলুম 'একজন লোক'।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই, কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে ভাদ্রমাসের সকাল বেলায়
একজন লোক।
সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে কারও সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারও,
যেখানে আমি—একজন লোক।

তার ঘরে তার বাছুর আছে, ময়না আছে খাঁচায়;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে—
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী, আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে;
কোনোখানেই নেই আমি, একজন লোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

পৃথিবী

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ-নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত করো তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ করো সুধা
বাম হাতে চূর্ণ করো পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত করো অট্টবিদ্রূপে;
দুঃসাধ্য করো বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে করো দুর্মূল্য,
কৃপা করো না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পরযুগে—
মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত:
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়।

আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকলপরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে,
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যূষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে,
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে—
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম-অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

শান্তিনিকেতন
২৯ আশ্বিন ১৩৪২

একদিন আষাঢ়ে

একদিন আষাঢ়ে নামল বাঁশবনের মর্মর-ঝরা ডালে
জলভারে অভিভূত নীলমেঘের নিবিড় ছায়া।
শুরু হল ফসলক্ষেতের জীবনীরচনা মাঠে মাঠে কচিধানের চিকন অঙ্কুরে
এমন সে প্রচুর, এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল,
দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে তার পরিচয় এমন উদার-প্রসারিত,
মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে তাকে কুলাতে পারে;
তার অপরিমেয় শ্যামলতায় আছে যেন অসীমের চির-উৎসাহ,
যেমন সে আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে।

মাস যায়।
শ্রাবণের স্নেহ নামে আঘাতের ছল ক'রে,

সবুজ মঞ্জরী এগিয়ে চলে দিনে দিনে
শিষগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।
তার আত্মাভিমানী যৌবনের প্রগল্‌ভতার 'পরে
সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক,
নিশীথের তারা নিবিষ্ট করে নিস্তব্ধ বিস্ময়।

মাস যায়।
বাতাসে থেমে গেল মত্ততার আন্দোলন,
শরতের শান্তনির্মল আকাশ থেকে
অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বাণী এল—'প্রস্তুত হও'।
সারা হল শিশিরজলে স্নানব্রত।

মাস যায়।
নির্মম শীতের হাওয়া এসে পৌঁছল হিমাচল থেকে,
সবুজের গায়ে গায়ে এঁকে দিল হল্‌দের ইশারা,
পৃথিবীর দেওয়া রঙ বদল হল আলোর দেওয়া রঙে।
উড়ে এল হাঁসের পাঁতি নদীর চরে,
কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ল তটের পথে পথে।

মাস যায়।
বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ-গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল অন্ধকারের অবরোধে।
তার পরে শূন্যমাঠে অতীতের চিহ্নগুলো
কিছুদিন রইল মৃত শিকড় আঁকড়ে ধ'রে—
শেষে কালো হয়ে ছাই হল আগুনের লেহনে।

মাস গেল।
তার পরে মাঠের পথ দিয়ে গোরু নিয়ে চলে রাখাল—
কোনো ব্যথা নেই তাতে, কোনো ক্ষতি নেই কারও।
প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথগাছ, সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।
তারই তলায় দুপুরবেলায় ছেলেটা বাজায় বাঁশি আদিকালের গ্রামের সুরে।
সেই সুরে তাম্রবরন তপ্ত আকাশে বাতাস হুহু ক'রে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না একদিনেরও জন্যে।

শান্তিনিকেতন
২ কার্তিক ১৩৪২

কবি আমি ওদের দলে

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে পূজাব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে
প্রাচীর ঘিরে দুয়ার তুলে
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায় আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারী হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে;
আমাকে শুধায়, 'দেখে এলে তোমার দেবতাকে?'
আমি বলি, 'না।'
অবাক হয় শুনে; বলে, 'জানা নেই পথ?'
আমি বলি, 'না।'
প্রশ্ন করে, 'কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?'
আমি বলি, 'না।'

এমন করে দিন গেল;
আজ আপন মনে ভাবি, 'কে আমার দেবতা, কার করেছি পূজা!'

শুনেছি যাঁর নাম মুখে-মুখে, পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।

মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে, পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের বেদনাবন্ধুর পথে।

বালক ছিলেম যখন, পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদিমন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে—আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি শুনেছি আমার রক্তচাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীমকালে, যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন এই জাগরণের আনন্দে।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারি নি।

যখন বালক ছিলেম, ছিল না কেউ সাথি,
দিন কেটেছে একা একা চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে, চিহ্নমোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,
তাই আমার বন্ধহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়—
ওরা তার ও পাশ দিয়ে চলে গেছে বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়, শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল—
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে সকল দেশের সকল ফুল

এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায় প্রাচীর নেই, পাহারা নেই
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক, অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে—
'হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।'

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে, সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে হঠাৎ হল উচ্ছলিত—
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা, নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়ালো গাছের তলায়,
ফিরে তাকালো আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ মুখের দিকে।
ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে—
'তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।'
আমি বললেম, 'দুই না-চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।'

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।

অল্পবেগের সেই প্রবাহ বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান ক'রে উঠেছে তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে আমার সর্বদেহেমনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপুন-লাগা পাতাগুলির থেকে ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ, ছায়ায় আলোয়।

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত কদর্য কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য— আলোকের প্রকাশ,
আর, সৃষ্টির শেষ রহস্য— ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন—
সকল মন্দিরের বাহিরে আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে আর
মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

শান্তিনিকেতন
১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

শরৎ

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জমেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি-পানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।

শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে,
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা।

আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন-বাহিরে; যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল—
সর্ব দেহ মন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে; রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

২৭ ভাদ্র ১৩৪১

প্রায়শ্চিত্ত

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিণীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষপুঞ্জ করে দিক উদ্গার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ন দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে

নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিজয়াদশমী। ১৭ আশ্বিন ১৩৪৫

নাট্যশেষ

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধূসর নদীজলে
মগ্ন হল। ও পারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে—মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায়। সেদিনের সদ্য-জাগা চক্ষে জাগে
অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষ;
সম্মুখে সে চলেছিল না জানিয়া শেষের উদ্দেশ,
নেপথ্যের প্রেরণায়। জানা না-জানার মধ্যসেতু
নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু।
অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন,
দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেষেই; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে। ছায়ায়-আলোয়-বোনা
আতপ্ত ফাল্গুনদিনে মর্মরিত চাঞ্চল্যের স্রোতে
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে। দুজনে করিল আসাযাওয়া
অজানা অধীরতায়।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সব চেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে। সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে, বিঁধে আলোকের সূচি;
সে রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি।

সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

চন্দননগর
আষাঢ় ১৩৪২

পরিচয়

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি,
'পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে!'
আমি শুধু বলেছি, কে জানে!

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান —
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক;
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।'
আর কিছু নয়—
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তার পরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা।
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে—
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণ-লিখন-পাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে—
'সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে!'

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
'মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক—
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।'

শান্তিনিকেতন
১৩ মাঘ ১৩৪৩

যাবার মুখে

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন, পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,
স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি—
নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে-জমা-করা
প্রবঞ্চনায়-ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।
নিঃশেষ যবে হয় যত-কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই

সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
মন-ভোলাবার অকারণ গানে, কাজ-ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয়, তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।
রাজা মহারাজা মিলায় শূন্যে ধুলার নিশান তুলে,
তারা দেখা দিয়ে চলে যায় যবে ফুটে ওঠে ফুলে ফুলে।
থাকে নাই থাকে কিছুতেই নেই ভয়,
যাওয়ায় আসায় দিয়ে যায় ওরা নিত্যের পরিচয়।
অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
হাটে বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি ক'রে।

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ওই চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই-যে শিমুল ওই-যে সজিনা আমারে বেঁধেছে ঋণে—
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদিকালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণকাঁপন অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যেরই ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাতরবি।
সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অন্তরে নামি—
'যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি' আমি।
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

যায় যদি তবে যাক,
এল যদি শেষ ডাক—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন যাক।

শান্তিনিকেতন
২২মাঘ ১৩৪৩

রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধানো তাপে।

কোথাও কোনো শব্দ-যে নেই তারই শব্দ বাজে
ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে সারাদুপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
দিগ্‌বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।
দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাখে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে—
নৌকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।

বর্ষা হলে বন্যা নামে দূরের পাহাড় হতে,
কূল-হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার— দমকা হাওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাবুক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই বৃষ্টিধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে সুর মেশে না ধেনুর হাম্বারবে।
ক্ষেতের মধ্যে কল্‌কলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্যাওলা-পানার দল।

রাত্রি যখন ধ্যানে বসে তারাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না যে—
সমস্ত নিঃঝুম ;
জাগাও নেই কোনোখানে, কোথাও নেই ঘুম।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

খাটুলি

একলা হোথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে—
আপন-ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে
টানছে তামাক বসে আপন-মনে।
মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী
বইছে নিরবধি।

আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে,
আমের কাঠের নড়্‌নড়ে এক তক্তপোশের 'পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের সেলাই-করা কাঁথা।
নাতনি গেছে, রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে,
তেমনি কচি গলায় ওকে 'দাদু' ব'লেই ডাকে।
ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
দুঃখ অনেক পেয়েছে ও, হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।
বাইরে দারিদ্র্যের
কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি—
প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।
হয়তো গোরু বেচ'তে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে দুবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে,
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ঐ বছরের শেষে।
শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে।

বিচ্ছেদ নেই খাটুলিতে, শোকের পায় না ফাঁক,
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক'রে নেইকো এমন বাক্‌।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন ক'রে পায় না ভেবে শেষে।
খাটুলিতে এসে বসে যখনই পায় ছুটি,
ভাব্‌নাগুলো ধোঁওয়ায় মেলায়, ধোঁওয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিস দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নাচে,
নদীর ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,
চক্ষু ভোলায় ক্ষেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—
জন্মমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন
অতি সহজ ব'লেই তাহা জানে না ওর মন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

সুধিয়া

গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম,
গোয়ালবাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।
গোরু-চরার প্রকাণ্ড ক্ষেত, নদীর ওপার চরে
কলাই শুধু ছিটিয়ে দিত পলি-জমির 'পরে।
জেগে উঠত চারা তারি, গজিয়ে উঠত ঘাস,
ধেনুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।
মাঠটা জুড়ে বাঁধা হত বিশ-পঞ্চাশ চালা,
জমত রাখাল ছেলেগুলোর মহোৎসবের পালা।
গোপাষ্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হত দান,
গুরুঠাকুর গা ডুবিয়ে দুধে করত স্নান।
তার থেকে সর ক্ষীর নবনী তৈরি হত কত,
প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।

বছর তিনেক অনাবৃষ্টি, এল মন্বন্তর
শ্রাবণ মাসে শোণনদীতে বান এল তার পর।
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা,
ধরণী চায় শূন্য-পানে সীমার চিহ্নহারা।
ভেসে চলল গোরু বাছুর, টান লাগল গাছে—
মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আঁকড়ে আছে।
বন্যা যখন নেমে গেল, বৃষ্টি গেল থামি—
আকাশ জুড়ে দৈত্য-দেবের ঘুচল সে পাগলামি।
শিউনন্দন দাঁড়ালো তার শূন্য ভিটেয় এসে—

তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।
চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁজি—
মনে হল সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি।
ছেলেটা তার ভীষণ জোয়ান, সামরু বলে তাকে—
এক-গলা এই জলে-ডোবা সকল পাড়াটাকে
মথন ক'রে ফিরে ফিরে তিনটে গোরু নিয়ে
ঘরে এসে দেখলে দু হাত চোখে ঢাকা দিয়ে
ইষ্টদেবকে স্মরণ ক'রে নড়ছে বাপের মুখ।
তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক—
বলে উঠল, 'দেব্‌তাকে তোর কেন মিছিস ডাকি?
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক আজও রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুক-নাকো যাই আর
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।'
এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে
চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে
গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে—
মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।
ব্যাবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে,
আশা রইল উঠবে জেগে আবার কোনোকালে।

এ দিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এগোয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনাপাওনা দিনরাত্রি জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
মাল-তদন্ত করতে এল দুনিয়াচাঁদ বেনে
দশ বছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে।
ছেলেটা ওর জেদ ধরেছে—ঐ সুধিয়া গাই
পুষবে ঘরে আপন ক'রে, ঐটে নেহাত চাই।
সামরু বলে, 'তোমার ঘরে কী ধন আছে কত
আমাদের এই সুধিয়াকে কিনে নেবার মতো?
ও যে আমার মানিক, আমার সাত রাজার ঐ ধন,
আর যা আমার যায় সবই যাক, দুঃখিত নয় মন।
মৃত্যুপারের থেকে ও যে ফিরেছে মোর কাছে,
এমন বন্ধু তিন ভুবনে আর কি আমার আছে!'
বাপের কানে কী বললে সেই দুনিচাঁদের ছেলে,
জেদ বেড়ে তার গেল বুঝি যেমনি বাধা পেলে।
শেঠজি বলে মাথা নেড়ে, 'দুই-চারি মাস যেতেই
ঐ সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।'
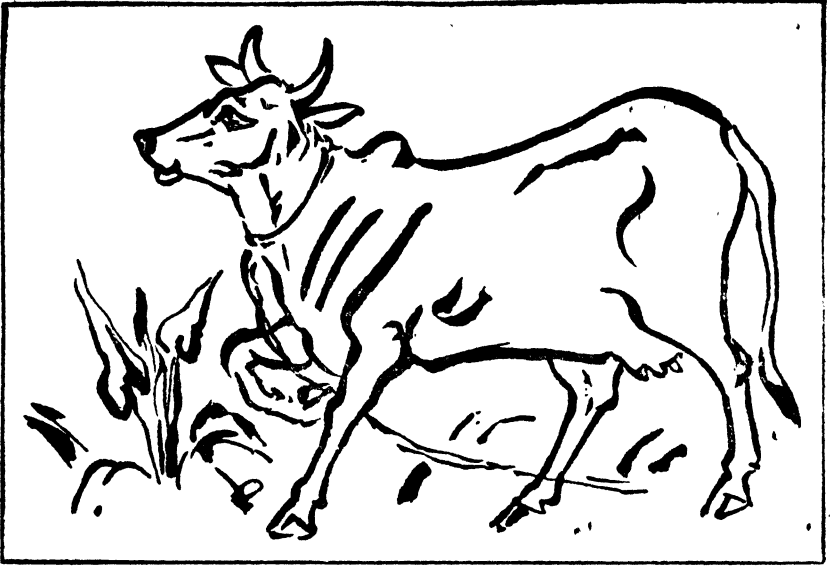
কালোয় সাদায় মিশোল বরন, চিকন নধর দেহ,
সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত যেন রাশীকৃত স্নেহ।
আকাল এখন, সামরু নিজে দুইবেলা আধ-পেটা—
সুধিয়াকে খাওয়ানো চাই যখনই পায় যেটা।
দিনের কাজের অবসানে গোয়ালঘরে ঢুকে
ব'কে যায় সে গাভীর কানে যা আসে তার মুখে।
কারো 'পরে রাগ সে জানায়, কখনো সাবধানে
গোপন খবর থাকলে কিছু জানায় কানে কানে।
সুধিয়া সব দাঁড়িয়ে শোনে কানটা খাড়া ক'রে,
বুঝি কেবল ধ্বনির সুখে মন ওঠে তার ভরে।

সামরু যখন ছোটো ছিল পালোয়ানের পেশা
ইচ্ছা করেছিল নিতে, ঐ ছিল তার নেশা।
খবর পেল, নবাববাড়ি কুস্তিগিরের দল
পাল্লা দেবে—সামরু শুনে অসহ্য চঞ্চল।
বাপকে ব'লে গেল ছেলে, 'কথা দিচ্ছি শোনো,
এক হপ্তার বেশি দেরি হবে না কখ্খোনো।'

ফিরে এসে দেখতে পেলে সুধিয়া তার গাই
শেঠ নিয়েছে ছলে-বলে, গোয়ালঘরে নাই।

যেমনি শোনা অমনি ছুটল, ভোজালি তার হাতে,
দুনিচাঁদের গদি যেথায় নাজির-মহল্লাতে।
'কী রে সামরু, ব্যাপারটা কী' শেঠজি শুধায় তাকে।
সামরু বলে 'ফিরিয়ে নিতে এলুম সুধিয়াকে।'
শেঠ বললে, 'পাগল নাকি? ফিরিয়ে দেব তোরে,
পরশু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে।'
'সুধিয়া রে' 'সুধিয়া রে' সামরু দিল হাঁক,
পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।
চেনা সুরের হাম্বা ধ্বনি কোথায় জেগে উঠে,
দড়ি ছিঁড়ে সুধিয়া ঐ হঠাৎ এল ছুটে।
দু চোখ বেয়ে ঝরছে বারি, অঙ্গটি তার রোগা,
অন্নপানে দেয় নি সে মুখ, অনশনে-ভোগা।
সামরু ধরল জড়িয়ে গলা; বললে, 'নাই রে ভয়,
আমি থাকতে দেখব এখন কে তোরে আর লয়।
তোমার টাকায় দুনিয়া কেনা, শেঠ দুনিচাঁদ, তবু
এই সুধিয়া একলা নিজের— আর কারও নয় কভু।
আপন ইচ্ছামতে যদি তোমার ঘরে থাকে
তবে আমি এই মুহূর্তে রেখে যাব তাকে।'
চোখ পাকিয়ে কয় দুনিচাঁদ, 'পশুর আবার ইচ্ছে!
গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে!
গোল করো তো ডাকব পুলিস।' সামরু বললে, 'ডেকো—
ফাঁসি আমি ভয় করি নে এইটে মনে রেখো।
দশ বছরের জেল খাটব, ফিরব তো তার পর—
সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।'

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

পিছু-ডাকা

যখন দিনের শেষে
চেয়ে দেখি সমুখ-পানে সূর্য ডোবার দেশে
মনের মধ্যে ভাবি—
অস্তসাগর-তলায় গেছে নাবি
অনেক সূর্য-ডোবার সঙ্গে অনেক আনাগোনা,
অনেক দেখাশোনা,
অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয়,
শক্তিমানের অনেক পরিচয়।

তাদের হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথায় টান লাগে না মনে,
কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুক্‌নো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁঠি মাথায়,
তখন মনে হঠাৎ এসে এই বেদনাই বাজে—
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।
ঐ যা-কিছুর ছবির ছায়া দুলেছে কোন্‌কালে
শিশুর-চিত্ত-নাচিয়ে-তোলা ছড়াগুলির তালে—
'তির্‌পুর্নির চরে
বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে,
কোন্‌ মেয়ে সে চিকন-চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি।'
ঐ যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্তধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন্‌ গুন্‌ গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা—
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

শান্তিনিকেতন
১৮ আশ্বিন ১৩৪৪

অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, খেয়া নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

শান্তিনিকেতন
২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন
পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো, কবি—
পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতাদেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। দিনের সহস্র কণ্ঠ
ক্ষীণ হয়ে এল; যে প্রহরগুলি ধ্বনিপণ্যবাহী
নোঙর ফেলেছে তারা সন্ধ্যার নির্জন ঘাটে এসে।
আকাশের আঙিনায় শান্ত যেথা পাখির কাকলি
সুরসভা হতে সেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার
বাষ্পে-বোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে, দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণরশ্মিচ্ছটা। চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু;

দিল মোরে করস্পর্শ; প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে— গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়,
রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো—
কেহ শুধাবে না নাম, অধিকারগর্ব নিয়ে তার
ঈর্ষা রহিবে না কারো, অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।

শান্তিনিকেতন
৩ পৌষ ১৩৪৪

মানসী

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ও পারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়া-'পরে।
হেথা-হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নীচের তলে
ছোলা-ক্ষেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে:
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সঙ্গে কথা কহি।

ম্লানরৌদ্র অপরাহ্নবেলা
পান্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকান্ড একেলা
অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।

সুদূর দুর্গম
কোন্ পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি।

শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝঙ্কারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষস্পন্দে-কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্মসাথিহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন-তরে—
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।

মংপু
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

আসা-যাওয়া

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।

বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

শান্তিনিকেতন
১৫ চৈত্র ১৩৪৬

বরণ

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ!

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ-ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ!

কালিম্পঙ
৯ আশ্বিন ১৩৪৭

নিশান্তে যাত্রী আমি

রোগদুঃখরজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি,
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেইমত যে রশ্মি অন্তরে আসে সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি চৈতন্যসাগরতীর্থ-পথে।

শান্তিনিকেতন
৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭। প্রাতে

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি,
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
ক'রে থাকে চুপ,
বলে 'আমি আনন্দিত'—ছন্দ যায় থামি—
বলে 'ধন্য আমি'।

শান্তিনিকেতন
১৫ মাঘ ১৩৪৭। বিকাল

মধুময় পৃথিবীর ধূলি

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
ব'লে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

শান্তিনিকেতন
সকাল। ২ ফাল্গুন ১৩৪৭
১৪।২।১৯৪১

রবীন্দ্রজীবনের মুখ্যঘটনা-পঞ্জী

সংক্ষিপ্ত বংশলতা

পঞ্চানন কুশারী বা ঠাকুর; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়রাম; তাঁহার পুত্র নীলমণি, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি; নীলমণির পুত্র রামলোচন (১৭৫৭), রামমণি (১৭৫৯) প্রভৃতি; রামমণির পুত্র ও রামলোচনের দত্তক পুত্র দ্বারকানাথ। নীলমণি ঠাকুর জুন ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে জোড়াসাঁকোয় বসবাস আরম্ভ করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৭৯৪ - ১৮৪৬
দিগম্বরীদেবী। ? -১৮৩৯

দেবেন্দ্রনাথ। ১৮১৭ - ১৯০৫
সারদাদেবী। ১৮২৪ - ৭৫

রবীন্দ্রনাথ। ৭ মে ১৮৬১ - ৭ অগস্ট ১৯৪১
মৃণালিনীদেবী। ১৮৭৩ - ২৩ নভেম্বর ১৯০২

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীদেবীর সন্তান :

১ বেলা বা মাধুরীলতা। ২৫ অক্টোবর ১৮৮৬ - ১৬ মে ১৯১৮
২ রথীন্দ্রনাথ। ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮ - ৩ জুন ১৯৬১
৩ রেণুকা। ২৩ জানুয়ারি ১৮৯১ - সেপ্টেম্বর ১৯০৩
৪ মীরা বা অতসী। ১২ জানুয়ারি ১৮৯৪ - ১৫ মার্চ ১৯৬৯
৫ শমীন্দ্রনাথ। ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬ - ২৩ নভেম্বর ১৯০৭

রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের জন্মকাল ও অন্যান্য তথ্য এবং রবীন্দ্রজীবনের মুখ্যঘটনা-পঞ্জী প্রধানতঃ সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত *A Centenary Volume: Rabindranath Tagore : 1861-1961* গ্রন্থে (1961) মুদ্রিত শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশ রায় -সংকলিত 'A Chronicle of Eighty Years' অনুসারে নির্দেশ করা হইয়াছে। মুখ্যঘটনা-পঞ্জী প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক।

রচনা-পরিচয়ের সংকেত— 'গান 'কবিতা বা 'কাব্য, আখ্যান', ০নাটক ০গীতিনাট্য বা ০নৃত্যনাট্য, প্রহসন০, 'প্রবন্ধাদি'। যথা— 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, 'মানসী, 'সোনার তরী; চোখের বালি', ক্ষুধিত পাষাণ'; ০বিসর্জন, ০ফাল্গুনী, ০শাপমোচন, ০শ্রাবণগাথা; তাসের দেশ০, লক্ষ্মীর পরীক্ষা০; 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', 'শিক্ষার হেরফের', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'পঞ্চভূত' ইত্যাদি। রচনার কাল বা মুদ্রণ বা প্রকাশ-অনুযায়ী উল্লেখ।

৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮) রাত্রি আড়াইটার পরে কলিকাতায় পৈতৃক বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও সারদাদেবীর (১৮২৪-১৮৭৫) চতুর্দশ সন্তান। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) পৌত্র।

১৮৬৮-৭২। বয়স ৭-১১। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল ও বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে অনিয়মিত অধ্যয়ন। গৃহে জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বিবিধ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষালাভ, ব্যায়ামচর্চা। কাব্যরচনার সূত্রপাত (১৮৬৯)।

১৮৭৩-৭৫। বয়স ১২-১৪। উপনয়ন। পিতার সহিত বোলপুর হইয়া হিমালয় গমন। পিতার নিকট শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রভাব-লাভ। 'অভিলাষ কবিতা রচনা এবং ম্যাক্‌বেথের অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ। মাতৃবিয়োগ— ৮ মার্চ্ ১৮৭৫।

১৮৭৭। বয়স ১৬। ভারতী পত্রের প্রকাশ। ভারতীতে নিয়মিত সকলপ্রকার রচনা-প্রকাশ—'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ভিখারিণী', করুণা', 'কবিকাহিনী।

১৮৭৮-৮০। বয়স ১৭-১৯। বিলাতযাত্রার পূর্বে আমেদাবাদে বাস, তথায় নিজে সুর দিয়া গান রচনা। বিলাতযাত্রা— লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ। বিলাতে অবস্থান— সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ - ফেব্রুয়ারি ১৮৮০। 'বনফুল।

১৮৮১-৮৩। বয়স ২০-২২। ০বাল্মীকিপ্রতিভা রচনা ও বাল্মীকিরূপে অভিনয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত চন্দননগরে বাস। ১০ নম্বর সদর স্ট্রীটে দিব্যদর্শন (১৮৮২) ও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা। কারোয়ার-প্রবাস। মৃণালিনীদেবীর সহিত বিবাহ. ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। 'ভগ্নহৃদয়, ০রুদ্রচণ্ড, 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত, ০কাল-মৃগয়া, বৌঠাকুরানীর হাট', 'প্রভাতসঙ্গীত, 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

১৮৮৪। ২৩। নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু, ১৯ এপ্রিল। 'ছবি ও গান, ০প্রকৃতির প্রতিশোধ। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিয়োগ।

১৮৮৫-৯১। বয়স ২৪-৩০। 'রামমোহন রায়'. 'আলোচনা', 'রবিচ্ছায়া, 'কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি', 'চিঠিপত্র', 'সমালোচনা'। জাতীয় কংগ্রেসে "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গান গাওয়া। মাধুরীলতা (১৮৮৬) ও রথীন্দ্রনাথের (১৮৮৮) জন্ম। ০মায়ার খেলা। 'মানসী (১৮৯০)। য়ুরোপ-প্রবাস, পরে শিলাইদহে জমিদারির কার্যভার-গ্রহণ, ১৮৯০। ০রাজা ও রানী ও ০বিসর্জন নাটকে অভিনয়। হিতবাদী পত্রে পোস্টমাস্টার' ইত্যাদি ছোটোগল্প। শান্তিনিকেতন-মন্দিরের উদ্‌বোধন। সাধনা পত্র প্রকাশ। রেণুকার জন্ম।

১৮৯২। বয়স ৩১। ০চিত্রাঙ্গদা ও গোড়ায় গলদ০। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সমর্থনে 'শিক্ষার হেরফের'। 'সোনার তরীর সূচনা।

১৮৯৩-৯৪। বয়স ৩২-৩৩। উড়িষ্যা-ভ্রমণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ-পাঠ। সাধনায় 'মেয়েলি ছড়া', 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। মীরার জন্ম। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ২য়, 'সোনার তরী, ছোট গল্প', বিচিত্র গল্প' ১ম, কথাচতুষ্টয়', 'বিদায়-অভিশাপ।

১৮৯৫-৯৭। বয়স ৩৪-৩৬। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের স্বদেশী শিল্প-প্রচেষ্টায় সাহায্য। ক্ষুধিত পাষাণ'-রচনা। শমীন্দ্রনাথের জন্ম। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে রচিত

জাতীয় সঙ্গীত : অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। ১৮৯৭ নাটোরে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান। গল্পদশক', 'নদী, 'চিত্রা, কাব্যগ্রন্থাবলী, বৈকুণ্ঠের খাতা°, 'পঞ্চভূত'।

১৮৯৮ বয়স ৩৭। ভারতীর সম্পাদনা। ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে °গান্ধারীর আবেদন-পাঠ। সিডিশন-অ্যাক্টের প্রতিবাদে টাউন-হলে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ-পাঠ। ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান। লক্ষ্মীর পরীক্ষা°। বলেন্দ্রনাথ -কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ।

১৮৯৯-১৯০০। বয়স ৩৮-৩৯। কলিকাতায় প্লেগ, ১৮৯৯—সেবাকার্যে ভগিনী নিবেদিতার সহিত সহযোগিতা। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও স্বদেশী শিল্প-ব্যবসায়ের অবসান। 'কণিকা, 'কথা, 'কাহিনী, 'কল্পনা, 'ক্ষণিকা, গল্পগুচ্ছ' ১ম। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনা, প্রথম ভাষণ ও আচার্যকৃত্য।

১৯০১। বয়স ৪০। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে চোখের বালি'র সূচনা। 'ব্রহ্মমন্ত্র', গল্প', 'নৈবেদ্য, 'বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদের তালিকা'। মাধুরীলতা ও রেণুকার বিবাহ। বিলাতে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ত্রিপুরার মহারাজার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ। ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠা। শিক্ষকমণ্ডলী—জগদানন্দ রায়, উইলিয়ম লরেন্‌স্‌, রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র রায়।

১৯০২-০৪। বয়স ৪১-৪৩। বিদ্যালয়ে অর্থাভাব। পুরীর জমি ও স্ত্রীর গহনা বিক্রয়। মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু, ২৩ নবেম্বর ১৯০২। 'স্মরণ। রেণুকার মৃত্যু, ১৯০৩। বঙ্গদর্শনে নৌকাডুবি'র ক্রমিক মুদ্রণ। ৯টি ভাগে মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ; তন্মধ্যে সপ্তম ভাগে 'শিশু'। সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু, ফেব্রুয়ারি ১৯০৪। হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশ। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে 'স্বদেশী সমাজ' ও টাউন হলে 'শিবাজি-উৎসব পাঠ, ১৯০৪। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে 'আত্মজীবনী'—বাদানুবাদ।

১৯০৫। বয়স ৪৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯ জানুয়ারি। ভাণ্ডার পত্র-প্রকাশ। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে নিবেদিতা ওকাকুরা হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সহিত যোগ। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে নেতৃত্ব। টাউন-হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' পাঠ। দেশপ্রেমমূলক গান ও বক্তৃতা। রাখীবন্ধন। 'আত্মশক্তি', 'বাউল, 'স্বদেশ।

১৯০৬। ৪৫। কৃষিবিদ্যা শিখিতে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় প্রেরণ। 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া, নৌকাডুবি'। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ-গঠনে সহযোগিতা।

১৯০৭। সমাজসেবায় অভিনিবেশ। 'ব্যাধি ও প্রতিকার'। গোরা' উপন্যাসের সূচনা। মীরার বিবাহ। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। গদ্যগ্রন্থাবলীতে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'চারিত্রপূজা' 'প্রাচীন সাহিত্য' 'লোকসাহিত্য' 'সাহিত্য' হাস্যকৌতুক° ইত্যাদি প্রকাশ।

১৯০৮। বয়স ৪৭। পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব। 'পথ ও পাথেয়'। প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', °শারদোৎসব, 'শিক্ষা'।

১৯০৯-১১। 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম', °প্রায়শ্চিত্ত। 'তপোবন'—আশ্রমবিদ্যালয়ের আদর্শ-ব্যাখ্যা। গোরা', 'গীতাঞ্জলি, °রাজা, 'শান্তিনিকেতন'। প্রবাসী পত্রে 'জীবনস্মৃতি'। ১৯১১ জাতীয় কংগ্রেসে "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে" গান গাওয়া হয়।

১৯১২-১৩। বয়স ৫১-৫২। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে কবি-সম্বর্ধনা, ১২ জানুয়ারি ১৯১২। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ, ১৬ মার্চ ১৯১২। °ডাকঘর, গল্প চারিটি', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', °অচলায়তন। Gitanjalir সূচনা।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী-সহ তৃতীয় বিদেশযাত্রা। ইংলণ্ডে 'গীতাঞ্জলির অনুবাদ রোটেন্‌স্টাইন্‌কে প্রদর্শন এবং ঘরোয়া সভায় বিদ্বজ্জন-সমক্ষে কবি ইয়েট্‌স্‌ -কর্তৃক তাহা পাঠ। ইণ্ডিয়া সোসাইটি -কর্তৃক Gitanjali প্রকাশ। সি. এফ. এন্‌ড্রুজের সহিত পরিচয়। সুরুল কুঠি -ক্রয়। আমেরিকায় গমন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। হার্বার্‌ড্‌ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক ভাষণ— Sadhana নামে প্রকাশ। আইরিশ থিয়েটর-কর্তৃক The Post Office মঞ্চস্থ। দেশে প্রত্যাবর্তন। Gitanjaliর জন্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক পূর্বসংকল্পিত ডি. লিট্. উপাধি দান।

১৯১৪-১৫। বয়স ৫৩-৫৪। পিয়ার্সনের শান্তিনিকেতনে বাস-গ্রহণ। এন্‌ড্রুজ ও নন্দলালের আশ্রম-পরিদর্শন। সবুজ পত্রের সূচনা। ফিনিক্স্ স্কুলের ছাত্রশিক্ষকদের আশ্রমে আগমন। গান্ধীজি ও কস্তুরবার আগমন। সবুজ পত্রে প্রকাশ— ॰ফাল্গুনী', 'বলাকা, চতুরঙ্গ' ও ঘরে-বাইরে'। 'গীতিমাল্য, 'গীতালি। ১৯১৫। নাইট উপাধি-লাভ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সহ কাশ্মীর-ভ্রমণ। বলাকার কয়েকটি কবিতা রচনা। ইংলণ্ডে শেক্স্পীয়র ত্রিশতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সনেটপ্রেরণ।

১৯১৬-১৮। বয়স ৫৫-৫৭। বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষ-তহবিলের জন্য ॰ফাল্গুনী অভিনয়। চতুর্থবার বিদেশযাত্রা, মে ১৯১৬-মার্চ্ ১৯১৭। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা। আমেরিকায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা— Nationalism ও Personality। জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-কর্তৃক কবি-সম্বর্ধনা। অ্যানি বেসাণ্টের অবরোধে আলফ্রেড থিয়েটারে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-পাঠ। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধ। স্যাড্লার কমিশন ও ভারতসচিব মণ্টেগুর সহিত সাক্ষাৎকার। কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের প্রথম দিনে 'India's Prayer -পাঠ। তোতাকাহিনী' রচনা। মাধুরীলতার মৃত্যু, ১৬ মে ১৯১৮। 'শান্তিনিকেতন', 'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'বলাকা, গল্পসপ্তক', 'পলাতকা।

১৯১৯। বয়স ৫৮। দক্ষিণভারত-পর্যটন। আদেয়ারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-রূপে ভাষণ। শান্তিনিকেতন পত্রের প্রকাশ ও সম্পাদন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি-ত্যাগ, ৩০ মে। বিশ্বভারতীর কার্যে আত্মনিয়োগ এবং অধ্যাপনা। 'জাপানযাত্রী'। লিপিকা'র বহু রচনা।

১৯২০-২১। বয়স ৫৯-৬০। পশ্চিমভারত-পরিক্রমা। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবার্ষিকীতে বিবৃতি প্রেরণ। পঞ্চম বিদেশ-যাত্রা, মে ১৯২০। ফ্রান্সে বের্গ্স', সিলভ্যাঁ লেভি-প্রমুখ গুণীগণের সহিত সাক্ষাৎকার। হল্যান্ডে বিপুল সমাদর, হেগ ও লিডেনে বক্তৃতা। আমেরিকায় গমন ও বক্তৃতা। পুনরায় ইংলন্ড্ হইয়া ফ্রান্স্, জর্মনি, ডেন্মার্ক্, সুইডেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে গমন। রোম্যাঁ রোলাঁ, কাউন্ট্ কেসার্‌লিং, টমাস মান-প্রমুখ মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ। পয়লা নম্বর'।

দেশে প্রত্যাবর্তন, জুলাই ১৯২১। 'শিক্ষার মিলন', 'সত্যের আহ্বান'; গান্ধীজির জবাব— The Great Sentinel। বর্ষামঙ্গল উৎসব। শ্রীনিকেতনে এল্‌ম্‌হার্স্টের আগমন। সিলভ্যাঁ লেভির বিশ্বভারতীতে আগমন। ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে বিশ্বভারতীর উদ্‌বোধন, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক শান্তিনিকেতনের সমুদয় সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান।

১৯২২। বয়স ৬১। দক্ষিণভারত ও সিংহল-পরিভ্রমণ। প্রবাসী পত্রে ॰মুক্তধারা। লিপিকা', 'শিশু ভোলানাথ। Creative Unity-প্রকাশ।

১৯২৩। বয়স ৬২। বিশ্বভারতীকে বাংলা গ্রন্থস্বত্ব-দান। Visva-Bharati Quarterly -প্রকাশ। পশ্চিমভারতে গমন। ॰বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়। ॰বসন্ত।

১৯২৪। বয়স ৬৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-সম্পর্কে বক্তৃতা। চীনে আমন্ত্রণ। জাপান হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। পেরু দেশের আমন্ত্রণে আমেরিকা-যাত্রা' 'পূরবীর কবিতা ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' রচনা। প্রবাসী পত্রে ॰রক্তকরবী।

১৯২৫। বয়স ৬৪। ইতালি হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু, ৪ মার্চ্। গান্ধীজির শান্তিনিকেতনে আগমন। বিশ্বভারতীতে কার্লো ফর্মিকির আগমন।

প্রথম ভারতীয় ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসে সভাপতিত্ব। 'পূরবী, ০গৃহপ্রবেশ, 'প্রবাহিণী।

১৯২৬। বয়স ৬৫। সর্বজ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোধান, ১৮ জানুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজা-কর্তৃক সম্বর্ধনা।

• ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ-যাত্রা। মুসোলিনী-কর্তৃক রাজকীয় সম্বর্ধনা। ইতালীয় ভাষায় ০চিত্রাঙ্গদা-অভিনয়। রোম্যাঁ রোলাঁর আমন্ত্রণে সুইজার্ল্যান্ডে গমন ও জর্জ্ দুহামেল-প্রমুখ মনীষীগণের সহিত সাক্ষাৎকার। ফাসিস্ৎ সরকারের স্বরূপ-পরিচয়-লাভ এবং প্রতিবাদে ম্যাঞ্চেস্টার গর্ডিয়ানে পত্র-প্রেরণ। অস্ট্রিয়া ও ইংলন্ড্ হইয়া নরওয়ে ও সুইডেনে যাত্রা। নরওয়ের রাজার অভ্যর্থনা। বোয়ার্সন, যোহান বোয়ার, নান্সেন, স্বেন হেডিন-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার। ডেন্মার্ক্ হইয়া জর্মানিতে আগমন এবং বার্লিনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোস্লোভাকিয়া যুগোস্লাভিয়া হাঙ্গেরি বুল্গেরিয়া রুমানিয়া গ্রীস ও মিশর হইয়া সাত মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্তন। 'লেখন ও 'বৈকালী-মুদ্রণ। চিরকুমারসভা০, ০শোধবোধ, ০নটীর পূজা।

১৯২৭। বয়স ৬৬। ভরতপুর জয়পুর আগ্রা ও আমেদাবাদে ভ্রমণ। শিলঙে অবস্থান ও যোগাযোগ' উপন্যাসের সূচনা। ০নটরাজ ও ০ঋতুরঙ্গ।

নবম বার বিদেশ-যাত্রা। মালয় বালী জাভা-ভ্রমণ। শ্যামদেশ হইয়া প্রত্যাবর্তন। বিচিত্রা পত্রে 'জাভা-যাত্রীর পত্র'। মাসিক বসুমতীতে শেষরক্ষা০।

১৯২৮। বয়স ৬৭। অধ্যাপক লেস্নির আগমন। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকার। সিংহলে ও বাঙ্গালোরে গমন। শেষের কবিতা' রচনা।

• ১৯২৯। বয়স ৬৮। কানাডার আমন্ত্রণে দশম বার বিদেশ-যাত্রা। জাপান হইয়া ভ্যাঙ্কুবারে গমন এবং বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দোচীন হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। তপতী-অভিনয়ে বিক্রমের ভূমিকায় কবি। 'যাত্রী', যোগাযোগ', শেষের কবিতা', ০তপতী, 'মহুয়া।

১৯৩০। বয়স ৬৯। পুনরায় বিদেশযাত্রা। ফ্রান্স্ হইয়া ইংলন্ডে গমন। অক্স্ফোর্ডে হিবার্ট্ লেকচার, পরে গ্রন্থাকারে Religion of Man নামে মুদ্রিত। জর্মানিতে আইন্স্টাইনের সহিত সাক্ষাৎকার। ডেন্মার্ক্ হইয়া রাশিয়ায় গমন। রাশিয়ার সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা। আমেরিকায় গমন। ফ্রান্স্ জর্মানি ডেন্মার্ক্ রাশিয়া ও আমেরিকায় চিত্র-প্রদর্শনী। 'The Child রচনা। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'।

১৯৩১। বয়স ৭০। সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ-কর্তৃক কবিসার্বভৌম উপাধি-দান। হিজলি বন্দীশিবিরে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে জনসভায় বক্তৃতা, ২৬ সেপ্টেম্বর। টাউন-হলে সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিপুল সম্বর্ধনা, ২৭ ডিসেম্বর। The Golden Book of Tagore প্রকাশিত। 'প্রশ্ন কবিতা-রচনা। 'রাশিয়ার চিঠি', 'বনবাণী। 'সহজ পাঠ'। 'গীতবিতান ও 'সঞ্চয়িতা। ০শাপমোচন।

১৯৩২। বয়স ৭১। গান্ধীজির কারাবরোধ। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে প্রতিবাদজ্ঞাপন। আমন্ত্রিত হইয়া পারস্যে গমন। রেজা শা পহ্লবী ও পারস্যবাসীর বিপুল সম্বর্ধনা। ইরাক হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। 'পরিশেষ, ০কালের যাত্রা, 'পুনশ্চ। গান্ধীজির অনশনে উদ্বেগ ও পুনা-গমন। মদনমোহন মালব্যের শান্তিনিকেতনে আগমন। কলিকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতিত্ব। 'গীতবিতান, ৩য় খণ্ড।

১৯৩৩। বয়স ৭২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বক্তৃতা—'মানুষের ধর্ম', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'ছন্দ'। বোম্বাই-যাত্রা। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা—'Man'। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব—'ভারতপথিক রামমোহন রায়'। দুই বোন', 'বিচিত্রিতা, ০চণ্ডালিকা, তাসের দেশ০, ০বাঁশরী। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'।

১৯৩৪। বয়স ৭৩। শান্তিনিকেতনে সরোজিনী নাইডু ও সস্ত্রীক জওহরলাল নেহরুর আগমন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া সিংহল ও দক্ষিণভারত-পরিক্রমা। সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খানের শান্তিনিকেতনে আগমন। মালঞ্চ', ০শ্রাবণগাথা, চার অধ্যায়'।

১৯৩৫। বয়স ৭৪। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অভিভাষণ এবং ডি. লিট্. উপাধি-লাভ। এলাহাবাদ লাহোর ও লক্ষ্ণৌয়ে ছাত্রসভায় ভাষণ। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ২১ জুলাই। জাপানী কবি নোগুচির শান্তিনিকেতনে আগমন। কলিকাতায় ০অরূপরতন অভিনয়ে ঠাকুর্দার ভূমিকা-গ্রহণ। 'শেষ সপ্তক ও 'বীথিকা।

১৯৩৬। বয়স ৭৫। শিক্ষা-সপ্তাহে বক্তৃতা—'শিক্ষার ধারা'। অর্থসংগ্রহে উত্তরভারত-ভ্রমণ। গান্ধীজির সাহায্যে ৬০ হাজার টাকা-সংগ্রহ। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে বক্তৃতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. উপাধি-লাভ। ০নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, 'পত্রপুট, 'ছন্দ', 'শ্যামলী, 'সাহিত্যের পথে'। 'জাপানে-পারস্যে', 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'।

১৯৩৭। বয়স ৭৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কবি-কর্তৃক বাংলায় অভিভাষণ। চীনা-ভবনের উদ্‌বোধন। 'খাপছাড়া, 'কালান্তর', সে'। আলমোড়ায় অবস্থান—'ছড়ার ছবি ও 'বিশ্বপরিচয়'-রচনা। গুরুতর পীড়ার পর 'প্রান্তিক-রচনা।

১৯৩৮। বয়স ৭৭। শান্তিনিকেতনে এন্‌ড্রুজ-কর্তৃক হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন। কবির ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. উপাধি লাভ। গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎকার। কালিম্পঙে ও মংপুতে গ্রীষ্মবাস। শান্তিনিকেতনে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আগমন। ০চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য, 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'সেঁজুতি, 'বাংলাভাষাপরিচয়', মুক্তির উপায়০। 'Poet to Poet' (নোগুচির পত্র ও উত্তর)।

১৯৩৯। বয়স ৭৮। ২১ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের আশ্রমে আগমন। হিন্দীভবনের উদ্‌বোধন, ৩১ জানুয়ারি। কবির উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। চীনা শিল্পী জু পিয়'র শান্তিনিকেতনে অভ্যাগত শিল্প-অধ্যাপকরূপে যোগদান। কলিকাতায় বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্‌বোধন। পুরীতে বাস। মংপু এবং কালিম্পঙে গ্রীষ্মবাস। মহাজাতি-সদনের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন, ১৯ অগস্ট্। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের উদ্‌বোধন, ১৬ ডিসেম্বর। 'প্রহাসিনী, 'আকাশপ্রদীপ, ০শ্যামা নৃত্যনাট্য, 'পথের সঞ্চয়'। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম ও ২য় খণ্ডের প্রকাশ।

১৯৪০। বয়স ৭৯। গান্ধীজি ও কস্তুরবার আশ্রমে আগমন, ১৭ ফেব্রুয়ারি। সি. এফ্. এন্‌ড্রুজের পরলোক-গমন, ৫ এপ্রিল। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অক্‌স্‌ফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি-লাভ, ৭ অগস্ট্। কালিম্পঙে রোগের আক্রমণ, ২৬ সেপ্টেম্বর। 'নবজাতক, 'সানাই, 'ছেলেবেলা', তিন সঙ্গী', 'রোগশয্যায়। চিত্রলিপি (রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রালি)।

১৯৪১। বয়স ৮০। ১লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষ-পূর্তি-উৎসব। জন্মদিনের ভাষণ—'সভ্যতার সংকট'। 'আরোগ্য, 'জন্মদিনে, গল্পসল্প', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। দেশব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। ত্রিপুরার মহারাজা-কর্তৃক 'ভারতভাস্কর' উপাধি-দান, ১৩ মে। লেডি রাথ্‌বোনের খোলা চিঠির উত্তরে রোগশয্যা হইতে বিবৃতি, ৪ জুন। পীড়ার বৃদ্ধি। কবিকে কলিকাতায় আনয়ন। ৩০ জুলাই অস্ত্রোপচারের পূর্বে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা—"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"। ৭ অগস্ট্ ১৯৪১ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখীপূর্ণিমার দিন, বেলা বারোটার কিছু পরে, ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে, জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে দেহত্যাগ। —

পৃষ্ঠা	ছত্র	শুদ্ধপাঠ
১০৫	২৯	গৃহরাজের স্থলে : গৃহরাজ্যের
৫৬৫	১৬	মালতী স্থলে : তারিণী
৫৬৯	২	দেখ্ দেখি
৫৭০	১৩	সে স্থলে : যে
৫৯৬	২০	দেবী নাই!
৬২৩	২৪	রাখ্
৭৪১	২৭	টিক স্থলে : টিকা
৭৪৭	৬	অভিসারিকা!
৮৪১	২০	পূর্ণতায়;
৮৭১	২৫	-অবনত
৯০০	১৩	ফেলতে।
৯০২	৩	নেই।